শ্রীমৎ অনির্বাণ

উপনিষৎ-প্রসঙ্গ

চতুর্থ খণ্ড

কঠোপনিষৎ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

রাজবাটী, বর্ধমান

কঠোপনিষৎ

উপনিষৎ-প্রসঙ্গ

চতুর্থ খণ্ড

কঠোপনিষৎ

শ্রীমৎ অনির্বাণ

(১৯৫৮ সালে প্রদত্ত প্রবচন অবলম্বনে)

মন্ত্রানুবাদ

গৌরী ধর্মপাল

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

রাজবাটী, বর্ধমান-৭১৩১০৪

২০০৮

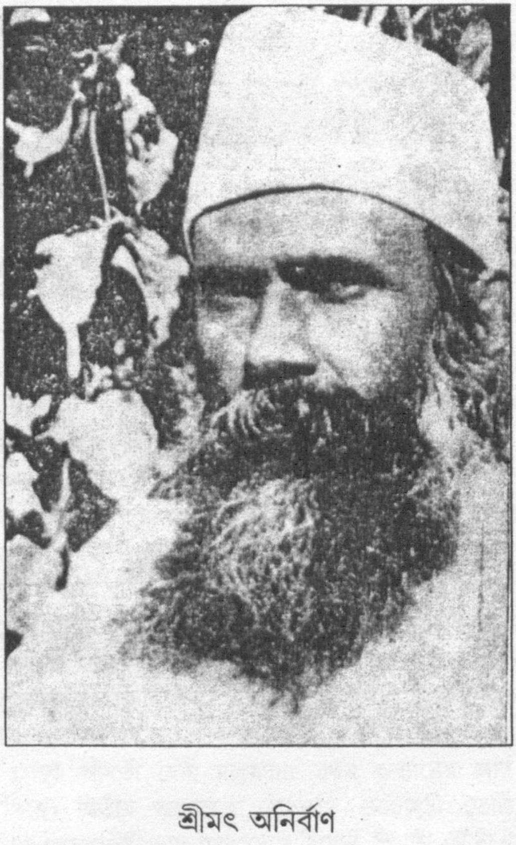
UPANISAD PRASANGA
(Volume-IV)
by SRIMAT ANIRVAN

ISBN No. : 81-87259-64-7

প্রথম প্রকাশ : জন্মাষ্টমী ১৩৯৫ (৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮)
দ্বিতীয় মুদ্রণ (পরিমার্জিত) : আগস্ট, ২০০৮

মূল্য : ৭০ টাকা

প্রকাশক : ষোড়শীমোহন দাঁ, কর্মসচিব, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
মুদ্রক : সাধনা প্রেস, ১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান



শ্রীমৎ অনির্বাণ



নিবেদন

আমাদের কেয়াতলা রোডের বাড়িতে স্বর্গত বন্ধু ধর্মপালের প্রতিষ্ঠিত ধর্মসভায় ১৯৫৫ সাল থেকে শ্রীমৎ অনির্বাণ উপনিষৎ-প্রসঙ্গ আরম্ভ করেন। তখন তিনি প্রায় প্রতি বৎসর শীতকালে শিলং থেকে কলকাতায় আমাদের বাড়ি আসতেন এবং ধর্মসভায় এক এক বছর এক একটি উপনিষদের উপর প্রবচন করতেন। ১৯৫৮ সালে কঠোপনিষদের ওপর প্রবচন করেছিলেন।

ওইসব ভাষণের অনুলেখন আমি গুজরাতি লিপিতে সঙ্গে সঙ্গে করে নিতাম আর পদ্মশ্রী বীণা দাস (উদয়ভিলা) ও সুধা বসুর সাহায্যে বাংলায় প্রতিলিপি করিয়ে রাখতাম। আমাদের এই দুই বন্ধু আজ আর ইহজগতে নেই, তাঁরা প্রকাশিত কঠোপনিষৎ দেখে যেতে পারলেন না। পরমকৃপালু পরমাত্মা তাঁদের আত্মার উৎক্রান্তির পথ অপাবৃত করুন, এই প্রার্থনা।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে শ্রীমৎ অনির্বাণ যখন উপনিষৎ-প্রসঙ্গ গ্রন্থাকারে লিখতে আরম্ভ করলেন, তখন ধর্মসভার উপনিষদ্-ভাষণের অনুলেখনগুলি উপাদান হিসেবে ব্যবহার করতেন। উপনিষৎ-প্রসঙ্গের প্রথম খণ্ড হিসেবে শুক্লযজুর্বেদের ঈশোপনিষদ্ প্রকাশিত হল ১৯৬৬ সালে। তারপর ক্রমে ক্রমে ঋগ্বেদাদি বেদের এক একটি উপনিষদ্ লেখার পরিকল্পনা তাঁর ছিল। সেই হিসেবে ঋগ্বেদের ঐতরেয় আর সামবেদের কেন—এই দুটি উপনিষদ্ প্রকাশিত হল। তারপর কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ধরেছিলেন এবং ওটি শেষ হবার পরে কঠোপনিষদ্ লেখার ইচ্ছা তাঁর ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তৈত্তিরীয়ের ভূমিকা লিখেই তিনি গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং উপনিষদ্ লেখার কাজ বন্ধ হয়ে গেল। কঠোপনিষদে আর হাত দেওয়াই হল না।

তাঁর দেহোৎসর্গের পরে বিশেষত ড. গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং অন্য সুধী বন্ধুদের অনুরোধে কঠোপনিষদ্ প্রকাশ করতে মনস্থ করলাম। শ্রীমৎ অনির্বাণের ভাষণের ওই অনুলেখন থেকে শ্রীমতী দেবী মজুমদার প্রথম অধ্যায়ের আর শ্রীমতী মাধবী গঙ্গোপাধ্যায় (সিংহ) দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রেসকপি মোটামুটি তৈরি করে দিলেন। ড. গোবিন্দগোপাল প্রেসকপিটি ভাল করে দেখে দিলেন, শ্রীমতী গৌরী ধর্মপাল মন্ত্রানুবাদ এবং কিছু শব্দটীকা করে দিলেন, এবং আমরা দুজনে প্রেসকপিটি আদ্যোপান্ত পরিমার্জনা করলাম। এদিকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও উপনিষৎ-প্রসঙ্গের চতুর্থ খণ্ডরূপে এই কঠোপনিষদ্ ছাপতে সাগ্রহে রাজি হলেন। এজন্য তাঁকে আমাদের বিশেষ ধন্যবাদ জানাই।

বলা বাহুল্য, শ্রীমৎ অনির্বাণ নিজে যদি কঠোপনিষদ লিখতেন-তাহলে তা অন্যরূপ হতো। তার গাম্ভীর্য এবং সারবত্তা অনেকগুণ বেড়ে যেত। কিন্তু তাঁর ভাষণ অবলম্বনে

প্রস্তুত এই ভাষ্যেরও অন্যরকম একটা মূল্য আছে। এটি তাঁর স্ব-লিখিত না হলেও স্ব-কথিত। কথা লেখার থেকে স্বাভাবিকভাবেই সহজ সরল হয়। এই সহজ গুণ এই ভাষ্যের পাঠকগণ অনুভব করবেন। উপনিষদের গূঢ়ার্থের এত সরল ব্যাখ্যা দুর্লভ। লংহ্যান্ডে পুরোপুরি নোটস্ নেওয়া সম্ভব নয়, তাই মাঝে মাঝে সূত্রচ্ছেদ বা অন্য ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু অর্থগত ভুলত্রুটি যাতে না থাকে তার জন্য খুবই সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে। বার দুয়েক প্রেসকপির সংশোধন করা হয়েছে। পুনরুক্তি বা অস্পষ্টতা বর্জন করার জন্য অনেক জায়গায় পুনর্লেখন করা হয়েছে। প্রবচনে অনেক সময়ে শ্রীমৎ অনির্বাণ ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করতেন, লেখার সময় বর্জন করতেন। তাঁর মুখের ভাষার বিশেষত্ব রক্ষা করার জন্য আমরা সেগুলি রেখেছি গোবিন্দবাবুর অনুবাদ সহ। তাঁর অন্য উপনিষদ্-ভাষ্যের মতো এটিতেও অনেক নতুন কথা, সাধন-কথা, বেদের গূঢ়ার্থ ইত্যাদি সুধী পাঠককে পরিতৃপ্ত করবে আশা করি।

শ্রীমৎ অনির্বাণ সংস্কৃতের বর্গীয় 'ব'-কে ব এবং অন্তঃস্থ 'ব'-কে অসমীয়া ৱ লেখার পক্ষপাতী ছিলেন এবং সন্ধিজ বর্ণগুলি বিশ্লিষ্ট করে লিখতেন। এই রীতি সর্বত্র অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি নানা কারণে। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম বল্লীতে উদাহরণ হিসেবে রেখে বাকি অংশে প্রচলিত রীতির অনুসরণে বর্গীয় 'ব'-কে ৰ এবং অন্তঃস্থ 'ব'-কে ব রাখা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট পাঠ দেওয়া হয়েছে। আশা করি প্রুফ-সংশোধনগত এবং অন্যান্য ত্রুটি সুধী পাঠক মার্জনা করবেন।

শ্রীমতী সঞ্চিতা মজুমদার চূড়ান্ত প্রেসকপি তৈরি করতে সাহায্য করেছে এবং কল্যাণীয়া দেবার্চনা সরকার সূচি ও নির্ঘন্ট প্রস্তুত করে দিয়েছে। এদের স্নেহ জানাই। প্রকাশন-বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীরথীন্দ্রকুমার পালিত প্রকাশন কর্মের দায়িত্ব যেভাবে বহন করেছেন, তার জন্য তাঁকে জানাই আমাদের অকুণ্ঠ প্রীতি ও ধন্যবাদ।

মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা বিদ্যাম্ এতাং যোগবিধিং চ কৃৎস্নম্।
ৱ্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্ বিমৃত্যুর অন্যোঽপ্যেবং যো বিদ্ অধ্যাত্মম্ এব।।

শুভম্ ইতি।

২৪ আষাঢ় ১৩৯৫

৯/২ ফার্ন রোড, কলকাতা-১৯

গৌতম ধর্মপাল

সূচিপত্র

উপনিষৎ-প্রসঙ্গ

কঠোপনিষদ্

ভূমিকা

কঠোপনিষদ্ কৃষ্ণযজুর্বেদের উপনিষদ্। যজুর্বেদের দুই ভাগ—কৃষ্ণ ও শুক্ল। শুক্লযজুর্বেদের প্রখ্যাত উপনিষদ্ ঈশোপনিষদ্ আর কৃষ্ণযজুর্বেদের কঠোপনিষদ্। যজুর্বেদ কর্মকাণ্ডের বেদ, কর্ম থেকে জ্ঞানে চলে যাওয়া। বৈদিক মন্ত্র তিনপ্রকার—ঋক্ সাম ও যজুঃ। দেবতাদের স্তুতি করা হতো সাম মন্ত্রে। ঋকে দেবতাদের আবাহন। আর আহুতি দেওয়া হতো যজুর্মন্ত্রে।

কঠোপনিষদের মূল প্রতিপাদ্য নচিকেতার তৃতীয় প্রশ্নে পাওয়া যায়। এই প্রশ্নটি বলতে গেলে সব আধ্যাত্মিক চিন্তাকে অধিকার করে রয়েছে। প্রশ্নটি এই, 'যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে'।—মানুষ যখন প্রেত হয় বা ইহলোককে অতিক্রম করে (মরে) তারপর তার কিছু থাকে কি না?

প্রেতশব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ 'যে এগিয়ে গেছে' (প্র—ই+ক্ত)। এগিয়ে যাওয়া অবশ্য দেহ ছেড়ে এগিয়ে যাওয়া। তার দুরকম তাৎপর্য হতে পারে। মৃত্যুতে মানুষ যখন দেহকে ছেড়ে যায় তখন তার প্রেতাবস্থা। আবার বেঁচে থেকেও কেউ দেহকে ছাপিয়ে থাকতে পারেন তাঁরও প্রেতাবস্থা। প্রশ্ন, এই প্রেতাবস্থায় মানুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে কিনা। জীবনের প্রতি প্রত্যেকে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে। একশ্রেণির লোক বলেন, মৃত্যুর পর কিছুই থাকে না—তাঁরা নাস্তিক। আর একশ্রেণির লোক বলেন তখনও আত্মা থাকে—তাঁরা আস্তিক। এদেশে চার্বাকরা ছিলেন নাস্তিক। এঁরা বলতেন, 'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ'—দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেলে সে আর ফিরে আসে কী করে? সুতরাং পরলোক বলে কিছুই নাই। পরলোক নাই তো আত্মা নাই। আত্মা নাই তো পরমাত্মা নাই। এখনকার জড়বাদীদের সঙ্গে এদের মিল রয়েছে।

যারা মৃত্যুর পরে কিছু থাকে বলে, তারা পরলোকে বিশ্বাস করে, আত্মায় বিশ্বাস করে, পরমাত্মায় বিশ্বাস করে। তারা বলে, মৃত্যুর পর আত্মা থাকে। তারা আস্তিক।

এই আস্তিকদের ভিতরেও আলাদা আলাদা মত রয়েছে। খ্রিস্টান ও মুসলিমরা মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, কিন্তু বলে, মৃত্যুর পরে আত্মা আর এ পৃথিবীতে ফিরে আসে না। কাজেই তারা পুনর্জন্ম মানে না। ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ ধর্ম পুনর্জন্ম মানে। তারা বলে, জগতের উপরে যাদের আসক্তি রয়েছে তারা মৃত্যুর পরে তাদের কর্মফলানুসারে কোনো লোকে গিয়ে কিছুকাল থেকে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে।

এটাকে ব্রাহ্মণে পুনর্মৃত্যু বলা হয়েছে। আবার এমন লোকও আছে যারা মৃত্যুর পর আর পৃথিবীতে ফিরে আসে না, সাধনার জোরে পরলোকেই তারা দেবযান পথ ধরে এগিয়ে চলে যায়। তাদের ক্রমমুক্তি হয়। আবার এমন লোকও থাকতে পারেন যাঁরা এখানে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন।

এখন প্রশ্ন এই, এরকম লোকের মৃত্যুর পরে কী হয়? অর্থাৎ মানুষ বিদেহ হলে কী হয়? স্বাভাবিক বিদেহ হয় মৃত্যুতে। আর একটা বিদেহ আছে ধ্যানে বা সমাধিতে। যারা পূর্ণজ্ঞানী তাদের এখানে ফিরে আসার প্রয়োজন হয় না। তারা সর্বময় হয়ে যায়। জগতের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। যেমন সমুদ্রের বুদবুদ একটু ছুঁলেই সমুদ্রের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।

এইরকম জ্ঞানীদের তিনপ্রকার অবস্থা হতে পারে। এক অবস্থাতে তারা মনে করে আমরা সূর্য থেকে এসেছি, আমরা সূর্যের এক একটা কিরণ বা রশ্মি মাত্র। তাদের ভিতরে একটা আবেগ একটা পিপাসা জাগে আবার কি করে সূর্যে ফিরে যাব, সূর্যের সঙ্গে এক হব। দ্বিতীয় অবস্থা হল শুধু সূর্যে পৌছান নয়, সূর্যদ্বার ভেদ করে চলে যাওয়া—মহাশূন্যে পৌছান।

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়ম্ অগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।।

এমন জায়গায় চলে যাওয়া যেখানে সূর্য প্রকাশ হয় না, যেখানে চন্দ্রতারকার প্রকাশও পৌঁছায় না, বিদ্যুৎ চমকায় না, আগুনও জ্বলে না, কিছুই না, অথচ একটা কিছু রয়েছে যার আলোয় এরা সব আভা পায়। আভার অতীত যে সত্তা, মহাশূন্য, সেই অবস্থাতে পৌছান। বৌদ্ধ ধর্মের শূন্য এবং উপনিষদের অসৎ—এই স্থিতিরই নাম। সূর্যে নয়, শূন্যে, মহাশূন্যে লীন হয়ে যাওয়া। আর একটা তৃতীয় অবস্থা আমরা পাই ভাগবত পুরাণে। এরকম আত্মা আছেন, যাঁরা মুক্ত হয়েও সূর্যলোকে থাকা এবং শূন্যে লীন হয়ে যাওয়া এ দুটোর অনুভব করেও আবার জগতে ফিরে আসেন। এর থেকে অবতারবাদের সৃষ্টি হয়েছে। পুরুষোত্তমের অবতার হয়, এবং তাঁরা তাঁদের বিশেষ বিশেষ কর্ম নিয়ে অধিকার নিয়ে কাজ করতে আসেন। এঁদের বলে আধিকারিক পুরুষ। এই প্রকারের কল্পনা বৌদ্ধধর্মেও আছে। যেমন, আগামী যুগে মৈত্রেয় বুদ্ধের অধিকার হবে, এই যুগে গৌতম বুদ্ধের অধিকার চলছে। ব্রাহ্মণ্যধর্মে এভাবে ব্যাসদেবের কল্পনা করা হয়েছে, ভাগবতে নরনারায়ণের কল্পনা করা হয়েছে।

দেহ ছাড়লে পরে কী হয়, নচিকেতার এই প্রশ্নের উত্তরে যম বলেছেন, যারা মানে, এরপর কিছুই নাই, তারা পুনঃ পুনঃ মরে; তারা বারবার আমার কবলে পড়ে। জ্ঞানীর বেলায় কী হবে তা আগে বলা হয়েছে। আর যারা জানে যে আবার আসতে হবে, অর্থাৎ পুনর্জন্মকে যারা স্বীকার করে, তাদের একটা সুবিধা থাকে। তারা জ্ঞানী নয়, অথচ তাদের জন্যও আশা থাকে। গীতায় যেমন যোগভ্রষ্টের অবস্থা কী হয় তা বলা হয়েছে। তারা নাশ পাবে না। কল্যাণকৃতের কোনোদিন দুর্গতি হয় না। পুণ্যলোক উপভোগ করে তারা আবার 'শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে' জন্মগ্রহণ করে। সুকৃতির ফলে শুচি শ্রীমন্তের ঘরে দেহ

ধারণ করে শেষে ভগবানকে পায়। বৌদ্ধধর্মে একটা শ্রেণিকে বলে স্রোতাপন্ন। বুদ্ধের কথা শুনে তারা স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ল, বারবার ভেসে যাচ্ছে, কিন্তু বুদ্ধকে ভুলছে না। শেষ না পাওয়া পর্যন্ত তারা বারবার আসে, তাদের সাধনা চালু থাকে। আর এক শ্রেণির লোক আছে, তারা 'সকৃদাগামী'। বুদ্ধদেবের উপদেশ তারা শুনেছে, কিন্তু নির্বাণ পায়নি। তাদের মাত্র একবার এ-জগতে আসতে হয়। আর একদল 'অনাগামী'। এদের স্থিতি ব্রাহ্মণ্যধর্মের ক্রমমুক্তির মতো। লোকোত্তরে এদের সাধনা চলে। চতুর্থ শ্রেণি—অর্হৎ। অর্হতের তিনটি অবস্থা। প্রথম, সূর্যের সঙ্গে মিলে যাওয়ার মতো। বৌদ্ধরা বলতেন, আভাস্বর ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হওয়া। তাঁরা এটাকে খুব বড় স্থিতি মানতেন না। কেন না এখানে রূপ থেকে যায়। তারও পারে গেলে মহাশূন্য বা নির্বাণ লাভ হয়। ব্রাহ্মণ্যধর্মের অসদ্‌ব্রহ্ম লাভ করার মতো। তৃতীয় স্থিতি হচ্ছে, বিধিনির্দিষ্ট হয়ে আবার জগতে ফিরে আসা, জগতের কল্যাণের জন্য। তৃতীয় অবস্থার প্রভাব শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনে বেশি দেখা যায়।

এ সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের নিজের মত কী? যাজ্ঞবল্ক্যের মতের সঙ্গে তার বহু সাদৃশ্য আছে। মৈত্রেয়ীকে উপদেশ দিতে গিয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, 'ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি'। মানুষ যখন প্রয়াণ করে, প্রেত হয়, প্রাকৃত ভূমি ছেড়ে অপ্রাকৃত অবস্থাতে যায়, তখন কোনো সংজ্ঞা থাকে না। রামপ্রসাদ একটা গানে এই কথা বলেছেন, 'বল দেখি ভাই কী হয় ম'লে। যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে।' উপনিষদে এই কথা বলা হয়েছে। আমি বলে কোনো সংজ্ঞা থাকে না। মালুঙ্ক্য-পুত্র বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বুদ্ধ দেহ ছাড়লে পর কী হবে? বুদ্ধদেব কিছুই উত্তর দিলেন না। তিনি থাকবেন, এও বললেন না; থাকবেন না, তাও বললেন না। বুদ্ধের প্রজ্ঞা বা শক্তি, তাকে আশ্রয় করে তাঁর একটা সংকল্প থেকে যায়। সমস্ত জীবকে নির্বাণ-ভূমিকায় নিয়ে যাব এই সংকল্প কাজ করতে থাকে। শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের সঙ্গে মহাযান বৌদ্ধদের এই মতের সাদৃশ্য রয়েছে। একার মুক্তি নয়, সবার মুক্তি। একার সিদ্ধি নয়, সবার সিদ্ধি। তাই মহাযানীরা বলেন, হীনযানীরা বুদ্ধদেবের মত ঠিক বোঝে না, তারা নিজেকে নিয়ে থাকে, নিজের নির্বাণ নিয়ে ভাবে। তাদের যান হীন, শুধু নিজের জন্য। আমাদের যান সবার জন্য। মনে হয় এটাই ঠিক। গৌতমবুদ্ধ ব্যক্তি হিসাবে থাকেন না, কিন্তু সংকল্প থেকে যায়। সাধনার গোড়াতে এই সংকল্পের সঙ্গে আমরা যদি এক হয়ে যাই তার যে স্থিতি সেটা সূর্যের সঙ্গে এক হওয়ার মতো। সূর্য হয়ে, আকাশ হয়ে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। এটাই হল আদর্শ।

শান্তিপাঠ

ওঁ সহ নাৱ.ৱতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ ৱীর্যং করৱাৱহৈ।
তেজস্ৱি নাৱ.ধীতম্ অস্তু, মা ৱিদ্ৱিষাৱহৈ।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

একসঙ্গে তিনি আগলে থাকুন আমাদের (গুরু-শিষ্য) দুজনকে
একসঙ্গে অধিকার ও সম্ভোগ করুন আমাদের দুজনকে
একসঙ্গে যেন দুজনে বীর্য অর্জন ও প্রকাশ করি।
আমাদের জ্ঞান তেজে বিকীর্ণ হোক
বিদ্বেষ যেন না করি পরস্পর।।
শান্তি শান্তি শান্তি।।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম বল্লী

ওঁ উশন্ হ বৈ ৱাজশ্রৱসঃ সর্ব্বৱেদসং দদৌ। তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস।।১
তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাসু শ্রদ্ধা.ৱিৱেশ, সোঽমন্যত।।২

পীতোদকা জগ্ধতৃণা
দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ
অনন্দা নাম তে লোকাস্
তান্ স গচ্ছতি তা দদত্।।৩

স হো.ৱাচ পিতরং, তত, কস্মৈ মাং দাস্যসী.তি।
দ্বিতীয়ং, তৃতীয়ং, তং হো.ৱাচ মৃত্যৱে ত্বা দদামী.তি।।৪

বহূনাম এমি প্রথমো
বহূনাম্ এমি মধ্যমঃ।
কিং স্বিদ্ য়মস্য কর্তব্যং
য়ন্ ময়া.দ্য করিষ্যতি।।৫

অনুপশ্য য়থা পূর্বে
প্রতিপশ্য তথাঽপরে।
সস্যম্ ইৱ মর্ত্যঃ পচ্যতে
সস্যম্ ইৱা.জায়তে পুনঃ।।৬

ৱৈশ্বানরঃ প্রৱিশত্য্-
অতিথির্ ব্রাহ্মণো গৃহান্।
তস্যৈ.তাং শান্তিং কুর্বন্তি
হর ৱৈৱস্বতো.দকম্।।৭

আশা-প্রতীক্ষে সঙ্গতং সূনৃতাং
চে.ষ্টাপূর্তে পুত্র-পশূংশ্ চ সর্বান্।
এতদ্ বৃঙ্ক্তে পুরুষস্যা.ল্পমেধসো
য়স্যা.নশ্নন্ ৱসতি ব্রাহ্মণো গৃহে।।৮

প্রথম অধ্যায়

প্রথম বল্লী

বাজশ্রবার পুত্র [ঔদ্দালকি আরুণি গৌতম] সর্বস্ব দান করেছিলেন ফলেরই কামনায়। তাঁর একটি পুত্র ছিল, তার নাম নচিকেতা।।১

দক্ষিণাগুলি যখন আনা হচ্ছিল, তখন সেই কুমারের মনে শ্রদ্ধার আবেশ হল, সে ভাবলে।।২

জন্মের মতো দুধ দোওয়া শেষ,
জন্মের মতো শেষ ঘাস জল খাওয়া,
বিকলেন্দ্রিয়—এসব গাভী যে দেয়,
আনন্দহীন লোকে তার ঘটে যাওয়া।।৩

সে পিতাকে বললে, বাবা, আমায় কাকে দেবে? দ্বিতীয়বার। তৃতীয়বার।
[বাজশ্রবা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন] তোকে যমকে দিলুম।।৪
[নচিকেতা ভাবলে]

বহুর মধ্যে আমি উত্তম
বহুর মধ্যে আমি মধ্যম
[অধম কখনো নই]
যমের রয়েছে কী এমন কাজ
আমাকে দিয়ে যা করবে সে আজ? ।।৫

[অনুতপ্ত পিতাকে সে বললে]

ভেবে দেখুন তো আগে যারা ছিল,
এবং দেখুন পরে আরো কত—
শস্যেরই মতো পাকছে মানুষ,
ফের গজাচ্ছে শস্যেরই মতো।।৬

[যমপুরীতে নচিকেতা তিন রাত উপবাসে কাটানোর পর গৃহাগত যমকে সবাই বললে—]

একে তো অতিথি, তায় বামুন
বাড়িতে ঢোকেন, যেন আগুন।
জল আনো তাঁর জন্যে, যম,
শান্ত করোগে'—এই নিয়ম।।৭

আশা ও প্রতীক্ষা, সঙ্গ, সৎপথে-চলা
প্রিয়সত্য বলা
যজ্ঞ পূর্ত পুত্র পশু—সর্বনাশ হয়
সে নির্বোধ পুরুষের, যার ঘরে ব্রাহ্মণ উপবাসী রয়।। ৮

তিস্রো রাত্রীর্ য়দ্ অৱাৎসীর্ গৃহে মে—
অনশ্নন্ ব্রহ্মন্ অতিথির্ নমস্যঃ।
নমস্ তেঽস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেঽস্তু
তস্মাত্ প্রতি ত্রীন্ ৱরান্ ৱৃণীষ্ব।। ৯

শান্তসঙ্কল্পঃ সুমনা য়থা স্যাদ্
ৱীতমন্যুর্ গৌতমো মাঽভি মৃত্যো।
ত্বৎ-প্রসৃষ্টং মাঽভিৱদেত্ প্রতীত
এতত্ ত্রয়াণাং প্রথমং ৱরং ৱৃণে।। ১০

য়থা পুরস্তাদ্ ভৱিতা প্রতীত
ঔদ্দালকির্ আরুণির্ মত্-প্রসৃষ্টঃ।
সুখং রাত্রীঃ শয়িতা ৱীতমন্যুস্
ত্বাং দদৃশিৱান্ মৃত্যুমুখাত্ প্রমুক্তম্।। ১১

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনা.স্তি
ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বা—অশনায়াপিপাসে
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে।। ১২

স ত্বম্ অগ্নিং স্ৱর্গ্যম্ অধ্যেষি মৃত্যো
প্রব্রূহি ত্বং শ্রদ্দধানায় মহ্যম্।
স্ৱর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্ত
এতদ্ দ্বিতীয়েন ৱৃণে ৱরেণ।। ১৩

প্র তে ব্রৱীমি তদ্ উ মে নিবোধ
স্ৱর্গ্যম্ অগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্।
অনন্তলোকাপ্তিম্ অথো প্রতিষ্ঠাং
ৱিদ্ধি ত্বম্ এতং নিহিতং গুহায়াম্।। ১৪

লোকাদিম্ অগ্নিং তম্ উৱাচ তস্মৈ
য়া ইষ্টকা য়াৱতীর্ ৱা য়থা ৱা।
স চা.পি তং প্রত্যৱদদ্ য়থোক্তম্
অথা.স্য মৃত্যুঃ পুনর্ এৱা.হ তুষ্টঃ।। ১৫

তম্ অব্রৱীত্ প্রীয়মানো মহাত্মা
ৱরং তৱে.হা.দ্য দদামি ভূয়ঃ।
তৱৈ.ৱ নাম্না ভৱিতা.য়ম্ অগ্নিঃ
সৃঙ্কাং চে.মাম্ অনেকরূপাং গৃহাণ।। ১৬

[তখন যম নচিকেতাকে যথোচিত সৎকার করে বললেন—]

নমস্য তুমি অতিথি আমার হে ব্রাহ্মণ
তিন রাত তবু উপোসী থেকেছ আমার ঘর।
প্রণাম তোমায়, আমার মন্দ যেন না হয়,
ব্রাহ্মণ, চাও—বদলেতে তার—তিনটি বর।। ৯

[নচিকেতা বললে—]

রাগ ভুলে যান [পিতা] গৌতম
কামনা শান্ত, প্রসন্ন হোক মন।
সাদরে ভাষণ করুন মৃত্যু মুক্ত আমাকে চিনে
তিনের মধ্যে চাই এ বর প্রথম।। ১০

[যম বললেন—]

আমার প্রেরণায়,

তোমাকে মুক্ত দেখে মৃত্যুর মুখ থেকে
আরুণি ঔদ্দালকি চিনতে
পারবেন, রাগ ভুলে হবেন আগেরই মতো,
ঘুমোবেন রাতে নিশ্চিন্তে।। ১১

[নচিকেতা বললে—]

স্বর্গলোকে ভয় কিছু নেই
নেই তুমিও, নেইকো জরার ভয়।
তৃষ্ণা-ক্ষুধা দুই পেরিয়ে স্বর্গলোকে
শোক-পারে লোক আ-নন্দিত হয়।। ১২
স্বর্গলোকে যায় যারা, পায় অমৃতকে
স্বর্গসাধন অগ্নিকে সেই, মৃত্যু, তুমি
জান। আমায় বলো, আমার শ্রদ্ধা আছে—
এই দ্বিতীয় বর চাইছি তোমার কাছে।। ১৩

[যম বললেন—]

স্বর্গসাধন সে অগ্নিকে ভালোই জানি
নচিকেতা, বলছি তোমায় সবিস্তারে।
বোঝো জানো এঁকে যিনি পরম গোপন,
অনন্ত লোক পাওয়ান এবং প্রতিষ্ঠা দেন।। ১৪

তারপর যম তাকে বললেন সৃষ্টির আদিম সে অগ্নির কথা, কী কী ইঁট, কতগুলি, এবং কীভাবে [তাদের সাজাতে হবে অগ্নিচয়নের বেদিতে]। সেও যেমন শুনল, সেইভাবেই পুনরাবৃত্তি করল। তখন যম সন্তুষ্ট হয়ে আবার তাকে বললেন। ।।১৫

মহাত্মা তাকে বললেন প্রীত হয়ে,
তোমাকে এ-বর সঙ্গে দিচ্ছি আরো—
খ্যাত হবে এই অগ্নি তোমারই নামে
আর এই নাও জড়োয়া সৃঙ্কা-হারও।।১৬

ত্রিণাচিকেতস্ ত্রিভির্ এত্য সন্ধিং
ত্রিকর্মকৃত্ তরতি জন্মমৃত্যু।
ব্রহ্মজ-জ্ঞং দেৱম্ ঈড্যং ৱিদিত্বা
নিচায্যে.মাং শান্তিম্ অত্যন্তম্ এতি।।১৭

ত্রিণাচিকেতস্ ত্রয়ম্ এতদ্ ৱিদিত্বা
য এৱং ৱিদ্বাংশ্ চিনুতে নাচিকেতম্।
স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে।। ১৮

এষ তেঽগ্নির্ নচিকেতঃ স্বর্গ্যো
য়ম্ অৱৃণীথা দ্বিতীয়েন ৱরেণ।
এতম্ অগ্নিং তৱৈ.ৱ প্রৱক্ষ্যন্তি জনাসস্
তৃতীয়ং ৱরং নচিকেতো ৱৃণীষ্ব।। ১৯

য়ে.য়ং প্রেতে ৱিচিকিত্সা মনুষ্যে
অস্তী.ত্যে.কে নায়ম্ অস্তী.তি চৈ.কে।
এতদ্ ৱিদ্যাম্ অনুশিষ্টস্ ত্বয়া.হং
ৱরাণাম্ এষ ৱরস্ তৃতীয়ঃ।। ২০

দেৱৈর্ অত্রা.পি ৱিচিকিত্সিতং পুরা
ন হি সুৱিজ্ঞেয়ম্ অণুর্ এষ ধর্মঃ।
অন্যং ৱরং নচিকেতো ৱৃণীষ্ব
মা মো.পরোত্সীর্ অতি মা সৃজৈ.নম্।। ২১

দেৱৈর্ অত্রা.পি ৱিচিকিত্সিতং কিল
ত্বং চ মৃত্যো য়ন্ ন সুজ্ঞেয়ম্ আত্থ।
ৱক্তা চা. স্য ত্বাদৃগ্ অন্যো ন লভ্যো
নান্যো ৱরস্ তুল্য এতস্য কশ্চিত্ ।।২২

শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ ৱৃণীষ্ব
বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যম্ অশ্বান্।
ভূমের্ মহদ্ আয়তনং ৱৃণীষ্ব
স্বয়ং চ জীৱ শরদো য়াৱদ্ ইচ্ছসি ।।২৩

তিনবার তিন [লোকে] নাচিকেত অগ্নি চয়ন
যে করে, সে বেঁধে তিনের সঙ্গে সন্ধি-বাঁধন
ত্রি[লোকে] কর্ম করতে করতে
পার হয়ে যায় জন্মমৃত্যু
জেনে অনন্তচেতনায় জাত, সন্দীপনীয়, জাতবেদা সেই জ্যোতির্ময়কে
গভীর গভীরে কায়া দেয় তাঁকে
পায় এ শান্তি অন্তহীন।। ১৭

এইভাবে জেনে যে করে চয়ন নাচিকেত অগ্নিকে,
তিনটিকে জেনে ত্রি-নাচিকেত সে হয়,
মৃত্যুর ফাঁস সামনে ঠেলতে ঠেলতে
বীতশোক ভাসে আনন্দে স্বর্গলোকে—উজ্জ্বল চেতনায়।। ১৮

[এই হল তোমার—]

স্বর্গ-সাধন অগ্নি যা নচিকেতা
প্রার্থনা তুমি করলে দ্বিতীয় বরে।
তোমারই নামে এ-অগ্নিকে লোকে ডাকবে
নচিকেতা, চাও এবার তৃতীয় বর।। ১৯

[নচিকেতা বললে—]

মানুষ মরলে এই যে একটা তর্ক
কেউ বলে আছে, কেউ কেউ বলে নেই—
এইটি জানব। তুমি উপদেশ দাও।
বরের মধ্যে তৃতীয় বর—সে এই।। ২০

[যম প্রমাদ গণলেন]

এ নিয়ে তর্ক তুলেছেন কত স্বয়ং দেবতারাও
বোঝা সোজা নয়। এ তত্ত্ব বড়ো সূক্ষ্ম ধারণা করা।
না না নচিকেতা এত পীড়াপীড়ি কোরো না আমাকে। ছাড়ো
এ [দুরাগ্রহ]। অন্য একটা বর চাও এটা ছাড়া।।২১

[নচিকেতা বললে—]

এ নিয়ে তর্ক তুলেছেন নাকি স্বয়ং দেবতারাও
বোঝা সোজা নয়, তুমিও বলছ যম
তোমার মতন আর তো কাউকে বক্তা পাব না এর
আর কোনো বর নেই তো এর মতন ।।২২

[যম বললেন—]

একশ বছর বাঁচবে এমন চাও-না ছেলে, নাতি,
সোনা, অনেক পশু, ঘোড়া, হাতি,
বিরাট জমিদারি
চাও-না। নিজেও বাঁচো তোমার যত বছর খুশি ।।২৩

এতত্-তুল্যং যদি মন্যসে ৱরং
বৃণীষ্ব ৱিত্তং চির-জীৱিকাং চ।
মহাভূমৌ নচিকেতস্ ত্বম্ এধি
কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি ।।২৪

য়ে য়ে কামা দুর্লভা মর্ত্যলোকে
সর্ৱান্ কামাংশ্ ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।
ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্য়া
ন হী.দৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।
আভির্ মত্-প্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব
নচিকেতো মরণং মা.হনুপ্রাক্ষীঃ ।।২৫

শ্বোভাৱা[1] মর্ত্যস্য যদ্ অন্তকৈ.তত্
সর্ৱেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্ৱং জীৱিতম্ অল্পম্ এৱ
তৱৈৱ ৱাহাস্ তৱ নৃত্যগীতে ।।২৬

ন ৱিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো
লপ্স্যামহে ৱিত্তম্ অদ্রাক্ষ্মচেত্ত্বা।
জীবিষ্যামো য়াৱদ্ ঈশিষ্যসি ত্বং
ৱরস্ তু মে ৱরণীয়ঃ স এৱ ।।২৭

অজীর্য়তাম্ অমৃতানাম্ উপেত্য
জীর্য়ন্ মর্ত্যঃ ক্বধঃস্থঃ[2].প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন্ ৱর্ণরতিপ্রমোদান্
অতিদীর্ঘে জীৱিতে কো রমেত।। ২৮

য়স্মিন্ ইদং ৱিচিকিত্সন্তি মৃত্যো
য়ত্ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্ তত্।
য়োঽয়ং ৱরো গূঢ়ম্ অনুপ্রৱিষ্টো
নান্যং তস্মান্ নচিকেতা ৱৃণীতে।।২৯

ইতি কঠোপনিষদি প্রথমাধ্যায়ে প্রথমা ৱল্লী।।

---

১. শ্বঃ (আগামী কাল) অভাবঃ (অনস্তিত্ব) যেষাম্ (যাদের) > শ্বোঽ-ভাবাঃ > শ্বোভাবাঃ।

২. কঃ উ অধঃস্থঃ > ক উ অধঃস্থঃ > ক্বধঃস্থঃ। তু. কুহ সেতি ঘোরম্ (ঋ ২।১২।৫) ইত্যাদি, বিসর্গলোপের পর পাদপূরণের জন্য সন্ধি। দ্র. পাণিনি ৬।১।১৩৪। শ্লোকে কঃ এর পুনরাবৃত্তি দার্ঢ্যের জন্য।

কিংবা এরই সমান যদি মনে কর অন্য কোনো বর,
তা-ও চাও-না, চিরজীবন, টাকা,
বিশালভূমির হও-না রাজা, নচিকেতা,
করব তোমায় যতরকম ভোগের ভোগীশ্বর ।।২৪

মর্তলোকে কাম্য এবং দুষ্প্রাপ্য যা কিছু ধন
স্বচ্ছন্দে চাও-না সেসব ইচ্ছেমতন,
এই দেখো-না রথের মধ্যে বাজনা নিয়ে সুন্দরী সব মেয়ে
মানুষ এমন পায় না
দিচ্ছি তোমায় দাসী করো।
ছাড়ো
নচিকেতা, মরণ জানার বায়না।।২৫

[নচিকেতা বললে—]

ওহে অন্তক, মানুষের এ তো আজ আছে কাল নেই
নিস্তেজ করে দেয় সমস্ত ইন্দ্রিয়-সংবিৎ
এবং জীবন—যারই সে হোক না—কতটুকু আর বলো
সুতরাং থাক তোমারই ও রথ, তোমারই নৃত্যগীত।।২৬

বিত্তে তৃপ্তি নেই মানুষের, নেই।
বিত্ত পাবই, তোমাকে যখন দেখেছি।
এবং বাঁচব, তুমি রাজা যতদিন—
চাইছি কিন্তু বর আমি ঐটিই।।২৭

অজর অমর কারো কাছে এসে কোন্
নীচলোকবাসী—জড়িত জরায় মরণে—
জেনে বুঝে ঢং রং-রস-ফূর্তির
রস পাবে অতিরিক্ত দীর্ঘ জীবনে?।।২৮

এই চির মহা যাত্রা, মৃত্যু,
যা নিয়ে তর্ক এত সংশয়
আমাকে বলো তা।
গূঢ়সন্ধানী এই বর ছাড়া
চায় না অন্য বর নচিকেতা।।২৯

কঠোপনিষদে প্রথম অধ্যায়ে প্রথম বল্লী সমাপ্ত।।

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় বল্লী

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়-
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি
হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে।।১।।

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে।।২।।

স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামা-
নভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো
য়স্যাং মজ্জন্তি ৰহবো মনুষ্যাঃ।।৩।।

দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী
অবিদ্যা য়া চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।
বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে
ন ত্বা কামা ৰহবোঽলোলুপন্ত।।৪।।

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ
স্বয়ং-ধীরাঃ পণ্ডিতং-মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথাঽন্ধাঃ।।৫।।

ন সামপরায়ঃ প্রতিভাতি ৰালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে।।৬।।

শ্রবণায়াপি ৰহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি ৰহবো য়ং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লৰ্ধা-
শ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।।৭।।

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় বল্লী

[যম তখন বলতে সুরু করলেন]

শ্রেয় (আত্মার শ্রী, মঙ্গল, ভালো) হচ্ছে এক, প্রেয় (যা ভালো লাগে) হচ্ছে আর এক। দুটির লক্ষ্য আলাদা। মানুষকে তারা বাঁধে। দুটির মধ্যে শ্রেয়কে যে নেয়, তার ভালো হয়। যে প্রেয়কে বেছে নেয়, সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।।১

শ্রেয় আর প্রেয় মানুষের কাছে আসে। ধীর ব্যক্তি ভাল করে চারিদিক থেকে বিচার করে দুটিকে আলাদা করে নেন। প্রেয়র থেকে বরং শ্রেয়কেই বেছে নেন ধীর। কিন্তু অল্পবুদ্ধি বেছে নেয় প্রেয়কে, কেননা সে চায় নিত্য নতুন বস্তু অর্জন আর সঞ্চয় করতে।।২

নচিকেতা, তুমি ভেবে-চিন্তে প্রত্যাখ্যান করলে মনোহর সুন্দর সব কামনার বস্তু। নিলে না এই টাকার মালা, ভোগের শৃঙ্খল—যাতে মজে কত লোক।।৩

অবিদ্যা, আর যাকে বলা হয় বিদ্যা—এ দুটি একেবারেই বিপরীত। দুটি যায় দুদিকে। নচিকেতা, তুমি দেখছি বিদ্যার্থী, রাশি রাশি ভোগ তোমায় প্রলুব্ধ করতে পারে নি।।৪

নিজের মতে ধীর আর নিজের মতে পণ্ডিত যারা, সেই-সব বিভ্রান্ত লোক অবিদ্যার মাঝখানে থেকে অন্ধ-চালিত অন্ধের মতো কেবলই ঘুরপাক খায়।।৫

টাকার মোহে যে মূঢ় কেবলই প্রমাদ (উন্মত্ততা, অনবধান, ভুল) করে চলেছে, সেই 'ছেলেমানুষের' কাছে খোলে না 'মহা-যানে'র (১। চিরযাত্রা, ২। মহাজীবন) তত্ত্ব। সে ভাবে, এই লোকই আছে, এর পরে বা ওপরে কিছু নেই। ফলে বার বার আমার অধীন হয় সে।।৬

অনেকের কপালে শোনাটুকুও জোটে না। অনেকে আবার শুধু শুনেই যাচ্ছে জানা আর হবে না কোনোদিন। কুশল হয়ে এ-তত্ত্ব লাভ করে যিনি বলেন, তিনি আশ্চর্য। আর আশ্চর্য তিনিও যিনি সেই কুশলের উপদেশে এ-তত্ত্ব বুঝতে পারেন।।৭

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ।।৮।।

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া
প্রোক্তাঽন্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি
ত্বাদৃঙ্নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা।।৯।।

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং
ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।
ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নি—
রনিত্যৈ-র্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্।।১০।।

কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং
ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারম্।
স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং
দৃষ্ট্বা ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।।১১।।

তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।।১২।।

এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্যঃ
প্রবৃহ্য ধর্ম্যমণুমেতমাপ্য।
স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা
বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে।।১৩।।

অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ তৎ পশ্যসি তদ্বদ।।১৪।।

সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্বাণি চ য়দ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি—ওমিত্যেতৎ।।১৫।।

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ।।১৬।।

অযোগ্য লোকে (১। অ-বর, তু. প্রাপ্য বরান্ নিবোধত ২। অব-র নিকৃষ্ট) যদি নানারকম যুক্তিতর্ক দিয়ে, চিন্তাভাবনা করে এ-তত্ত্বের উপদেশ দেয়, তাহলে এটি ঠিকমত বোঝা যায় না। যতক্ষণ না, যদি না অন্য কেউ, অসাধারণ কেউ (অর্থাৎ 'বর', যোগ্য ব্যক্তি) বলেন এ-তত্ত্ব, ততক্ষণ এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। কেননা এ তো অণু-প্রমাণের চেয়েও অণুতর, এ তো বাপু যুক্তিতর্কের বিষয় নয়।।৮

যা তুমি পেয়েছ প্রিয়তম [নচিকেতা] , সে মতি তর্ক দিয়ে পাওয়া যায় না। অসাধারণ আচার্যের উপদেশেই তাঁকে ঠিকমত জানা যায়। সত্যকে তুমি ঠিক ধরেছ এবং সত্যে তুমি অটল থেকেছ নচিকেতা, আহা, তোমার মত জিজ্ঞাসু যেন পাই।।৯

আমি জানি সম্পদ্ অনিত্য, আর অনিত্য দিয়ে সেই নিত্যকে পাওয়া যায় না। তাই আমি নাচিকেত অগ্নি চয়ন করেছি, তাইতে অনিত্য দ্রব্য দিয়ে নিত্যকে পেয়েছি।।১০

কামনার সিদ্ধি, জগতের প্রতিষ্ঠা, অনন্ত সৃষ্টিবীর্য, চরম অভয়, বিপুল স্তুতি, সর্বগামী প্রতিষ্ঠা—এসব দেখেও ধৈর্যে অটল থেকে তুমি প্রত্যাখ্যান করেছ, নচিকেতা।।১১

সেই অমাবস্যার চাঁদ, গুহায় নিহিত, গোপনে অনুপ্রবিষ্ট, গভীর-গহ্বরে স্থিত প্রথম জ্যোতিকে অধ্যাত্ম-যোগ-সাধনে জেনে ধীর উল্লাস এবং বিষাদ দুই-ই ত্যাগ করেন।।১২

এটি 'শুনে' তাকে সম্যক্‌রূপে পরিগ্রহণ করে যে-মানুষ এই অণু ধর্মকে (সূক্ষ্ম সর্বাধার শূন্যতাকে) পেয়ে, (দূর্বাঘাস থেকে ভেতরের শক্ত শিসটির মত দেহাদি সমস্ত আবরণ, উপাধি থেকে) টেনে বার করে ছড়িয়ে দিতে পারে, সে আনন্দের বস্তুটিকে পেয়ে আনন্দে মাতে। নচিকেতা, তোমার দেখছি ঘর খুলে গেছে।।১৩

[নচিকেতা বললে]

ধর্মকে ছাড়িয়ে, অধর্মকে ছাড়িয়ে, এই সব করা আর না-করা, হয়েছে আর হবে-কে ছাড়িয়ে সেই যেটি দেখতে পাচ্ছ, সেটি আমাকে বল।।১৪

[যম বললেন]

সমস্ত বেদ যে পদটিকে (১। অক্ষর ২। লক্ষ্য) বলছে, সমস্ত তপস্যা বলছে যাকে, যাকে চেয়ে ব্রহ্মচর্য আচরণ করে, সেই পদ সংক্ষেপে বলছি তোমায়—এটি হচ্ছে ওম্।।১৫

এই অক্ষরই ব্রহ্ম। এই অক্ষরই পরম। এই অক্ষরকে জানলেই যে যা চায়, তার তা হয়।।১৬

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।।১৭।।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্-
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।১৮।।

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে।।১৯।।

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ।।২০।।

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ।
কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি।।২১।।

অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি।।২২।।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।।২৩।।

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাঽপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।।২৪।।

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ।।২৫।।

ইতি কঠোপনিষদি প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়া বল্লী।।

এটিই শ্রেষ্ঠ আলম্বন। এটিই পরম আলম্বন। এই আলম্বনকে যে জানে, সে ব্রহ্মালোকে মহিমান্বিত হয়।।১৭

এই অন্তর্যামী (এবং তাঁকে যিনি জানেন, তিনি) জন্মানও না, মরেনও না। ইনি কেউ-না, কোথাও থেকে হন নি। ইনি অজাত, কালাতীত, চিরন্তন, প্রথম। শরীর যখন মারা পড়ে, তখন ইনি মরেন না।।১৮

হন্তা যদি মনে করে মারব, আর হত যদি মনে করে, মরলুম—তারা দুজনেই ভালো করে জানে না। ইনি মারেনও না, মরেনও না।।১৯

এই জীবের মধ্যে গোপনে নিহিত আছেন আত্মা—সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতর, বিরাট থেকেও আরো বিরাট। আত্মার সেই মহিমাকে মানুষ দেখতে পায় স্বচ্ছ নির্মল আধারে (এবং ২। ধাতুঃ প্রসাদাত্, ধাতার প্রসাদে), অক্রতু (যার নিজে থেকে করার কিছু নেই) ও বীত-শোক (হর্ষশোকের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত) হয়ে।।২০

বসে বসেই সে যায় দূরে, শুয়েই ঘোরে সর্বত্র, মাতে অথচ মাতে না—সেই আলোকে কে জানতে পারে আমি ছাড়া?।।২১

শরীরে শরীরে (যা ঝরে যায়) যে অ-শরীরী (অ-ঝরা), চঞ্চলে চঞ্চলে যে অচঞ্চল, সেই বিরাট সর্বব্যাপী আত্মাকে জেনে ধীর শোকমুক্ত হন।।২২

বেদ আউড়ে কি বক্তৃতা করে আত্মাকে পাবে? না।
পাবে না মেধায়, পাবে না শুনলে হাজার বার।
বরণ করেন যাকে ইনি, এঁকে সেই তো পায়,
তারি কাছে এই আত্মা মেলেন তনুটি তাঁর।।২৩

দুষ্ট আচরণ যে ছাড়েনি, শান্ত হয়নি, সমাহিত হয় নি, পাওয়ার জন্য মানসিক চাঞ্চল্য যে শান্ত করতে পারে নি, সে এঁকে পেতে পারে না প্রজ্ঞান দিয়ে (কেননা, তার প্রজ্ঞান হয়ই না)।।২৪

ব্রহ্ম ক্ষত্র দুই-ই যার ভাত
এবং মৃত্যু যার ব্যঞ্জন
সে কোথায় সে কোথায় সে কোথায়...
সত্যি সত্যি জানে কোন জন?।।২৫

কঠোপনিষদে প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় বল্লী সমাপ্ত।

প্রথম অধ্যায়

তৃতীয় বল্লী

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ।।১।।

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম য়ৎ পরম্।
অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি ।।২।।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ।।৩।।

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ।।৪।।

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ।।৫।।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ।।৬।।

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি ।।৭।।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ।।৮।।

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ।।৯।।

প্রথম অধ্যায়

তৃতীয় বল্লী

যাঁরা ব্রহ্মকে জেনেছেন, এবং যাঁরা পাঁচটি অগ্নির উপাসক অথবা তিনবার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করেছেন, তাঁরা বলেন, যিনি একাধারে আলো এবং অন্ধকার তিনি পরম রাজ্যের অন্তঃপুরে লুকিয়ে বসে পান করে চলেছেন এই দুনিয়ার পুণ্যের ছন্দের রসটি।।১

যারা যজ্ঞ করে চলেছে, যারা পার হয়ে যেতে চায় সেই অক্ষর পরম ব্রহ্মের অভয় পারে, তাদের সেতু হল এই নাচিকেত অগ্নি। তাকে যেন জ্বালাতে পারি।।২

আত্মাকে রথী জেনো, রথ দেহধাম,
বুদ্ধিকে জেনো সারথি, মনটি লাগাম।।৩
তুরঙ্গ ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়গোচর-মাঠে ধায়।
স-মন-ইন্দ্রিয় আত্মা ভোক্তা, এই মনীষীরা কয়।।৪

যার বিজ্ঞান (একতার অপরোক্ষ অনুভূতি) হয় নি, যে সর্বদা থাকে অ-মনো-যোগে, সারথির দুষ্টু ঘোড়ার মতো ইন্দ্রিয়গুলি তার অবাধ্য হয়।।৫

যার বিজ্ঞান হয়েছে, যে সর্বদা থাকে মনো-যোগে, সারথির ভাল ঘোড়ার মতো ইন্দ্রিয়গুলি তার বাধ্য হয়।।৬

যার বিজ্ঞান হয়নি, যে মনো-যোগী নয়, যে (আত্মার আগুনে) সবসময় জ্বলছে না, সে সেই পদ (ছায়াতপ, অর্থাৎ আলোক-অনালোকময় বিরোধাভাস-ভাস্বর ব্রহ্মলোক) পায় না, আবার সেই আসা-যাওয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে পড়ে যায়।।৭

যার বিজ্ঞান হয়েছে, যে মনো-যোগী, যে [আত্মার আগুনে] সবসময় জ্বলছে, সে সেই পদকে পায়, যেখান থেকে ফের জন্মাতে হয় না।।৮

বিজ্ঞান সারথি করে
মনের লাগাম ধরে
চলে যে মানুষ
সে যায় পথের শেষে
যেখানে আছেন বসে
বিশ্বব্যাপ্ত জ্যোতির্ময় পরম পুরুষ।।৯

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ।।১০।।

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।।১১।।

এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।।১২।।

যচ্ছেদ্ বাঙ্মনসি প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি।।১৩।।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দূরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।।১৪।।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।।১৫।।

নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্।
উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।।১৬।।

য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংসদি।
প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে
তদানন্ত্যায় কল্পত ইতি।।১৭।।

ইতি কঠোপনিষদি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী।।

ইন্দ্রিয়গুলির থেকে বড় হল এ জড়-জগৎ।
জড় থেকে বড় মন—অন্তর্জগৎ।
মনের চাইতে বড় বুদ্ধি— বোধ, একের বিজ্ঞান।
তার চেয়ে বড় আত্মা—'মহৎ' মহান্।।১০
'মহৎ'-আত্মার চেয়ে বড় সেই অব্যক্ত অচেনা
মহান্ অজানা!
মহা-অজানারও পারে পুরুষ একেলা
তার পর কিছু নেই। সেই শেষ। সেই চির-চলা।।১১
এই পুরুষই লুকিয়ে আছে সর্বভূতে আত্মা হয়ে,
দেয় না দেখা। দেখেন শুধু তাঁরাই যাঁরা সূক্ষ্মদর্শী
সূক্ষ্ম অগ্র্যা বুদ্ধি দিয়ে।।১২
প্রজ্ঞাসাধক মিলিয়ে দেবেন বাক্‌কে মনে
(মুখরতা নীরব হবে)
মন মিলোবেন জ্ঞান-আত্মায়—সাক্ষী জ্ঞানে।
সাক্ষী-জ্ঞান মিলিয়ে দেবেন মহান্ আত্মায়—বিশ্ববোধে।
আবার তাকে
শান্ত আত্মায় মিলিয়ে দেবেন—ছায়ালোকে।।১৩

ওঠো সবাই, জাগো, পরম যাঁদের বরণ করেছেন সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষদের কাছে গিয়ে নিজের গভীরে জানো। ক্রান্তদর্শীরা বলেন, দুর্গম সে পথ, ক্ষুরের ধারের মত তীক্ষ্ম, চলা বড় কঠিন।।১৪

শব্দ নেই স্পর্শ নেই অরূপ অব্যয় সেই
অরস অগন্ধ নিত্য অনন্ত অনাদি...
মহতেরও পরে সেই অচঞ্চল চিরস্থির—
তাকে দেখ, তবে মৃত্যুমুখ হতে চিরমুক্তি পাবি।।১৫
মৃত্যু-মুখে বলা এই নাচিকেত চির-উপাখ্যান
বলে শোনে যে মেধাবী, অনন্তকে দেখে হয় সে মহান্।।১৬
ব্রহ্মশীল-সঙেঘ কিংবা প্রয়াতের শ্রাদ্ধে যদি
এই কথা পরম গোপন—
সংযমী শোনায় কেউ, তবে তার ফল হয়
অফুরন্ত অনন্ত জীবন,
ফল হয় অনন্ত জীবন।।১৭।।

কঠোপনিষদে প্রথম অধ্যায় তৃতীয় বল্লী সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম বল্লী

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ—
স্তস্মাৎ পরাঙ্‌পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।।১।।

পরাচঃ কামান্ অনুযন্তি বালা—
স্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে।।২।।

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈতৎ।।৩।।

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি।।৪।।

য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে এতদ্বৈ তত্।।৫।।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম বল্লী

স্বয়ম্ভূঃ অন্তঃপ্রবিষ্ট চৈতন্য **খানি** ইন্দ্রিয়-রূপ ছিদ্রগুলি **পরাঞ্চি** বহির্মুখ করে **বি-অতৃণত্** গর্ত করেন। **তস্মাত্** তাই **পরাক্ পশ্যতি** জীব বা ইন্দ্রিয় বাইরেটাই দেখে **ন অন্তরাত্মন্** অন্তরাত্মাকে নয়। কিন্তু **কঃ চিত্** কেউ কেউ আছেন **ধীরঃ** ধীর ধী-যোগী **প্রত্যক্-আবৃত্তচক্ষুঃ** যিনি চোখ তথা সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ভেতর দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে **প্রত্যক্-আত্মানম্** অন্তরাত্মাকে **ঐক্ষত্** নিরীক্ষণ করেন।।১।।

বালাঃ ছেলে মানুষ অর্থাৎ নির্বোধেরা **পরাচঃ কামান্** (পরাচ্ ২/৩) বাইরের ভোগ enjoyment এর **অনু-যন্তি** পেছনে ছোটে। **তে** তারা **বি-ততস্য মৃত্যোঃ** পরিব্যাপ্ত মৃত্যুর **পাশম্ যন্তি** জালে পড়ে। **অথ ধীরাঃ** আর যাঁরা ধীর তাঁরা **অধ্রুবেষু ধ্রুবম্ অমৃতত্বম্** সমস্ত অনিত্যের মধ্যে যা নিত্য স্থির সেই অমৃতত্বকে **বিদিত্বা** জেনে **ইহ** এই দুনিয়ায় **ন প্রার্থয়ন্তে** আর কিছুই চান না।।২।।

রূপম্ রসম্ গন্ধম্ শব্দান্ স্পর্শান্ চ রূপ রস গন্ধ শব্দ এবং স্পর্শ **মৈথুনান্** এই ইন্দ্রিয়-বিষয়-সংযোগ-জনিত প্রত্যক্ষগুলিকে **যেন এতেন এব** যে-এই আত্মার দ্বারাই **বি-জানাতি** একরস করে জানে, বিজ্ঞানী হয় যখন, তখন **অত্র** এই দুনিয়ায় **কিম পরিশিষ্যতে** কি আর বাকি থাকে? কিছুই না। সমস্ত অনুভবই আত্মায় এসে লীন হয়। **এতত্ বৈ** এই মহা-লয়া পরমশূন্যতাই হল **তত্** সেই অনির্বচনীয় যাকে তুমি জানতে চাইছ নচিকেতা।।৩।।

স্বপ্নান্তম্ স্বপ্নের শেষ অর্থাৎ সুষুপ্তি **জাগরিতান্তম্ চ** এবং জাগ্রতের শেষ অর্থাৎ স্বপ্ন **উভৌ** এই দুটিকেই **যেন** যার দ্বারা **অনুপশ্যতি** সন্ততভাবে দর্শন করেন, সেই **মহান্তম্** বিরাট সর্বব্যাপ্ত **বিভুম্** বিচিত্র-অসংখ্য-এক **আত্মানম্** আত্মাকে **মত্বা** বুঝে, অনুভব করে **ধীরঃ** ধীর **ন শোচতি** শোকগ্রস্ত হন না, শোকমুক্ত হন।।৪।।

যঃ যিনি **ইমম্** এই **মধু-অদম্** মধুভোজী, সুখদুঃখ ইত্যাদি সমস্ত অভিজ্ঞতার রসভোক্তা **ভূত-ভব্যস্য ঈশানম্** অতীত ও অনাগতের প্রভু নিয়ামক **জীবম্ আত্মানম্** জীবরূপী আত্মাকে **অন্তিকাত্** কাছ থেকে, অপরোক্ষানুভূতির দ্বারা **বেদ** জেনেছেন, **ততঃ** তার পরে, তার ফলে **ন বিজুগুপ্সতে** তাঁর আর বিজুগুপ্সা হয় না, তিনি লজ্জাঘৃণাভয়-মুক্ত হন। **এতত্ বৈ তত্** এই-ই সেই।।৫।।

যঃ পূর্বংতপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্বমজায়ত।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত। এতদ্বৈ তৎ।।৬।।

যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত। এতদ্বৈ তৎ।।৭।।

অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা
গর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ।
দিবেদিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভি
র্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ। এতদ্বৈ তৎ।।৮।।

যতশ্চোদেতি সূর্যোস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তং দেবাঃ সর্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ।।৯।।

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।।১০।।
মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি।।১১।।

যঃ তপসঃ পূর্বম্ জাতম্ [বেদ] তপের পূর্বে যিনি জাত তাঁকে যিনি জানেন; **যঃ অদ্‌ভ্যঃ পূর্বম্ অজায়ত, ভূতেভিঃ বি-অপশ্যত** যিনি অপের পূর্বে জন্মেছেন এবং জীব হয়ে জীবের মধ্যে দিয়ে বিচিত্র ভাবে দর্শন করেন **গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তম্** [বেদ] জীবের হৃদয়-গুহায় প্রবেশ করে বিরাজমান সেই আত্মাকে যিনি জানেন, [ন ততো বিজুগুপ্‌সতে] **এতত্ বৈ তত্**—দ্র, ৫ম।।৬।।

যা যে **দেবতাময়ী** সর্বদেবস্বরূপিনী **অদিতিঃ** অখণ্ডিতা অবন্ধনা অসীমা দেবমাতা **প্রাণেন সম্ভবতি** প্রাণ রূপে সম্ভূত হয়েছেন, **যা** যে-অদিতি **ভূতেভিঃ বি-অজায়ত** সর্বভূত রূপে সর্বজীব হয়ে বিচিত্র জন্ম গ্রহণ করেছেন, **গুহাম্ প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীম্** জীবের হৃদয়গুহায় প্রবেশ ক'রে বিরাজমানা সেই অদিতিকে [যঃ বেদ ন ততো বিজুগুপ্সতে] যিনি জানেন...। **এতত্ বৈ তত্** পূর্ববৎ ।।৭।।

গর্ভিণীভিঃ গর্ভিণীদের দ্বারা **সু-ভৃতঃ** সাবধানে সুন্দরভাবে রক্ষিত পোষিত **গর্ভঃ ইব** গর্ভের মত **অরণ্যোঃ নিহিতঃ** দুই অরণির মাঝখানে—এক্ষেত্রে চিৎশক্তি ও আধার, বা প্রণব ও আধার অর্থাৎ দেহ—স্থাপিত **জাতবেদাঃ অগ্নিঃ** প্রতিটি নবজন্মের সাক্ষী রূপকৃৎ অগ্নি **জাগৃবত্-ভিঃ হবিষ্-মত্-ভিঃ মনুষ্যেভিঃ** জাগ্রত অর্থাৎ উদ্বুদ্ধ সচেতন, হবির্যুক্ত আহুতি-উৎসুক মানুষের দ্বারা **ঈড্যঃ** উদ্দীপনীয় **দিবেদিবে** দিনের পর দিন, আলো থেকে আলোয় যাবার জন্যে। **এতত্ বৈ তত্** পূর্ববৎ।।৮।।

যতঃ চ যেখান থেকে **সূর্যঃ উৎ-এতি** সূর্য উদিত হয়, **যত্র অস্তম্ গচ্ছতি চ** এবং যেখানে অস্ত যায়, **তম্** সেখানেই **সর্বে দেবাঃ** সমস্ত দেবতা **অর্পিতাঃ** নাভিতে অর-বৎ মিলিত, লীন হয়ে আছেন। **কঃ চন** কেউই **তত্** তাকে **ন উ অত্যেতি** কিছুতেই অতিক্রম করতে পারে না। **এতত্ বৈ তত্** পূর্ববৎ।।৯।।

ইহ এখানে **যত্ এব** যা কিছু আছে **অমুত্র** ওখানে **তত্** তাই আছে। **অমুত্র** ওখানে **যত্** যা আছে **তত্ ইহ অনু** তাই এখানে অনুবৃত্ত, সন্তত হয়ে আছে। লোকে ও লোকোত্তরে একই সুতোর টানা-পোড়েন। **যঃ** যে **ইহ** এই অখণ্ডতার মধ্যে **নানা ইব** যেন সবকিছু আলাদা এইভাবে **পশ্যতি** দেখে, **সঃ মৃত্যোঃ মৃত্যুম্ আপ্নোতি** সে পায় মরণের পর মরণ; অথবা, মৃত্যু অর্থাৎ যমের কাছ থেকে সে প্রাকৃত মৃত্যুকেই পায়, উজ্জ্বল বৈবস্বত মৃত্যুকে নয়।।১০।।

মনসা এব মন দিয়েই **ইদম্ আপ্তব্যম্** একে পেতে হবে। **ইহ** এই অখণ্ডতার মধ্যে **কিং-চন** কিছুই **নানা** আলাদা আলাদা **ন অস্তি** নেই। **যঃ ইহ নানা ইব পশ্যতি সঃ মৃত্যোঃ মৃত্যুম্ গচ্ছতি**......সে মরণ থেকে মরণে যায়, পূর্ববৎ।।১১।।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততোবিজুগুপ্সতে।। এতদ্বৈ তৎ ।।১২।।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ। এতদ্বৈ তৎ ।।১৩।।

যথোদকং দুর্গে বৃষ্ঠং পর্বতেষু বিধাবতি।
এবং ধর্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি।।১৪।

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম।।১৫।।

ইতি কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমা বল্লী

আত্মনি শরীরে **মধ্যে** মাঝখানে, হৃদয়ে **ভূতভব্যস্য ইশানঃ** অতীত ও আগামীর নিয়ন্তা প্রভু **অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ** অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ বুড়ো-আংলা **পুরুষঃ** পরিপূর্ণ চৈতন্যের আলো **তিষ্ঠতি** আছেন। [য ইমং বেদ] **ন ততঃ বিজুগুপ্সতে** দ্রঃ ৫ম শ্লোক।।১২।।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ পূর্ববৎ **অধূমকঃ জ্যোতিঃ ইব** যেন ধূমহীন জ্যোতি। **ভূতভব্যস্য ঈশানঃ** পূর্ববৎ। **সঃ এব অদ্য** তিনিই আজ। **সঃ উ শ্বঃ** তিনিই কাল। অর্থাৎ তিনি **শাশ্বত**। **এতত্ বৈ তত্** পূর্ববৎ।।১৩।।

যথা যেমন **পর্বতেষু** পর্বতময় অঞ্চলে **দুর্গে** দুর্গমস্থানে **বৃষ্টম্ উদকম্** বৃষ্টি হলে সেই জল **বি-ধাবতি** বিচিত্র পথে চারিদিকে ছুটে ছড়িয়ে যায়, **এবম্** তেমনি **ধর্মান্** এক আত্মার বহু বিচিত্র ধর্মকে **পৃথক্ পশ্যন্** যে আলাদা দেখে, মনে করে সে **তান্ এব অনু-বি-ধাবতি** সেগুলির পেছনেই ছুটে চলে।।১৪।

গৌতম হে গোতম গোত্রীয়-নচিকেতা, **যথা** যেমন **শুদ্ধম্ উদকম্** শুদ্ধ জল **শুদ্ধে** শুদ্ধ জলে **আসিক্তম্** সিঞ্চিত হলে, ঢালা হলে **তাদৃক্ এব ভবতি** সেই রকমই হয়, জলে জল মিশে যায়, **বিজানতঃ মুনেঃ** বিজ্ঞানী একরসপ্রত্যয়ী অদ্বৈতদর্শী মুনির **আত্মা এবম্ ভবতি** আত্মাও সেরইরকমই হয়।।১৫।।

কঠোপনিষদে দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রথম বল্লী সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় বল্লী

পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে। এতদ্বৈ তৎ (১))

হংসঃ শুচিষদ্ বসুরন্তরিক্ষসদ্-
ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদ্
অব্‌জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ।।২।।

ঊর্ধ্বং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে ।।৩।।

অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ।
দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈ তৎ ।।৪।।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় বল্লী

অবক্রচেতসঃ চৈতন্যে বক্রতা-শূন্য (এঁকেবেঁকে আকার এঁকে চলছে নিরাকার, সৃষ্টি = বক্রতা) **অজস্য** জন্মহীন অনাদি অনন্তের **একাদশ-দ্বারম্ পুরম্** এগারো-দুয়ারী প্রাসাদে বা নগরে অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয়যুক্ত দেহে **অনুস্থায়** যাবৎ পরমায়ু অধিষ্ঠিত থেকে **ন শোচতি** জীবন্মুক্ত পুরুষ শোক করেন না। অর্থাৎ এ-দেহ সেই অনন্তের প্রাসাদ, সেই নিরাকার এঁকেবেঁকে এই আকার ধারণ করেছেন এইটি বুঝে দেহধারণের জন্য দুঃখিত হন না। **বিমুক্তঃ চ** আর যখন দেহের বন্ধন থেকে বিমুক্ত হন, দেহত্যাগ করেন, তখন, **বিমুচ্যতে** মুক্ত হতে যান। অর্থাৎ বিদ্বানের দেহধারণ এবং ত্যাগ দুইই সমান। **এতত্ বৈ তত্** পূর্ববৎ ।।১।।

আত্মা হলেন **শুচি-সদ্** শুচি অর্থাৎ উজ্জ্বল হৃদয়স্থ অগ্নিতে নিষণ্ণ **হংসঃ** হংস, সূর্য-মরাল, **অন্তরিক্ষ-সদ্ বসুঃ** অন্তরিক্ষে নিষণ্ণ জ্যোতি **বেদি-সদ্ হোতা** বেদিতে নিষণ্ণ আহ্বায়ক ও আহুতি-প্রদাতা ঋত্বিক্ **দূরোণ-সদ অতিথিঃ** দ্রোণকলশে বা গৃহে, তদ্রূপী দেহে নিষণ্ণ নিত্যপথিক অকস্মাদাগত সোম, আনন্দ **নৃ-সদ্** পুরুষে পুরুষে নিষণ্ণ **বর-সদ্** শ্রেষ্ঠ পুরুষে পুরুষে নিষণ্ণ **ঋত-সদ্** বিশ্বছন্দে আসীন **ব্যোম-সদ্** মহাশূন্যে মহাকাশে আসীন **অপ্-জা** বিশ্বসলিল হতে আবির্ভূত **গো-জা** অন্তর্গূঢ় পার্থিব জ্যোতি হতে আবির্ভূত বা ক্ষিতি হতে জাত **আদ্রিজা** পর্বত পাষাণ বা বজ্রকঠিন শূন্যতা হতে জাত **ঋতজা** বিশ্বছন্দ হতে উৎসাহিত **ঋতম্ বৃহৎ** বিপুল অনন্ত বিশ্বতান ।।২।।

প্রাণম্ প্রাণকে **ঊর্ধ্বম্** ওপরদিকে **উৎ-নিয়তি** তুলছেন **অপানম্** অপানকে **প্রত্যক্** ভেতরদিকে নিচে **অস্যতি** নিক্ষেপ করছেন যিনি, সেই **মধ্যে আসীনম্ বামনম্** শরীরের মধ্যস্থলে আসীন অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে **বিশ্বে দেবাঃ** সমস্ত চিত্তশক্তি, ইন্দ্রিয় **উপ আসতে** উপাসনা করে, শুশ্রূষু হয়ে কাছে বসে থাকে ।।৩।।

অস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ এই শরীরের মধ্যে যে দেহী রয়েছেন **বিস্রংসমানস্য** তিনি যখন শরীর থেকে খসে পড়েন, আলাদা হয়ে যান [জীবিত অবস্থায়, সাধনার দ্বারা, দ্র. ২।৩।১৭], তখন **অত্র** এ-দেহে **কিম পরিশিষ্যতে** কী অবশিষ্ট থাকে? **এতত্ বৈ তত্** পূর্ববৎ। এটি ও পরবর্তী কয়েকটি শ্লোক নচিকেতার প্রশ্নের সরাসরি উত্তর ।।৪।।

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ ।।৫।।

হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ।।৬।।

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম ।।৭।।

য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈ তৎ ।।৮।।

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ।।৯।।

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ।।১০।।

সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষু—
র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ।।১১।।

কঃ চন মর্ত্যঃ কোন মানুষ **প্রাণেন ন জীবতি** প্রাণ দিয়েও বাঁচে না, **অপানেন ন** অপান দিয়েও নয়। **ইতরেণ তু জীবন্তি** সবাই বাঁচে অন্যটি দিয়ে **এতৌ উভৌ** প্রাণ-অপান এই দুটিই **যস্মিন্ উপাশ্রিতৌ** যাকে অবলম্বন করে আছে; ।।৫।।

হন্ত গৌতম ওহে গৌতম নচিকেতা, **তে** তোমাকে **ইদম্ গুহ্যম্ সনাতনম্ ব্রহ্ম** এই নিগূঢ় শাশ্বত ব্রহ্মের **প্র-বক্ষামি** প্রবচন করব, উপদেশ দেব, **চ** এবং বলব **মরণম্ প্রাপ্য** মরণের পরে **আত্মা যথা ভবতি** আত্মার যা হয়।।৬।।

অন্যে দেহিনঃ কোন কোন দেহী, জীবাত্মা **শরীরত্বায়** শরীর গ্রহণের জন্য **যোনিম্ প্রপদ্যন্তে** মাতৃগর্ভের আশ্রয় নেয় **অন্যে** কেউ কেউ আবার **স্থাণুম্ অনু-সম্-যন্তি** স্থাণুত্ব, জড়ত্ব পায়, **যথাকর্ম** যার যেমন কর্ম **যথাশ্রুতম্** যার যেমন বিদ্যা সেই অনুসারে।।৭।।

সুপ্তেষু 'নির্ভয় নিদ্রিত ভুবনে' **যঃ এষঃ পুরুষঃ জাগর্তি** এই যে পুরুষ জাগেন **কামম্ কামম্ নির্মিমাণঃ** ইচ্ছামত কামনা আর কাম্য নির্মাণ করতে করতে **তত্ এব** সেই নির্দ্বন্দ্ব নির্বিশেষ অনির্দেশ্য অ-স্ত্রী-পুমান্ অলিঙ্গ সমানতাই **শুক্রম্** শুক্ল জ্যোতি, পরম উজ্জ্বল আলো, **তদ্ ব্রহ্ম** সেইটিই নিত্য-বিস্তার অনন্ত বৃহৎ, **তদ্ এব অমৃতম্** সেইটিই অমৃত, মৃত্যুহীন চির-আনন্দ-সত্তা **উচ্যতে** বলে উক্ত হয়, যাঁরা জেনেছেন তাঁরা বলেন। **তস্মিন্** সেই মহাসাম্যে পরমজ্যোতিতে **সর্বে লোকাঃ** সমস্ত ভুবন **শ্রিতাঃ** আশ্রিত। **কঃ চন** কেউই উ কিছুতেই **তত্ ন অতি-এতি** তাকে অতিক্রম করে, ছাড়িয়ে যেতে পারে না। **এতত্ বৈ তত্** পূর্ববৎ।।৮।।

যথা যেমন **একঃ অগ্নিঃ** একই অগ্নি, রূপকৃৎ শক্তি **ভুবনম্ প্রবিষ্টঃ** সৃষ্টির মধ্যে আবিষ্ট হয়ে **রূপম্ রূপম্** রূপে রূপে **প্রতিরূপঃ** তদ্রূপ, তদাকারিত হয়েছেন, **তথা** তেমনি **একঃ সর্বভূতান্তরাত্মা** এক আত্মা যিনি আছেন সর্বভূতের অন্তরে **রূপম্ রূপম্ প্রতিরূপঃ** রূপে রূপে তদ্রুপ হয়েছেন **বহিঃ চ** এবং আছেন বাইরেও—স্বরূপে।।৯।।

যথা যেমন **বায়ুঃ** বায়ু, প্রাণ **ভুবনম্ প্রবিষ্টঃ** সৃষ্টিতে আবিষ্ট হয়ে... পূর্ববৎ।।১০।।

যথা যেমন **সূর্যঃ** সূর্য **সর্বলোকস্য চক্ষুঃ** সমস্ত ভুবনের তথা সর্বজনের 'দর্শক-নয়ন', **চাক্ষুষৈঃ বাহ্যদোষৈঃ ন লিপ্যতে** চোখের বাইরের দোষের দ্বারা লিপ্ত হন না, **তথা** ঠিক তেমনই **একঃ বাহ্যঃ সর্বভূতান্তরাত্মা** সর্বভূতের অন্তরে বাইরে যিনি আছেন সেই এক আত্মা **লোকদুঃখেন ন লিপ্যতে** লোকের দুঃখের দ্বারা লিপ্ত হন না, কেন না তিনি **বাহ্যঃ** বাইরে আছেন অসঙ্গ সম্পৃক্ত হয়ে।।১১।।

একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।।১২।।

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একোবহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।।১৩।।

তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দেশ্যং পরমং সুখম্।
কথং নু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা ।।১৪।।

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।।১৫।।

ইতি কঠোপনিষদ দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়া বল্লী।।

একঃ এক **বশী** সর্বনিয়ন্তা **সর্বভূতান্তরাত্মা** পূর্ববৎ **যঃ** যনি **একম্ রূপম্** একটি রূপকে **বহুধা করোতি** বহু বিচিত্র অনেক করেন, **তম্** তাঁকে **যে ধীরাঃ** যে ধীরেরা **আত্মস্থম্ অনুপস্যন্তি** নিজের ভেতরে দেখতে পান নিরবচ্ছিন্নভাবে **তেষাম্** তাঁদেরই **শাশ্বতম্ সুখম্** চিরস্থায়ী সুখ লাভ হয়, **ন ইতরেষাম্** অন্যদের নয়।।১২।।

অনিত্যানাম্ নিত্যঃ সকল অনিত্যের মধ্যে যিনি নিত্য, অথবা **নিত্যানাম্ নিত্যঃ** যিনি নিত্যের মধ্যেও নিত্য, **চেতনানাম্ চেতনঃ** চেতনের মধ্যেও চেতন, **একঃ** অদ্বিতীয় একা একা **বহুনাং কামান্ বিদধাতি** বহুর কামনা বিধান করছেন **তম্...ধীরাঃ** পূর্ববৎ **তেষাম্ শাশ্বতী শান্তিঃ ন ইতরেষাম্** তাঁদেরই চিরস্থায়ী শান্তি লাভ হয়, অন্যদের নয়।।১৩।।

তত্ এতত্ সেই এই আত্মাকে আত্মতত্ত্বকে **অনির্দেশ্যম্ পরম্ সুখম্** অনির্বচনীয় মহাসুখ **ইতি** ব'লে **মন্যন্তে** মনে করেন, অনুভব করেন মরমীরা। **কথম্ নু** কেমন করে, বলো, কেমন করে **তত্ বিজানীয়াম্** তাকে জানুব আমি? **কিমু ভাতি** সে কি বলে? **কিমু বিভাতি** বা সে কি ফোটে? ।।১৪।।

তত্র সূর্যঃ ন ভাতি, ন চন্দ্রতারকম্
সূর্য ঝলে না, ঝলে না সেখানে তারকাচন্দ্র
ইমাঃ বিদ্যুতঃ ন ভান্তি, কুতঃ অয়ম্ অগ্নিঃ
ঝলে না তো এই বিদ্যুতেরাও, কোথা এ অগ্নি?

তম্ ভান্তম্ এব সর্বম্ অনুভাতি
সে-ই ঝলে, তাই ঝলে সে সঙ্গে বিশ্বনিখিল
তথ্য ভাসা ইদম্ সর্বম্ বিভাতি
তার বিভাতেই আলো হয়ে আছে এই সমস্ত ।।১৫।।

কঠোপনিষদে দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় বল্লী সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় বল্লী

ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈ তৎ ।।১।।

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্‌
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।।২।।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ।।৩।।

ইহ চেদশকদ্‌বোদ্ধুং প্রাক্‌ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে।।৪।।

যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্বলোকে
ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে।।৫।।

ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্‌ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ।
পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি।।৬।।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় বল্লী

এষঃ সনাতনঃ অশ্বত্থং এই অনাদি অনন্ত অশথ্ **উর্ধ্বমূলঃ** এর শেকড়গুলি ওপরদিকে **অবাক্-শাখঃ** ডালপালাগুলি নিচের দিকে। **তদেব শুক্রম্** ... দ্র. ২।২।৮ ।।১।।

ইদম্ এই **যত্ কিম চ** যা কিছু জগত্ গতিশীল **সর্বম্** সবই **প্রাণে এজতি নিঃসৃতম্** প্রাণে কাঁপছে, কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে আসছে। **মহত্ ভয়ম্ উদ্যতম্ বজ্রম্** তিনি মহাভয় উদ্যত বজ্র। **যে এতদ্ বিদুঃ** যারা একে জানে **তে অমৃতাঃ ভবন্তি** তারা অমৃত হয়।।২।।

অস্য ভয়াত্ অগ্নিঃ তপতি
ভয়ে এঁর অগ্নি জ্বলে
ভয়াত্ সূর্যঃ তপতি।
ভয়ে সূর্য ভায়।
ভয়াত্ ইন্দ্রঃ চ বায়ুঃ চ
ভয়ে ইন্দ্র, ভয়ে বায়ু
পঞ্চমঃ মৃত্যুঃ ধাবতি।।
পঞ্চম মৃত্যুও ভয়ে ধায়।।৩।।

শরীরস্য বিস্রসঃ প্রাক্ শরীর আলগা হয়ে খসে পড়ার আগে **চেত্** যদি **ইহ** এই দেহেই **বোদ্ধুম্** বুঝতে **অশকত্** পারে কেউ এই প্রাণব্রহ্মকে, **ততঃ** তাহলে **সর্গেষু লোকেষু** সৃষ্টির লোকে লোকে **শরীরত্বায় কল্পতে** শরীর পায়।।৪।।

যথা আদর্শে যেমন আয়নায় স্পষ্টভাবে প্রতিবিম্ব পড়ে, **তথা আত্মনি** তেমনি নিজের মধ্যে **দদৃশে** আত্মদর্শন হয়। **যথা স্বপ্নে** যেমন স্বপ্নে আবছায়াভাবে **তথা পিতৃলোকে** তেমনি পিতৃলোকে আত্মদর্শন হয়। **যথা অপ্সু পরি ইব দদৃশে** জলের মধ্যে যেমন ছড়িয়ে থাকে ছায়া **তথা গন্ধর্ব-লোকে** তেমনি করে আত্মদর্শন হয় গন্ধর্বলোকে। **ছায়াতপয়োঃ [দর্শনম্] ইব** আলো-ছায়ার মত আত্মদর্শন হয় **ব্রহ্মলোকে** ব্রহ্মলোকে।।৫।।

পৃথক্ উৎপদ্যমানানাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ আলাদা আলাদাভাবে উৎপন্ন ইন্দ্রিয়গুলির **যৎ পৃথগ্ভাবম্** যে পার্থক্য **উদয়াস্তময়ৌ চ** এবং উদয় ও অস্তময় অর্থাৎ উৎপত্তি এবং বিনাশ **মত্বা** সেটি মনন করে **ধীরঃ ন শোচতি** ধীর শোকমুক্ত হন।।৬।।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্।।৭।।

অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যপকোঽহলিঙ্গ এব চ।
যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বং চ গচ্ছতি।।৮।।

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য, ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো, য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।।৯।।

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ।।১০।।

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ।।১১।।

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।।১২।।

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি।।১৩।।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরম্ মনঃ ইন্দ্রিয়গুলির থেকে বড় হল মন, **মনসঃ সত্ত্বম্ উত্তমম্** মনের ওপরে হল সত্ত্ব। **সত্ত্বাৎ অধি** সত্ত্বের থেকে বড় **মহান্ আত্মা** মহৎ-তত্ত্ব, **মহতঃ** মহতের **উত্তমম্** ওপরে **অব্যক্তম্** অব্যক্ত। দ্র. ১।৩।১০ ।।৭।।

অব্যক্তাত্ তু অব্যক্তের চেয়েও কিন্তু **পরঃ** বড় হলেন **পুরুষঃ** পূর্ণচৈতন্য জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা যিনি **ব্যাপকঃ** সমস্ত ব্যাপ্ত করে রয়েছেন **অলিঙ্গঃ এব চ** এবং যিনি চিহ্নহীন উপাধিহীন বিশেষণহীণ স্ত্রীত্ব-পুংস্ত্ব-ভেদ-রহিত, **যম্ জ্ঞাতা** যাঁকে জেনে **জন্তুঃ** জীব **মুচ্যতে** মুক্ত হয় **অমৃতত্বম্ গচ্ছতি চ** এবং অমৃতত্বে পৌছয়। দ্র. ১।৩।১১।।৮।।

অস্য রূপম্ এর রূপ **সম্-দৃশে** স্পষ্ট করে দেখার জন্য **ন তিষ্ঠতি** দাঁড়িয়ে নেই। **কঃ চন** কেউই **চক্ষুষা** চোখ দিয়ে **এনম্ ন পশ্যতি** এঁকে দেখতে পায় না। **হৃদা মনীষা মনসা** হৃদয়ে মনে মনীষায় **অভি-ক্লৃপ্তঃ** ইনি রূপ পান, ধরা পড়েন, দানা বাঁধেন। **যে** যাঁরা **এতদ্** এই পরম তত্ত্বকে **বিদুঃ** জেনেছেন **তে** তাঁরা **অমৃতাঃ ভবন্তি** অমৃত হন।।৯।।

যদা যখন **মনসা সহ** মন সহ **পঞ্চ জ্ঞানানি** পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় **অবতিষ্ঠন্তে** চুপচাপ বসে থাকে, **বুদ্ধিঃ চ** এবং বুদ্ধিও **ন বিচেষ্টতি** নড়ে না, কাজ করে না **তাম্** সেই অবস্থাকেই **পরমাম্ গতিম্** পরম গতি **আহুঃ** বলেছেন মনীষীরা। ।।১০।।

তাম্ স্থিরাম্ ইন্দ্রিয়ধারণাম্ সেই স্থির ইন্দ্রিয়-ধারণকেই **যোগম্ ইতি মন্যন্তে** যোগ বলে মনে করেন মনীষীরা। **তদা** সেই অবস্থায় **অপ্রমত্তঃ ভবতি** যোগী অপ্রমত্ত হন। **যোগঃ হি** যোগ হচ্ছে **প্রভব-অপ্যয়ৌ** উদয় এবং বিলয় [এই দুয়ের মাঝখানে অপ্রমত্ত অবস্থা]।।১১।।

প্রাপ্তুম্ শক্যঃ তাঁকে পাওয়া যায় **বাচা ন এব** বাক্য দিয়ে তো নয়ই **ন মনসা** মন দিয়েও নয়, **ন চক্ষুষা** চোখ দিয়েও নয়। **অস্তি ইতি ব্রুবতঃ অন্যত্র** তিনি আছেন এই কথা বলা ছাড়া **কথম্** আর কিভাবে **তত্ উপলভ্যতে** সে-বস্তুর উপলব্ধি হবে? ।।১২।।

উভয়োঃ তত্ত্বভাবেন বিষয় ও বিষয়ী এই দুয়েরই চরম স্বরূপ যে-শূন্যতা তার ভাবনার দ্বারা, সেটিকে পশ্চাৎপটে রেখে, অথবা সোপাধিক ও নিরুপাধিক ব্রহ্মের তত্ত্বভাবনার দ্বারা, অথবা প্রভব ও অপ্যয় (দ্র. শ্লোক ১১)—এই দুয়ের চরম স্বরূপের অনুধ্যান করে **অস্তি ইতি এব** তিনি আছেন এই ভাবেই **উপ লব্ধব্যঃ** তাঁকে উপলব্ধি করতে হবে।

অস্তি ইতি উপলব্ধস্য এব আছেন—এই ভাবে উপলব্ধি হলে তবেই **তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি** তত্ত্বভাব প্রসন্ন হয় অর্থাৎ সাধককে বরণ করে।। ১৩।।

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।।১৪।।

যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনম্।।১৫।।

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি।।১৬।।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ।
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি।।১৭।।

মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা
বিদ্যামেতাং যোগবিধিং চ কৃৎস্নম্।
ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যু-
রন্যোঽপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব।।১৮।।

ইতি কঠোপনিষদ দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী।।

কঠোপনিষদ্ সমাপ্তম্

যে কামাঃ যে-সব কামনা **অস্য** এর, সাধকের **হৃদি শ্রিতাঃ** হৃদয়ে বাসা বেঁধে থাকে, **সর্বে** সে-সমস্ত **যদা** যখন **প্র-মুচ্যন্তে** একেবারেই শিথিল, আলগা হয়ে যায়, খসে যায়, **অথ** তখন **মর্ত্যঃ অমৃতঃ ভবতি** মর্ত্য মানুষ অমৃত হয়, **অত্র** এখানেই, এই দেহে, এই জীবনে, এই পৃথিবীতেই **ব্রহ্ম** ব্রহ্মকে, বৃহৎকে **সম্‌অশ্নুতে** সম্ভোগ করে।।১৪।।

যদা যখন **ইহ** এ-শরীরে এ-জীবনে **সর্বে হৃদয়স্য গ্রন্থয়ঃ** হৃদয়ের সমস্ত গাঁটগুলি **প্র-ভিদ্যন্তে** একেবারে টুটে যায় অথ **মর্ত্যঃ অমৃতঃ ভবতি** পূর্ববত্। **অনুশাসনম্** উপদেশ **এতাবৎ হি** এই পর্যন্তই।।১৫।।

হৃদয়স্য হৃদয়ের **নাড্যঃ** নাড়ী অর্থাৎ nerveগুলি **শতম্ চ একা চ** একশ' এবং এক। **তাসাম্** তাদের মধ্যে **একা** একটি **মূর্ধানম্ অভি-নিঃ-সৃতা** বেরিয়ে মাথার দিকে চলে গেছে। **তয়া** সেই সুষুম্না নাড়ী ধরে **ঊর্ধ্বম্ আ-যন্** ওপরদিকে যে যায় সে **অমৃতত্বম্ এতি** অমৃতত্বকে পায়, অমৃত হয়। **উত্ক্রমণে** এই ঊর্ধ্বমুখী গতিতে **অন্যাঃ** অন্য নাড়ীগুলি **বিষ্বক্ ভবন্তি** চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। শঙ্করপাদ ও শ্রীঅরবিন্দের মতে, অন্যান্য নাড়ী দিয়ে উৎক্রান্ত হলে তা বিচিত্র বহুবিধ সংসারগতির কারণ হয়।।১৬।।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ **অন্তরাত্মা পুরুষঃ** আত্মা-পুরুষ **সদা** সর্বদা **জনানাম্ হৃদয়ে** জীবের হৃদয়ে **সম্-নি-বিষ্ঠঃ** সম্যক্‌রূপে গভীরে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। **মুঞ্জাত্ ইষীকাম্ ইব** মুঞ্জঘাস থেকে তার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগটির মতো **তম্** সেই আত্মা-পুরুষকে **স্বাত্ শরীরাত্** নিজের শরীর থেকে **প্রবৃহেত্** নিষ্কাশিত করতে হবে। **তম্** তাঁকে **শুক্রম্ অমৃতম্** অমৃত জ্যোতিঃ স্বরূপ বলে **বিদ্যাত্** জানতে হবে। পুনরাবৃত্তি উপনিষত্-সমাপ্তি-সূচক। **ইতি** শেষ হল আমার অর্থাৎ যমের বক্তব্য।।১৭।।

অথ তখন **নচিকেতঃ** নচিকেতা **মৃত্যু-প্রোক্তাম্ এতাম্ বিদ্যাম্** যমের দ্বারা প্রবচনীকৃত অর্থাৎ উপদিষ্ট এই বিদ্যা **কৃত্স্নম্ যোগবিধিম্ চ** এবং তার সমগ্র প্রয়োগবিধি **লব্‌ধ্বা** লাভ করে **ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ** ব্রহ্মকে পেয়ে **বিরজঃ** রজোহীন, নির্মল, আসক্তিহীন এবং **বিমৃত্যুঃ** মৃত্যুহীন **অভূত্** হলেন। **অন্যঃ অপি** অন্য কেউও **যঃ** যিনি **অধ্যাত্মম্ এব** নিজের মধ্যেই **এবং-বিদ্** এইভাবে জানেন, তিনিও বিরজ বিমৃত্যু হন।।১৮।।

কঠোপনিষদে দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় বল্লী সমাপ্ত।

কঠোপনিষদ্ সমাপ্ত।

ভাষ্য

শান্তিপাঠ

প্রত্যেক উপনিষদের প্রারম্ভে শান্তিপাঠ রয়েছে। শান্তিপাঠ একটি আবহ বা atmosphere তৈরি করে। শান্তিপাঠ তিনচার ভাবের আছে। এখানে যে ভাব রয়েছে সেটা গুরুশিষ্যের ভাব। যম গুরু, নচিকেতা শিষ্য। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ গুরু, অর্জুন শিষ্য। যারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে চায় তাদের যেতে হয় যারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছে তাদের কাছে। 'প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' প্রথম নিজেকে জাগাতে হয়, তখন চিত্ত খানিকটা উঁচুতে ওঠে, এবং তার ফলে অনায়াসে অন্য উচ্চে-ওঠা চিত্তের কাছ থেকে গ্রহণ করার ক্ষমতা আসে। গুরুকে আচার্য বলা হতো আর শিষ্যকে অন্তেবাসী—আচার্যের কাছে যে থাকে। শিষ্যকে যেতে হত 'সমিৎপাণি' হয়ে, যজ্ঞের অগ্নিতে দেবার যোগ্য কাঠ নিয়ে। এটা একটা প্রতীক বা রূপক। শিষ্য কাঠ, গুরু অগ্নি। শিষ্য শুকনো কাঠের মত হয়ে যাবে। আচার্য প্রজ্বলন্ত অগ্নিস্বরূপ। অন্তেবাসী আসক্তি শূন্য। শুকনো কাঠের মত শুধু নিজেকে অর্পণ করবে বলে গিয়েছে। প্রথম যখন শিষ্য গুরুর কাছে যেত তাকে উপদেশ দেওয়া হত না। শুধু একটা সময়ের জন্য আচার্যের কাছে থাকতে হত। 'বস ব্রহ্মচর্যম্'। শুধু গুরুর সেবা, পরিচর্যা করবে। শুধু তাঁর আবহে থাকা, তাতেই অনেক কাজ হয়ে যেত। সেই কথাটি শঙ্করাচার্য একটা শ্লোকে খুব সুন্দরভাবে বলেছেন। তিনি দক্ষিণামূর্তি গুরু, শিবস্বরূপ গুরুর কথা বলেছেন :

চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌন-ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ।।

বটগাছের নীচে গুরু ও শিষ্যেরা বসে আছেন। আশেপাশে শিষ্যেরা, তারা বৃদ্ধ; মাঝখানে গুরু, তিনি যুবা। গুরু চুপ করে বসে আছেন, মুখে কিছু বলছেন না, কিন্তু তাঁর প্রভাবে শিষ্যদের সব সংশয় দূর হয়ে যাচ্ছে। বৌদ্ধদের ভিতরেও এরকম কথা রয়েছে। বুদ্ধের 'বচনম্ অবচনম্'। বুদ্ধ কথা বলেন না। না বলাটাই তাঁর সব বলা। তা বুঝতে হলে হতে হবে ইঙ্গিতজ্ঞ। সেই অধিকার লাভ করতে হবে।

শান্তিপাঠ গুরুশিষ্য দুই-এর জন্যই। আচার্য প্রশান্ত হবেন, অন্তেবাসীকেও প্রশান্ত হতে হবে। দুই জনেই অগ্নিময় হয়ে যাচ্ছেন। কঠোপনিষদ প্রবচনরূপে আছে, উত্তর-প্রত্যুত্তর রূপে আছে। কেউ বলছে, কেউ শুনছে। নচিকেতা শিষ্য যম গুরু। যম অর্থাৎ মৃত্যু, অর্থাৎ শূন্য। শিষ্যকে নচিকেতার মত, আর গুরুকে যমের মত হতে হবে। শিষ্য হবে অর্জুনের মত শুক্ল, শুভ্র, spotless এবং ঋজু, মৃদু। আর গুরু কৃষ্ণ, যাঁর রং নেই, শূন্যবৎ,

অথচ তাঁর আকর্ষণ শক্তি রয়েছে।

শান্তিপাঠের উক্তি আচার্যের উক্তি। **সহ নৌ অবতু**। 'অব্' মানে আগলে থাকা, বেষ্টন করে থাকা। তিনি আমাদের সকলকে আলোর মত জড়িয়ে থাকুন, আকাশের মত আবিষ্ট করে থাকুন। কে তা কিছুই বলা হয়নি। কারণ সে পরম শক্তি পরম জ্ঞান কি রকম তা বলা যায় না। সে অনির্বচনীয়।

সেজন্য এখানে কর্তা নেই। উপনিষদে একে তৎ বলা হয়েছে। সেই তিনি আমাদের দুইজনকে একসঙ্গে আবিষ্ট করে থাকুন, জড়িয়ে থাকুন। কোন সদ্‌গুরুর মাঝে অভিমান থাকে না। আমি শিষ্যকে এ পাইয়ে দেব, একথা বলেন না। তিনি জানেন পরমগুরুই গুরু। মানুষ গুরু তাঁর নিমিত্ত মাত্র। তাই বলা হয়েছে, উভয়ে তাঁর মাঝে আবিষ্ট হয়ে থাকুন। এক থেকে অপরে জ্ঞান সঞ্চারিত হয়। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'ওরে আমি কিছু বলিনা, মা যেন পিছন থেকে রাশ ঠেলে দেয়। মা এখন বলতে দিচ্ছে না' ইত্যাদি। মা-ই পরমতত্ত্ব, শূন্য। আর কঠোপনিষদের প্রতিপাদ্য বস্তুও শূন্য।

সহ নৌ ভুনক্তু। আচার্য ও অন্তেবাসী দুজনে আবেশ অনুভব করছে। এ স্তব্ধতার মাঝেও আমি রয়ে যায়। যখন আবিষ্ট হই তখন প্রসন্নতা আসে। কিন্তু তখন প্রশান্ত হতে হয়। রসাস্বাদ বর্জন করা চাই। তিনি আমাকে সম্ভোগ করছেন, সে ভাব আনতে হবে। তাই বলা হচ্ছে তিনি অর্থাৎ সে-শূন্যতা, সে-আকাশ, তোমাকে এবং আমাকে সম্ভোগ করুক। আমি আনন্দ পাচ্ছি সেটা ভাবা ভুল। নিজেকে সমর্পণ করতে হবে। তিনি সম্ভোগ করছেন, আমি সম্ভুক্ত। তাঁর আনন্দেই আমার আনন্দ। এটা সহজ অবস্থা, কিন্তু কঠিন। আমার সমস্ত কিছুকে তিনি সম্ভোগ করছেন, এ ভাবটা সহজে আসে না। বাধা আসে। এ বাধা দূর করবার জন্য শক্তি চাই। তাই বলা হচ্ছে—**সহ বীর্যং করবাবহৈ**।

আমরা একসঙ্গে যেন বীর্য করতে পারি। পথের যে বাধা, জ্ঞানের যে আবরণ, তা দূর করবার জন্য আত্মশক্তি উদ্যত করা চাই। এটা বীর্যের প্রকাশ। এটা সহজ অবস্থা থেকে একটু নেমে আসা। আবেশের ভাব, সম্ভুক্তের ভাব যদি সহজে আসে তাহলে এটার দরকার পড়ে না। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' দুর্বল হলে সাধনা করা চলে না। শক্তি অর্জন করতে হবে। সাধনা পরস্পরের সাহায্যে চলে। উভয়ের চেষ্টায় যেন উভয়ের বীর্যবান বীর্যবত্তর হয়ে উঠি এ দৃঢ় সঙ্কল্প রাখতে হবে যাতে একসঙ্গে উভয়ে বীর্য প্রকাশ করতে পারি। শুধু গুরু সব করে দেবেন, তা নয়। শিষ্যকেও উদ্যত থাকতে হবে।

তেজস্বি নৌ অধীতমস্তু। আমরা যা কিছু লাভ করব তা যেন অধিকতর বীর্যবৎ হয়, তা যেন তেজস্বী হয়; এটা সিদ্ধের প্রার্থনা। পরম তত্ত্বকে জানব, বীর্যকে প্রকাশ করব। তেজের ধর্ম নিজেকে বিকিরণ করা। তার ভিতরে একটা dynamism থাকে। তেজের মূল অর্থ (তিজ্ ধাতু) তীক্ষ্ণ, শান দিয়ে তৈরি করা। নিজের মাঝে নিজেকে তীক্ষ্ণ শাণিত করছি। জ্ঞানের একটা dynamism রয়েছে। জ্ঞানকে 'বিকিরণ' করার শক্তি পেয়েছি। আমাদের মালিন্য দূর হয়ে যাবে, অন্তেবাসীর মালিন্য দূর হয়ে যাবে, জগতের মালিন্য দূর হয়ে যাবে। আমার মাঝে যে আগুন জেগে উঠেছে অপরের মাঝে সেটা জ্বালিয়ে দেব। এটা positive কথা।

এখন negative—**মা বিদ্বিষাবহৈ**। আমরা পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। অনেক সময় গুরুশিষ্যের মাঝে একটা বিদ্বেষভাব এসে পড়ে। শিষ্যের মাঝে সংশয় আসে। শিষ্যের

তরফ থেকে এটা আসা স্বাভাবিক। অনেক শিষ্য শুকনো হয়ে, রিক্ত হয়ে যায় না, ভিজে কাঠ নিয়ে যায় তাই ধোঁয়া উঠলে সরে যায়। গুরুরও ত্রুটি থাকে। 'সব আমি দেব না।' কিন্তু তাকে সদ্‌গুরু বলা যায় না। যাঁরা সদ্‌গুরু তাঁরা বুদ্ধের মতো। তিনি বলেন আমার মুষ্টি খোলা, আমি কিছু বন্ধ করে রাখি না, কিছু গোপন রাখি না। সব দিচ্ছি। শিষ্য ভেজা কাঠ নিয়ে যাবে না, গুরুও কৃপণ হবে না। শিষ্যের সব সমর্পণ করার প্রস্তুতি থাকা উচিত, গুরুরও উদার হওয়া উচিত।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম বল্লী

১।। এই উপনিষদে সমস্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞান একটা আখ্যায়িকা দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে। বাজশ্রবস নামে এক ঋষি ছিলেন, তিনি বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করলেন। এই যজ্ঞে নিজের সর্বস্ব আহুতি দিতে হয়; কিন্তু বাজশ্রবসের মন থেকে কামনা যায় নি, তাই তিনি সর্বস্ব দিতে পারলেন না। তাঁর পুত্র নচিকেতা পিতার যজ্ঞের সফলতার জন্য নিজেকে দিতে চাইলেন। নচিকেতা কিভাবে যমের কাছে যাচ্ছেন আর কিভাবে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করছেন সেটা এই আখ্যায়িকতার মূল বস্তু।

বাজশ্রবস ও নচিকেতা দুজন দুপ্রকারের সাধক। বাজশ্রবস সকাম সাধক। সাধারণ সাধক এই ভাবেরই হয়ে থাকে। নচিকেতা আর এক প্রকারের সাধক। সাধককে হতে হবে নচিকেতার মতো।

আমরা দেখি কোনো সাধনা বা অধ্যাত্মবিদ্যা তিনপুরুষে ব্যাপ্ত হয়। বাজশ্রবসের পিতার নাম বাজশ্রবাঃ। মনে হয় তিনি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। 'শ্রবস্' অর্থ শ্রুতি। পরমতত্ত্বকে যিনি শ্রুতি দিয়ে লাভ করেছেন। মহাশূন্যের শ্রুতি যিনি কান দিয়ে শুনতে পান। 'বাজ' অর্থাৎ বজ্রতেজ; যাঁর শ্রুতিতে বজ্রতেজ রয়েছে তিনি বাজশ্রবাঃ। পরমতত্ত্বকে তিনি জেনেছিলেন সে-জানাতে তাঁর মাঝে বজ্রশক্তির আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর ছেলে বাজশ্রবস। তিনি পিতার পদানুসরণ করছেন। তাঁর উদ্দেশ্য বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করবেন। সমস্ত বিশ্বকে জয় করবেন। সূর্যই বিশ্বজিৎ, তাই সূর্যের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চান। সমস্ত যজ্ঞ হচ্ছে একটা উৎসর্গের সাধনা—(ইদং তব, ন মম)। 'আমি'-'আমার' ভাব ছাড়া-ই যজ্ঞ। বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অর্থ হচ্ছে সমস্ত ছাড়তে হবে। বাইরের অন্তরের সমস্ত বিত্ত যদি দিতে পার তাহলে সৌর সত্তা প্রকাশ পাবে। বাজশ্রবস সংকল্প করলেন বিশ্বজিৎ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে সূর্যের মতো হব। তার জন্য তিনি তাঁর সব কিছু দেবেন। কিন্তু তাঁর ভিতরে একটা কামনা ছিল। তাঁর ভিতরে আমি সম্ভোগ করব সে ভাবটা রয়ে গিয়েছে। তাঁর ভাবের ভিতরে চুরি ছিল। এ এক প্রকারের সাধক যার কামনা রয়েছে। সাধারণতঃ সাধকের মধ্যে দুই শক্তি কাজ করে ঃ এক পিতৃশক্তি আর এক পুত্রশক্তি। পিতৃশক্তি সিদ্ধশক্তি, যাদের অনুগমন করা হচ্ছে। সাধকের ভিতরে সে-শক্তি সক্রিয় থাকে। তাকে গ্রহণ করে সে এগিয়ে যেতে চায়। আর তার ভিতরে যা গলদ থাকে তাকে নিস্তার করে তার পুত্রশক্তি। নিজের কামনা সে দূর করে আর পুত্র ব্রহ্মবিদ্ হয়ে যায়। গুরু শিষ্যের মাঝেও ঐরকম হয়। গুরু যদি second বা third rate হন, শিষ্য তাঁকে অতিক্রম করে যায়।

নচিকেতা—'ন-চিকেতা', যে জানেনা (one who has not known) বাজশ্রবস

জানে না, কিন্তু মনে করে যে জানে। কিন্তু সত্য বলতে গেলে সে কিছুই জানে না। কেন-উপনিষদে বলা হয়েছে, 'দভ্রম্ এবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্...।' যদি তুমি মনে কর তুমি জান, তাহলে কিছুই জান না। যদি মনে কর জান না, তাহলে কিছু জেনেছ। নচিকেতা সত্যকার সাধক, তার অবস্থা সাদা কাগজের মত, clean slate-এর মতো। তার চিত্ত পরিষ্কার। সত্যকার সাধক শূন্য রিক্ত হয়ে আসে। আমরা দেখব নচিকেতা জ্ঞান লাভ করবে। তার পিতা যিনি শ্রোত্রিয় ছিলেন, আর জানেন বলে যাঁর অভিমান ছিল তিনি পরম জ্ঞান থেকে বঞ্চিত রইলেন। শেষে ছেলেই তাঁকে উদ্ধার করবে।

সাধারণত জগতে পুত্রৈষণা থাকে, আমার যেন পুত্র হয় যে আমার কাজ পূর্ণ করবে। আধ্যাত্মিক জগতেও আমাদের মাঝে ফুটে ওঠে "তোক তনয়"। ত্বক্—চামড়া বা স্পর্শ। যখন divine touch আসে তখন সেই বিশ্বাত্মা আমাদের মাঝে জন্ম নেয়। তখন সে বাড়তে থাকে। যেন আমাদের মাঝে পুত্রের জন্ম হল। যখন সে খুব বেশি করে বাড়তে আরম্ভ করে তখন যেন নাতি হল। তাই ঋগ্‌বেদে পুত্র চাই, পৌত্র চাই বলা হয়েছে। নচিকেতা বাজশ্রবসের তোক তনয়।

২।। যখন যজ্ঞে দক্ষিণা দেওয়া হচ্ছিল তখন নচিকেতা, যে কুমার ছিল, তার মাঝে শ্রদ্ধার আবেশ হল। দক্ষিণা-শব্দের গূঢ়ার্থ রয়েছে। ঋগ্‌বেদের অনেক শব্দের কদর্থ (misinterpretation) করা হয়েছে। দক্ষিণা শব্দকেও ভুল বোঝা হয়। ঋগ্‌বেদে দক্ষিণা সূক্ত রয়েছে। দক্ষ মূল শব্দ, দশ্ ধাতু থেকে। √দশ্ = to be active। অর্থাৎ dynamism বোঝাচ্ছে। এ থেকে dexterous, দক্ষতা, দক্ষ প্রজাপতি। প্রজাপতির সিসৃক্ষা, সৃষ্টি করবার ইচ্ছা। বিশ্বের মূলে যিনি রয়েছেন তিনি অদিতি। অদিতি থেকে দক্ষ আবার দক্ষ থেকে অদিতি। ইনি লোকোত্তর শক্তি, যার থেকে সাধনবীর্য উৎপন্ন হয়। দক্ষ প্রজাপতির কনিষ্ঠা কন্যা দাক্ষায়ণী। একদিকে কর্মশক্তি, আর একদিকে দেবতার প্রসাদ। দক্ষিণার অর্থ প্রসাদ। দেবতার প্রসাদ থেকে আসে দক্ষতা। আমাদের এই যজ্ঞ দেবতাদের যজ্ঞের অনুকরণ। Pattern একই। আধ্যাত্মিক যজ্ঞে যে আধ্যাত্মিকশক্তির উন্মেষ হয় সে দেবতার দাক্ষিণ্যহেতু। তার প্রসাদ আমাদের মাঝে কৃতজ্ঞতার ভাব আনে। এ কৃতজ্ঞতা বোধ আসা উচিত পুরোহিত ও যজমানের মাঝে, গুরু শিষ্যের মাঝে। যিনি পুরোহিত তিনি লোকোত্তরের প্রতিভূ, তিনি লোকাত্তরের শক্তি নামিয়ে আনেন। সেটা হল তাঁর দক্ষতা বা দাক্ষিণ্য। আমার সমস্ত দিয়ে দেওয়া, সেটা হল শিষ্যের দক্ষিণা। গুরুর মাঝে দাক্ষিণ্য প্রথম আসে। শঙ্করাচার্য গুরুকে দক্ষিণামূর্তি বলেছেন। ঋগ্‌বেদের মন্ত্রে আছে 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং'...। প্রথম রুদ্ররূপে পরে প্রসাদরূপে। তন্ত্রে দক্ষিণাকালীর রূপক রয়েছে। দক্ষিণামূর্তি গুরু আকাশবৎ। বটগাছ, যেন ভিতরে ফাঁপা, তার ভিতরে যদি প্রদীপ রাখা যায়, ভিতরের আলো সব বাইরে বেরিয়ে আসে। সব সময় গুরু নিত্য সত্য। তাঁর চিত্ত দর্পণের মতো। সমস্ত বিশ্ব তার ভিতরে প্রতিবিম্বিত হয়। মৌন দিয়ে সকলের সংশয় দূর করেন। যেন মূর্তিমান চিৎশক্তি, 'মৌনব্যাখ্যা-প্রকটিত-পরব্রহ্ম-তত্ত্বম্'। এ দাক্ষিণ্য শিষ্যের মাঝে যখন বিকিরণ হয় তখন শিষ্য সব দিতে চায়। বাজশ্রবস সব দিতে চেয়েছিলেন সূর্যের মতো হওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি সব দিতে পারেন নি। দক্ষিণা দেওয়া হত 'গো'এর। 'গো' অর্থাৎ আলো বা ইন্দ্রিয়। দেবতা প্রথমে 'গো' দেন, সেজন্য দেবতা 'গবেশ'। আমাদের মাঝে আলো রয়েছে, তাকে খুঁজে বার করতে হবে, আমাদের মাঝে যে দেবতা

আছেন তিনিই খুঁজে বের করে দেবেন, সেটা দেবতার 'গোদান'। আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় দেবতাকে দিতে হবে, সেটা আমাদের গোদান। দেবতার গোদান দাক্ষিণ্য, আমাদের গোদান দক্ষিণা। ইন্দ্রিয়ের প্রতীক রূপে গোদান, সমস্ত ইন্দ্রিয় তাঁকে দিয়ে সম্পূর্ণরূপে তাঁর হচ্ছি। গো-(বিত্ত) সুলক্ষণা ও সমর্থ হওয়া চাই। আমাদের সমর্থ ইন্দ্রিয়-গ্রামই তাঁকে দিতে হয়।

বাজশ্রবস সম্পূর্ণ দিতে পারেন নি। তখন শ্রদ্ধা উৎপন্ন হলেন নচিকেতার ভিতরে। নচিকেতা, যে এখন পর্যন্ত জানে না। তার চিত্ত কিশোর চিত্ত—'কুমারং সন্তম্'। অধ্যাত্মভাব কিশোর-চিত্তে জাগে। সাধনা সহজ হয় যদি কিশোর ভাব বজায় রাখি। চাঁদের কলা যেমন বাড়তে থাকে, কলায় কলায় ষোড়শকলা পর্যন্ত আবির্ভাব হয়, সেরকম ছেলেও ষোড়শবর্ষ পর্যন্ত কুমার থাকে। সাধকের নিজের চিত্ত ষোড়শবৎসরের নীচের কুমার-কুমারীর মতো রাখতে হবে। এখনকার মনোবিজ্ঞানীরা adolescent age কৈশোর অবস্থাকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন। আমাদের কিশোর চেতনাকে জাগ্রত করতে হবে। বৈষ্ণবেরা সেজন্য বলতেন, কৈশোরভাবের ধ্যান করি। সমস্ত বৃন্দাবনলীলা কৈশোর চেতনার লীলা। বাজশ্রবস পাকা, বৃদ্ধ, ঝানু। রবীন্দ্রনাথের কথায়, অতিরিক্ত অভিজ্ঞতা একটা উপাধি, বাহিরের চেতনাকে ঝানু করে। নচিকেতার কিন্তু কৈশোর চেতনা। তাই তার ভিতরে শ্রদ্ধা আবিষ্ট হল বলা হয়েছে। তিনি আবিষ্ট হন। তিনি নিজে আবিষ্ট না হলে কিছু হয় না। যেমন আদিত্য থেকে রশ্মি ছিটকে পড়ছে, জড়ে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে। ব্রহ্মতালুকে বিদীর্ণ করে তিনি আমাদের ভিতরে হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হন। হৃদয় হল চেতনার কেন্দ্রবিন্দু। এই উপনিষদে বলা হয়েছে—'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা, সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। তিনি সূর্যমণ্ডল থেকে এসেছেন। এই আবেশ সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। যুক্তি দিয়ে তা হয় না। শ্রদ্ধা দিয়ে সেটা আসে। শ্রদ্ধা প্রাচীন শব্দ। শ্রৎ+ধা = শ্রদ্ধা। শ্রতের অর্থ হৃদয়, heart, শ্রৎ থেকে cord, cordial, cardiograph ইত্যাদি। সুতরাং শ্রৎ—heart centre, হার্দজ্যোতি। হার্দজ্যোতিকে নিহিত করা, তার সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, সেটাই শ্রদ্ধা। সূর্যের রশ্মি যে আমাদের মাঝে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে তার অনুধাবন করা। 'তৎ সবিতু র্বরেণ্যম্' সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, তারপর তাকে আবাহন করা, আবর্তন repeat করা। দেবতার অনুকৃতি আমাদের করতে হবে। তিনি যেভাবে এসেছেন সেভাবে চিন্তা করলে তিনি আবার আসবেন, উদ্ভূত হবেন, জেগে উঠবেন হৃদয়ে। 'ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ'—তিনি আকর্ষণ করছেন। যেন শ্রীকৃষ্ণ আকর্ষণ করছেন। রাধা বা আরাধিকা তাঁর দিকে ছুটে চলেছে। গায়ত্রী মন্ত্র, 'আমি তোমাকে ডাকছি তুমি আমাকে হৃদয়ে এসে স্পর্শ কর'। এই প্রচোদনা সমস্ত কাল ধরে চলেছে। তান্ত্রিকরাও বলেন প্রত্যেক জীবের মাঝে প্রকৃতি যোগিনীহৃদয়রূপে রয়েছেন। যোগিনীহৃদয় আদিত্যহৃদয়কে আকর্ষণ করে। 'যদিদং হৃদয়ং মম তদিদং হৃদয়ং তব'। বিবাহ প্রসঙ্গে পুরুষ হৃদয়দান করছে কন্যাকে, কন্যা হৃদয়দান করছে পুরুষকে। দুয়ের সম্প্রয়োগ। এই শ্রদ্ধা আবিষ্ট হয় যখন তার সময় হয়, তখন তিনি নিজেই জাগিয়ে দেন। যেমন রূপকথায় আছে সাতসমুদ্দুর পার হয়ে রাজপুত্র এসে ঘুমন্ত রাজকন্যাকে জীয়ন কাঠি সোনার কাঠি ছুঁইয়ে জাগিয়ে তুললেন। এই শ্রদ্ধা কিশোর চেতনায় আবিষ্ট হয়। জগৎ জুড়ে যে যজ্ঞ চলছে সেটা কৃত্রিম, ভান, তাতে কামনা রয়েছে। কারও কারও মাঝে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। এখানে নচিকেতার মাঝে শিষ্যশক্তি ও

গুরুশক্তি ফুটে উঠছে। সমস্ত জগতে দক্ষিণার নামে ফাঁকি চলছে। শ্রদ্ধা এলে সত্যদর্শন আসে, আত্মদানের আকাঙক্ষা আসে।

৩।। নচিকেতা বলছেন দক্ষিণারূপে যা দেওয়া হচ্ছে সে সব গো **পীতোদকাঃ** যাদের জল শেষবারের মতো খাওয়া হয়ে গিয়েছে, **জগ্ধতৃণাঃ** যাদের ঘাস খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে, **দুগ্ধদোহাঃ** যাদের সমস্ত দুধ নিংড়ে নেওয়া হয়েছে, যারা আর দুধ দিতে পারবে না, **নিরিন্দ্রিয়াঃ** যাদের কোনো ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য নেই। এরকম গো যারা দেয় তারা **আনন্দলোকে** যায়। আত্মদানের পরিণাম আনন্দকে সহজে পাওয়া। কিন্তু এরকম মূঢ় চেতনা দান করলে কিছু হয় না। সমস্তই একটা প্রহসনে farce-এ পর্যবসিত হয়। সত্যকার দানে কিছু চাইতে নাই, শুধু দিয়ে যাওয়া। বাজশ্রবসের মাঝে কামনা রয়েছে, সম্ভোগের আকাঙক্ষা রয়েছে। সে সুখ পেতে পারে কিন্তু আনন্দ পাবে না। নচিকেতা এর প্রতিকার করতে চায়।

সমস্ত আখ্যায়িকা পিতাপুত্রের কাহিনীর উপর ফুটে রয়েছে। তার সঙ্গে আধ্যাত্মিক গূঢ়ার্থ মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। পিতার ত্রুটি আমি পূরণ করব, পিতা আত্মদান করতে পারলেন না, তার সুযোগ করে দিতে হবে, তার জন্য আমি নিজেকে দেব। এই ভাব নচিকেতার মাঝে জেগে উঠেছে। আগে যে অবস্থাগুলির কথা বলা হয়েছিল তার তৃতীয়টির কথা এখানে পাচ্ছি। পরম তত্ত্বকে লাভ করে নচিকেতা ফিরে আসতে চায়। ফিরে এসে সমস্ত জগৎকে সুন্দর করব, তার জন্য আত্মোৎসর্গ বা আত্মদান প্রথম থেকেই আসে। বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ে এটা তত্ত্বরূপে স্থান পেয়েছে। বোধিসত্ত্ব সম্যক্‌সম্বুদ্ধ হওয়ার জন্য সাধনার সঙ্কল্প করলেন। শুধু নিজের জন্য নয়, বিশ্বের জন্যও। শঙ্করাচার্য সেটাই বলছেন 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'। এই যুগে এই কথা স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন। এই motive নতুন নয়। আগে থেকে চলে এসেছে। নচিকেতার ভেতরে আমরা সেটা দেখতে পাই।

৪।। নচিকেতা বাবাকে প্রশ্ন করছেন, 'তুমি আমাকে কাকে দেবে? এই যজ্ঞে সমস্ত দিতে হয়। তবে এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে। কিন্তু তুমি তো সব দাওনি।' সব দিলে সব পাওয়া যায়। Christian ধর্মে Christ-এর Sacrifice এবং তার থেকে সবার redemption একই কথা সূচিত করে। Christ তাই করছেন, জগৎ পিতাকে বলছেন ঃ সমস্ত জগতের যা মালিন্য তা দূর করবার জন্য তুমি আমার sacrifice নাও, আমার আত্মদান গ্রহণ কর, জগৎকে সুন্দর কর। নচিকেতাও সেই কথা বলেছে। কিন্তু বাজশ্রবস ঠিক সেটা বুঝতে পারলেন না। তিনবার বলার পর তিনি রাগ করে বললেন, তোমাকে যমকে দিলাম।

যমের কাছে যাওয়া মানে সূর্যদ্বার ভেদ করে মহাশূন্যে যাওয়া, যেখানে দেবযান পথ বিস্তৃত। 'সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।' কিশোর চেতনা আবিষ্ট হলে সূর্যপথ খুলে যায়। অসৎ লোক মৃত্যুলোক, মহাশূন্য। উপনিষদে অসৎ ও মৃত্যু এক। মৃত্যু 'মৃ' ধাতু থেকে। তার দুটো অর্থ, এক মরে যাওয়া যখন চেতনা ও প্রাণ আধার থেকে চলে যায়। সে সাধারণ মৃত্যু। প্রাকৃত জীবের এভাবে মৃত্যু হয়। যারা সাধক তাদের মৃত্যু এইভাবে হয় না। তাদের হৃদয়ে প্রদ্যোত জাগে। প্রাকৃত মৃত্যু কয়লার নিভে যাওয়ার মতো। যোগীর মৃত্যু যখন হয় তখন প্রদ্যোৎ জ্যোতি flash ক'রে বিকীর্ণ বা বিচ্ছুরিত হয়ে ওঠে। সৌর পথ বা সুষুম্না নাড়ী ধরে মস্তকের সৌরমণ্ডল (ব্রহ্মরন্ধ্র) ভেদ করে এগিয়ে চলে

যায়। মৃ ধাতুর তাই আর একটা অর্থ, আলো, প্রদ্যোত, ঝলমল করা। বিশ্বপ্রাণ 'মরুৎ' এই একই ধাতু থেকে এসেছে। যোগী মৃত্যুর পর মরুৎগণে মিলিয়ে যায়। মরুৎগণ Shining powers of the Divine, দীপ্যমান দিব্যশক্তি বা সূর্যের জ্যোতি। হৃদয়ের প্রদ্যোৎ ঘা খেয়ে জেগে ওঠে। সামান্য চেতনা ঘা খেলে মুষড়ে যায়। কিন্তু কেউ কেউ ঘা খেলে আরো জ্বলে ওঠে। রামপ্রসাদ বলেছেন—'আমি কি মা দুখেরে ডরাই'। দুঃখ সেখানে অবসাদ আনে না। আনে চেতনার আলো। এই মৃত্যুশক্তি সেই চৈতন্যদীপ্তি, গুরুশক্তি। নচিকেতা যাঁর সম্মুখীন হবে তিনি প্রদ্যোতের রূপ। নচিকেতার চেতনা উদ্বুদ্ধ চেতনা। সে দেবযানের পথ দেখতে পায়, আলোর পথে এগিয়ে যেতে চায়। চরম প্রাপ্যের সম্বন্ধে তার সচেতনতা আসে। নচিকেতার সে-vision আছে, সে-দৃষ্টির উন্মেষ ঘটেছে।

সাধনা করতে গেলে মরতে হয়, যমের কাছে যেতে হয়। বাউলরা একেই বলেন 'জ্যান্তে মরা'।

৫।। এটা হচ্ছে নচিকেতার আত্মজিজ্ঞাসা—তার সচেতনতা। মৃত্যুর স্বরূপকে সে Vision-এ দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেল। মৃত্যুর পথে কে আমাকে নিয়ে চলেছে? কিসের জন্য? জানিনা তবু যেতে হয়। রহস্য সম্বন্ধে সচেতনতা আছে, কিন্তু রহস্য তখনও অনাবৃত হয়নি। বৈষ্ণবশাস্ত্রে বলে 'সাধ্বস', হৃদয়ের একটা দুরুদুরু ভাব। মেয়েরা যখন প্রথম স্বামীর কাছে যায় তখন সে ভাব জাগে। নচিকেতার হৃদয়ে আজ সেই ভাব।

নচিকেতা বলছেন, পিতার অনেক শিষ্য আছে। আমি একটি মাত্র পুত্র। অনেকের থেকে আমি উত্তম, অনেকের মাঝে মধ্যম, কিন্তু অধম কখনোই নই। শ্রদ্ধার জন্য তার জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, আত্মপ্রত্যয় জেগেছে। গীতাতে বলা হয়েছে 'উদ্ধরেৎ আত্মনা আত্মানম, নাত্মানম্ অবসাদয়েৎ'। নিজেকে কখনও হীন মনে করবে না। অভিমান নয়, কিন্তু 'তোমার গরবে গরবিনী আমি।' আমি উত্তম না হতে পারি কিন্তু কনিষ্ঠ নই।

নচিকেতা আজ যে পথে চলেছে সে আলোর পথ। কিন্তু অনির্দিষ্ট পথ। আমাকে নিয়ে যম কী করবে? নচিকেতা আত্মদানের জন্য নিজেকে তৈরি করেছে। আমি আমার সম্পূর্ণ বা সমস্ত দিতে চললাম। কিন্তু আমাকে নিয়ে তিনি কী করবেন তা জানি না।

৬।। এটা নচিকেতার Vision বা দিব্যদর্শন বা অনুভূতি। অশরীরী বাণী যেন বলছে। কেউ যেন নচিকেতাকে দেখিয়ে দিচ্ছে। **প্রতিপশ্য**—সামনের দিকে দেখ। **অনুপশ্য**—সামনে পিছনে সব দিকে দেখ। আগে পিছে সব দিকে সে দেখছে। সমস্ত প্রাণীবর্গ শস্যের মত মরে যাচ্ছে, আর শস্যের মত জন্মাচ্ছে! এরকম Vision বা দর্শন স্বাভাবিক। আগে জগৎকে জানতে হবে, জেনে তাকে পার হয়ে যেতে হবে। জন্মমৃত্যুর আবর্তন চলেছে। বাজশ্রবস সে আবতনের বাইরে যেতে পারেন নি। বৌদ্ধরা বলতেন 'সর্বম্ অনিত্যম্'। জগৎ একটা চক্র। সমস্ত জগৎ চক্রের মত ঘুরছে। চক্রের উপমা সর্বত্র দেখতে পাই। আদিত্যলোকে না পৌছান পর্যন্ত এর শেষ নেই। এ একবার ওঠে একবার নামে। যিনি চালাচ্ছেন তিনি এর উর্ধ্বে। যিনি সূর্যে প্রতিষ্ঠিত হন, তাঁর ভিতরে এভাব থাকে না। নচিকেতা সূর্য পথ ধরে যাবে। তার আগে পিছনের জগৎকে সে দেখে নিচ্ছে।

৭।। হৃদয়ের প্রদ্যোৎকে ধরে, সূর্যপথ ধরে নচিকেতা এগিয়ে চলেছে। প্রথম আলো, পরে অন্ধকার রাত্রি। এমনি তিন রাত্রি পার হচ্ছে। গল্প এগিয়ে চলেছে। ঋগ্‌বেদে একটা সূক্তে (১০।১৩৫) এর আভাস রয়েছে, 'কুমার যামায়ন।' তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩।১১)এ

গল্প বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। দ্র. বেদমীমাংসা ১।৮৬-৯২ পৃ.। সেখান থেকে কঠোপনিষদে গল্পটাকে নেওয়া হয়েছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে নাচিকেত অগ্নি প্রসঙ্গে আখ্যায়িকার বর্ণনা আছে। উপনিষদে তার দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা। বেদে রাহস্যিক (mystic), ব্রাহ্মণে আনুষ্ঠানিক (ritualistic), আর উপনিষদে দার্শনিক (philosophical) ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনটি রাত্রি হচ্ছে three darknesses, তিনটি গ্রন্থি। ব্যক্তি-চৈতন্যের তিনটি গ্রন্থি। ব্রহ্মগ্রন্থি নাভিতে, বিষ্ণুগ্রন্থি হৃদয়ে, রুদ্রগ্রন্থি ভ্রূমধ্যে। এ তিন গ্রন্থি ভেদ করা চাই। নচিকেতা তিনটি রাত্রি, গ্রন্থি ভেদ করে তুরীয় অবস্থায়, চতুর্থ স্থানে এসেছে।

ব্রহ্মগ্রন্থি প্রাকৃত চেতনার গ্রন্থি। নচিকেতার Vision পুনঃ পুনঃ মৃত্যু, সে দেখল সব বারবার মৃত্যুর কবলিত হচ্ছে। অবিদ্যা 'আমি' অবলম্বন করে থাকে। যারা প্রাকৃত জীবন সমৃদ্ধ করতে চায় তারা নাস্তিক। এরা ব্রহ্ম-প্রজাপতির গ্রন্থিতে বাঁধা পড়েছে, মৃত্যুর পাশে বাঁধা পড়েছে। এটা একটা রাত্রি। এখানে অভীপ্সা জাগে। বিদ্যাভীপ্সা জাগে। নচিকেতার ভিতরে তা জেগেছে। জাগলেও তার আশেপাশে বেষ্টনী থাকে। সমৃদ্ধির বন্ধন থাকে। তাকে ছাড়িয়ে যেতে হবে।

এ রাত্রিগুলি নিজের চেষ্টায় পার হওয়া যায় না। প্রসাদ, কৃপা চাই। কিন্তু নিজেকে সচেতন হতে হয়। 'সমনস্ক' 'শুচি'। প্রথম রাত্রি ব্রাহ্মী রাত্রি, ব্রাহ্মী মায়া। এ মায়াতে আধ্যাত্মিক পিপাসা জাগলেও তার পরিধিতে পৌঁছাবার পথ দেখা যায় না। অদৃশ্য শক্তির সাহায্যে সেটা পার হওয়া যায়।

দ্বিতীয় অন্ধকার রাত্রি বিষ্ণুগ্রন্থি। বৈষ্ণবী মায়া। যজ্ঞের ফলে কামলোক পাওয়া হয়েছে। এখানে প্রাকৃত কামনা প্রাপ্তির কোনো ত্রুটি নেই। এখানে মৃত্যু থাকবে না, অজর অমরও হওয়া যায়। কিন্তু কর্ম হ্রাস হয় না। Fine emotions সূক্ষ্ম ভাবাবেগ বা ভাবোল্লাস জাগে। তাকেও পার হয়ে যেতে হবে। এটা আরো কঠিন। যখন এটাকে সরিয়ে দেওয়া যায় তখন আর একটা অন্ধকার দেখা দেয়। যদি ঠিকভাবে পাওয়া যেত তাহলে এখানে প্রদ্যোতের law বা বিধান কাজ করত। কিন্তু এখানেই বাধা আসে। এ বৈষ্ণবী মায়া থেকে বাঁচবার জন্য রসাস্বাদ বর্জন করতে হবে।

মাণ্ডূক্য-কারিকাতে গৌড়পাদ সাধককে সাবধান করেছেন, চারটি বিষয় বর্জন করে এগিয়ে যেতে বলেছেন। এক, কষায়-বর্জন। দুই, বিক্ষেপ-বর্জন। তার জন্য ধ্যানতন্ময়তার চেষ্টা করবে। তিন, লয়-বর্জন। ধ্যানতন্ময়তার ফলে সমস্ত কিছু মিলিয়ে যাওয়াতে ঘুমিয়ে পড়ার মতো ভাব আসে, সেই লয়ের ভাবকে বর্জন। চতুর্থ রসাস্বাদ-বর্জন। রস পাব, কিন্তু সেটা সত্যকার রস নয়, শুধু ভাবপ্রবণতার বিকার। Cosmic, ব্যাপক বিশ্বাত্মক দৃষ্টিতে নানা বিচিত্র কামলোক দেখা দেয়। তখন সম্ভোগের লোভ প্রবল হয়, সেই আস্বাদের আকর্ষণ কাটাতে হবে।

তার প্রান্তদেশে border-এ আর একটা অন্ধকার আসে। এটি তৃতীয় রাত্রি। চিত্ত স্বচ্ছ উজ্জ্বল হয়ে আসে। Positive experienceগুলি আসে। রুদ্রগ্রন্থি ইতি থেকে নেতিতে যাওয়া। রুদ্রগ্রন্থির স্থান ভ্রূমধ্যে। মৃত্যু পর্যন্ত যেতে হবে। না যাওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই। নচিকেতা মৃত্যুর সঙ্গে তৃতীয় স্থান থেকেই কথা বলবে।

তিনটি স্থানের জন্যই নচিকেতার কিছু কিছু বলবার আছে। প্রথমে সে পৃথিবীতে

ফিরে যেতে চায়। দ্বিতীয় স্থানে পরিপূর্ণ পাওয়া পর্যন্ত শক্তি চায়। তৃতীয় স্থানের পরে কি সেটা জানতে চায়। যম প্রথম দুটি সহজে দেয়। তৃতীয়ের সহজে জবার দিতে চায় না।

বৈবস্বত ও বৈশ্বানর। যম বৈবস্বত, নচিকেতা বৈশ্বানর। অগ্নিকে বৈশ্বানর বলা হয়। তার কৃপাতে নচিকেতা এগিয়ে যাচ্ছে। সে অগ্নি বিশ্বনরের মধ্যে, সবার ভিতরে রয়েছে। তারি ভিতরে সবার লয় হচ্ছে। যমকে বৈবস্বত বলা হচ্ছে। বিবস্বান্ অর্থাৎ সূর্যের পুত্র।

গল্প হিসাবে নচিকেতা যমপুরীতে এলেন। তিনরাত্রি উপবাসে কিছু না খেয়ে কাটালেন। তাই যমের অনুচর যমকে বলছে, তোমার দ্বারে অতিথি বৈশ্বানর ব্রাহ্মণ এসেছেন। তিনি অভুক্ত, তাঁর পরিচর্যা করা উচিত। তাঁকে শান্ত করবার জন্য জল নিয়ে যাও।

যে চেতনা যমের সম্মুখীন হবে সে বৈশ্বানর হবে। প্রথম শ্রদ্ধার আবেশে অগ্নি জ্বালিয়ে তিনরাত্রি, তিনগ্রন্থি বিদীর্ণ করে নচিকেতা বৈশ্বানর অতিথি হয়েছে। নচিকেতার মৃত্যু-বিজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। সে অতিথি হয়েছে, ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণ হয়েছে, বৈশ্বানর চেতনায় সমাপন্ন হয়েছে। যম বৈবস্বত, বিবস্বান সূর্যের পুত্র। মৃত্যু সূর্যের একটা দিক, লোকোত্তরের প্রদোত। যমের অর্থ তাই দ্বিবিধ—twofold। পৃথিবীর দিকে প্রাকৃত মৃত্যু; অমৃতলোকের দিকে বৈবস্বত মৃত্যু। ঈশোপনিষদের শ্লোকে আছে—'পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য বূহ্য রশ্মীন্ সমূহ তেজঃ'। সূর্য জগৎ, একর্ষি পুরুষ শাশ্বত অমৃতলোক, তার মাঝে যম শক্তি, সৌর শক্তি, বৈবস্বত শক্তি। মৃত্যুর বশ করেও সে তখন আলোর দিকে নিয়ে যায়। এখানে এলেই সৎস্বরূপ ফুটে ওঠে। গুরুশিষ্য সম্বন্ধ এক Sublime মহিমময় ভূমিকায় উঠে যাচ্ছে।

নচিকেতার তিনটি রাত্রি পার হয়ে যাওয়া যেন স্বপ্নের ভিতর দিয়ে যাওয়া। এখন শুধু আভাস পেয়ে যাচ্ছে, পরে তাতে প্রতিষ্ঠিত হবে। এখন তার অনুভব বিদ্যুৎঝলকের মতো ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে। flash করে যাচ্ছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে সত্যকামের কথা আছে। Intuition স্বজ্ঞা বা অন্তশ্চেতনা দিয়ে সে অনেক অবস্থা পার হয়ে গেল। শেষে যখন ফিরে এসেছে, গুরু দেখতে পাচ্ছেন তার চেহারায় ব্রহ্ম স্ফুট হয়েছেন, 'ব্রহ্মবিদিব ভাসতে তে মুখম্।' তা সত্ত্বেও সত্যকাম চাইছে গুরুর কাছ থেকে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতে। যেটা intuition-এ পেয়েছে সেটাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। ভাগবতে এই জিনিষ অন্যভাবে দেখি। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে পেল; তাদের ভিতরে ভাব জাগল। তারপর শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলে গেলেন। গোপীচিত্ত তাতে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। শ্রীকৃষ্ণকে আরো গভীরভাবে পেতে চাইল। তখন ভাব-সম্মিলন। ভাব প্রতিষ্ঠিত হল। প্রথম আবেশ আসে অপরা প্রকৃতিতে। সেটা ধীরে ধীরে স্থির হয়। গোপালের মায়ের মতো। প্রথম অবস্থায় গোপাল যেন তার বুকের উপর, সব সময় জড়িয়ে রয়েছে। তারপর একটা উন্মাদিনী অবস্থা। গোপালকে সে আর পায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ এটাকে বলতেন 'হরিবায়ু হয়েছে। এবার তুমি গোপালকে অন্তরে পাবে।' এরই মত প্রথম সব জ্ঞান বিদ্যুতের বিদ্যোতনের মতো, flash এর মতো ফুটে ওঠে। বিশ্বচক্রের আবর্তন দেখব, বৈশ্বানর চেতনা হব, তারপরও কিন্তু অনেক প্রশ্ন, যাচাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইত্যাদি থাকে। এটা মনে রাখতে হবে। সাধনাতে একটা দর্শন পেলে আমরা মনে করি সব পেয়ে গেলাম কিন্তু সেটা ভুল।

সত্যিকার পাওয়া আরও বাকি থাকে। আবার অনেক সময় একবার অনুভূতি হওয়ার পর কিছু সময়ের জন্য নতুন কিছু পাই না। তখন যদি মনে করি আমার সব হারিয়ে গেল সেটাও ভুল।

নচিকেতাতে ভাব কাজ করছে। বুদ্ধি ক্রিয়া করছে না। গীতাতে অর্জুনের প্রশ্নগুলি বুদ্ধিদ্বারা প্রণোদিত। শ্রীকৃষ্ণ নানা যুক্তি দিয়ে তার নিরাকরণ করছেন। কিন্তু এখানে তত্ত্বের জ্ঞান যম ক্ষণিক উদ্ভাসের মতো flash-এর মত দিয়ে যাচ্ছেন। নচিকেতার প্রশ্ন থাকবে খুব কম। নচিকেতার চিত্ত কিশোরচিত্ত। সংশয়বৃত্তি তার নাই। তাই সে ভিতরে ভিতরে বিকশিত হল।

৮।। যমের অনুচর এখানে যমকে উপদেশ দিচ্ছে। গৃহস্থের কর্তব্য কি সেটা বোঝানো হচ্ছে। অতিথি যদি অভ্যর্থনা না পায় তাহলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। অতিথি-সৎকার পঞ্চমহাযজ্ঞের একটি যজ্ঞ, নৃযজ্ঞ। যজ্ঞ তিন প্রকারের—শ্রৌত, স্মার্ত, পঞ্চমহাযজ্ঞ। শ্রৌতযজ্ঞে দীক্ষা নিতে হয়। এটা কঠিন, সবাই করতে পারে না। স্মার্তযজ্ঞ পাকযজ্ঞ। উনুনের আগুনে আহুতি দেওয়া হতো। এখানে অনুষ্ঠান-বাহুল্য ছিল না। তার অধ্যাত্মরূপ পঞ্চমহাযজ্ঞে পাওয়া যায়। এটা একটা সামাজিক বিধান বা আদর্শ। যারা আর্য তাদের প্রত্যেকদিন এই যজ্ঞগুলি করতে হতো। পঞ্চমহাযজ্ঞ হচ্ছে : ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ আর ভূতযজ্ঞ। এগুলি নিত্যকর্তব্য। ব্রহ্মযজ্ঞে, দ্বিজ হতে হবে। আচার্যকে স্বীকার বা বরণ করবে। আচার্য পিতা, গায়ত্রী মাতা। উপদেশ প্রত্যেকদিন মনন করা আবশ্যক। ত্রিসন্ধ্যা ইত্যাদির পিছনে এই ভাবনা রয়েছে। দেবযজ্ঞ হচ্ছে দেবতার উদ্দেশে আহুতি দেওয়া, তাঁদের আবাহন করা মনন দ্বারা, ভাবনার দ্বারা। পিতৃযজ্ঞ পিতৃপুরুষদের প্রতি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা, যাঁদের সাহায্য থেকে আমরা কখনও বঞ্চিত হই না। তাঁরা আমাদের ভিতরে শক্তি সঞ্চার করেন। আমাদেরও তাঁদের প্রতি একটা দায় রয়ে যায়। তাঁদের স্মরণ করে আহুতি দেওয়া লোকান্তরের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা। নৃযজ্ঞ হল অতিথিসৎকার। গৃহস্থের বাড়িতে যখন রান্না হতো আগে শিশু ও গর্ভিণীদের খাইয়ে গৃহস্থ ও তার পত্নী দুপুর পর্যন্ত অতিথির অপেক্ষা করত। যদি কোনো অতিথি আসে তাকে খাইয়ে তারপর তারা খাবে। তাই আগেকার দিনে অতিথিরাও মধ্যাহ্নের পর গ্রামে প্রবেশ করতো না যাতে গৃহস্থের অসুবিধা না হয়। এরপর ভূতযজ্ঞ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে এটার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। অন্নে সর্বজীবের অধিকার রয়েছে। তাই সমস্ত জীবকে বলি সমর্পণ করতে হয়। রান্না হলে তার থেকে চোদ্দটা পিণ্ড নিয়ে চোদ্দ জায়গায় রেখে দেওয়া হতো পশু পাখি সব প্রাণীদের জন্য। একে বলে বৈশ্বদেব বলি। এর পিছনে ভাবনা রয়েছে সমস্ত জগতের সঙ্গে আত্মভাব স্থাপিত করা। সবার সঙ্গে এক হওয়া। যজ্ঞের সরল এবং নৈতিক তথা আধ্যাত্মিক রূপ এই। প্রথম আধ্যাত্মিক ভাব জাগে। তারপর দেবতার শক্তিকে আবাহন করি, আমাদের মাঝে পিতৃদেব শক্তি সঞ্চারিত হোক, আর আমরা সমস্ত জগতের সঙ্গে একতার অনুভব করি।

কর্ম তিন প্রকারের—নৈমিত্তিক, কাম্য, নিত্য। দশবিধ সংস্কার ইত্যাদি নৈমিত্তিক কর্ম। করতেও পারি, না করতেও পারি। নিত্যকর্ম কিন্তু অবশ্য করণীয়। নিত্যকর্মে নৃযজ্ঞ আসে। সমস্ত সমাজ থেকে বিরক্ত বা উদাসীন হলে চলবে না। উপনিষদের শিক্ষা গৃহত্যাগীর জন্য একথা মনে করা ভুল। গৃহধর্ম পালন করলেও তার ভিতরে সন্ন্যাসীর

বিবিক্ত ভাব থাকে। তাই বলা হয়েছে গৃহস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ হবে। যমের কাছ থেকে প্রথমে স্বর্গলাভের জন্য অগ্নিচয়ন। তারপর লোকোত্তরে প্রতিষ্ঠিত হওয়াও কর্তব্য। আবার পৃথিবীর সাথে যোগ রেখে চলাও কর্তব্য। কঠোপনিষদ তাই সবার জন্য।

৯।। এখানে আখ্যায়িকার অনুবৃত্তি চলছে। যম বলছে তুমি অতিথি। তুমি শুধু ব্রাহ্মণ নও, তুমি 'ব্রহ্মন'। এখানে দেখা যায় গুরু-শিষ্যের ভিতরে একটা সম্মানের সম্পর্ক। গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের মাঝে সখ্যের ভাব দেখেছি। শ্রীকৃষ্ণ কখনও নিজেকে impose করছেন না। জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছেন না। সর্বশেষে বলছেন, 'যথেচ্ছসি তথা কুরু।' এখানেও নচিকেতার প্রতি যম সম্মানই প্রকাশ করে যাচ্ছে। অন্তেবাসীকে আচার্য যদি এভাবে না দেখেন তাহলে জ্ঞান ঠিক ফোটে না। যম বলছেন, তুমি তিনরাত্রি না খেয়ে এখানে ছিলে। তার অর্থ হচ্ছে নচিকেতা কোথাও আসক্ত হয় নি। আমরা সব সময় কোনো না কোনো জায়গায় জড়িয়ে পড়ি। যা পাই তাকে আঁকড়ে থাকতে চাই। একটা অনুভূতি এলে তার repetition পুনরাবৃত্তি চাই। চিত্তকে নির্মুক্ত রাখতে হবে। 'সব ছোড়ে তো সব পাওয়ে' এটা একটা সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বিধান (spiritual law)। পেয়েও উদাসীন থাকতে হবে। তিনি আমাদের সম্ভোগ করুন। সম্ভুক্ত হয়ে আমাদের পাওয়া। অশনায়া-রহিত হওয়া। মানুষ অমৃতের পিপাসু। সেখানে মৃত্যু 'অশনায়া'। নচিকেতা তিনটি গ্রন্থি পার হল, কিন্তু তটস্থ থাকল। ত্যাগের চরমে যেতে হবে। বৈরাগ্য ভাব আনতে হবে। বিতৃষ্ণা মানে বিরক্তি নয়, disgust নয়। সত্যকার বৈরাগ্য হল, ভোগের তৃষ্ণা থাকবে না। তৃষ্ণা না থাকলে ভোগ আপনিই আনন্দ রূপে ফুটে উঠবে। সম্পূর্ণ রিক্ত হতে হবে। রিক্ত হয়ে কৈবল্যে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

যম নচিকেতাকে তিনটি বর চাইতে বলছেন। তিনটি বর তিনটি গ্রন্থির অনুকূল হবে। প্রথম ইহলোক প্রাপ্তি, দ্বিতীয় স্বর্লোক প্রাপ্তি, তৃতীয় লোকোত্তর প্রাপ্তি। যম প্রথম ও দ্বিতীয় বর সহজে দিয়ে দিচ্ছেন। তৃতীয় বর দিতে চান না। আপাত দৃষ্টিতে দ্বিতীয় আর তৃতীয়ের মাঝে একটা বিরোধ দেখা যায়। বিরোধ উপনিষদে দেখা যায়, ব্রাহ্মণে নয়। সেখানে শুধু তিনটি লোকের জয়ের কথা বলা হয়েছে। তিন বরে ভূলোক, স্বর্লোক এবং তুরীয় লোক বা লোকোত্তর জয় করা হবে।

১০।। নচিকেতা বলছেন আমি যখন মরে গিয়ে ফিরে যাব আমার বাবার কাছে, আমার বাবা যেন আমাকে চিনতে পারেন। তাঁর সঙ্কল্প যেন শান্ত হয়। মৃত্যু থেকে ফিরে যাওয়া এটা বৈদিক ভাবনার বৈশিষ্ট্য। ব্রহ্মসূত্রের শেষ সূত্রে বলা হয়েছে, 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ'। অনাবৃত্তি—পুনর্মৃত্যু আর হবে না, এটা শেষ পুরুষার্থ। এটা আমাদের আদর্শ। যা ওপারে পেয়েছি তাকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করার জন্য সমাধি থেকে ব্যুত্থান করতে চাইতেন। দুটো আদর্শ ছিল, জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি। যাঁরা বিদেহমুক্তি মানতেন তাঁরা বলতেন জীবন্মুক্তি একটা নীচের স্তর (lower stage)। মহাশূন্যের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া, অসদ্-ব্রহ্মে সমাপন্ন হওয়া, সেটাই বড়, শুধু সূর্যে সমাপন্ন হওয়া নয়। কিন্তু মহাকাশের জ্ঞান ও সূর্যে সমাপত্তি—দুটোকে এক সঙ্গে গ্রহণ করে এ জীবনে নামিয়ে আনাই জীবন্মুক্তির আদর্শ। সে সূর্যেও রয়েছে, আকাশেও রয়েছে।

বৈদিক ভাবনাতে অসৎবাদ ও সৎবাদ পাশাপাশি রয়েছে। কিন্তু সৎবাদের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে—Return to life। ছাপিয়ে যাওয়া আবশ্যক, কিন্তু যাবার

পরে আবার ফিরে আসব। যজ্ঞে একটা সিঁড়ি আনা হতো। যজমানকে তার উপরে উঠতে বলা হতো। একটা step বা ধাপ উঠত, তখন বলা হতো, এই ভূলোক থেকে উঠলাম। আর একটা সিঁড়ি উঠলে স্বর্লোকে উঠলাম। তারপর কিন্তু তাকে নামিয়ে আনা হতো। ওখানে যা পাবে এখান থেকে সেটার অনুভূতি করতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ এটার ওপর জোর দিয়েছেন। গৌতমবুদ্ধ আসার আগে এ দুটো নিয়ে বিরোধ চলছিল।

নচিকেতা বলছেন আমার পিতার মন্যু হয়েছিল, সেটা যেন শান্ত হয়। তার পিতা প্রাকৃত জীব। তার সাধনার অভিমান রয়েছে। কামনার বর্জন সে করতে পারেনি। আদর্শ নিয়ে পুত্রের সঙ্গে তার বিরোধ হয়। তার জন্য ক্রোধ দেখা দিয়েছে। নচিকেতা সবার কল্যাণ চায়। সে ফিরে যাবে ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়ে। তাই চাচ্ছে পিতা যেন শান্তসঙ্কল্প হন। বাজশ্রবসের চিত্তে কামনা ছিল, অথচ সর্বস্ব দিয়ে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করতে চেয়েছিলেন। তিনি যেন প্রশান্ত হন। মহাপুরুষদের এই জগতে ফিরে আসার তাৎপর্য এই যে তাঁর আবেশে, প্রভাবে, অনুভাবে সবার সঙ্কল্প শান্ত হয়ে যায়। বাসনা-কামনার উত্তালতা আর থাকে না।

ঋগ্‌বেদে মন্যু-সূক্ত আছে। সেখানে মন্যুর অর্থ passion, emotion, উগ্র ভাবাবেগ। চিত্তের প্রবেগ, তাকে বলা হতো মন্যু। পরে মন্যু রূঢ়ার্থে ক্রোধ হয়েছে। আসলে মন্যু একটা passion, আবেগ, ভাল হতে পারে, মন্দ হতে পারে। আবেগের সঙ্গে যদি বিচার না থাকে তাহলে সাধনা পণ্ড হয়ে যায়। প্রজ্ঞার সঙ্গে যখন হৃদয়ের মিলন হয় তখন সাধনা সত্য হয়। যে passion ভাবাবেগ পেছনে ঠেলে দেয়, সাধু চিত্তের আশংসায় এই সব আবেগ দূর হয়ে যায়। সিদ্ধ চিত্ত যখন জগতে ফিরে আসে, তখন এরকম ঘটে। সব প্রসন্ন হবে। সবার কল্যাণ হবে।

যমের বাড়ি থেকে এলে হয়তো সবাই তাকে চিনবে না। তাকে greet, সম্ভাষণ বা বরণ করবে না। এ হয়। সিদ্ধ চেতনা যখন ফিরে আসে, তখন তাকে চিনতে পারা কঠিন। তাই নচিকেতা চাইছে যাতে তারা আমাকে চিনতে পারে।

লৌকিক চেতনা থেকে সে অভিযান শুরু করেছিল। সে চেতনা থেকে বাসনা দূর হয়ে যাক, হৃদয়ের উত্তালতা দূর হয়ে যাক, সত্যকে চিনবার ক্ষমতা যেন তার ভিতরে জাগে, এটাই প্রথম বরের আধ্যাত্মিক অর্থ।

১১।। নচিকেতা যা চেয়েছে, যম সব দিয়ে দিচ্ছেন। তোমার পিতা তোমাকে স্বীকার করবেন, আগের মত সব হবে। তোমার পিতা **সুখং শায়িতা ও বীতমন্যু** হবেন। এটা বিশেষ জরুরি, সুখে শুয়ে থাকা। সংসার-চেতনা উদ্বুদ্ধ চেতনা বা লোকান্তরকে পাবার জন্য আতুর নয়, কিন্তু সিদ্ধচেতনার প্রভাব তার উপরে যখন পড়ে, সমস্ত জগতের উপর কল্যাণময় প্রশান্তি আপনা থেকে ছড়িয়ে পড়ে। এদের থেকে যারা জাগবে তারা নচিকেতার মতো লোকোত্তরকে পাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু যারা জাগবে না, তারাও প্রসন্নতা, শান্তি অনুভব করবে।

১২-১৩।। এখানে নচিকেতা অগ্নিবিদ্যা চাইছে। প্রথম বরে লৌকিক world বা স্থূল জগৎ নিয়ে কথা হচ্ছিল। এখানে spiritual world নিয়ে। শক্তি সঞ্চয় করা Spiritual-Adventure-এর অধ্যাত্ম-অভিসারের একটা অঙ্গ। যজ্ঞ একটা রহস্য। তার রহস্য কালে লোপ পেয়ে যায়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জুনকে বলছেন, 'এ যোগ বহুকালের পর নষ্ট

হয়ে গিয়েছে। আমি বিবস্বান্‌কে বলেছিলাম, বিবস্বান্‌ মনুকে বলেছিল। এ রকম বহুকাল ধরে চলেছে। শেষে তা লোপ হয়ে গিয়েছে। সে যোগের কথা আমি তোমাকে আবার বলছি।' আমাদের জীবনেও এমনি ঘটে থাকে। একটা সত্য আমরা পাই আবার সে লুপ্ত হয়ে যায়, আবার সে সত্যকে জাগাতে হয়। আমরা আগুন জ্বালাই, তা নিভে যায়, তখন আবার আগুন জ্বালাতে হয়।

এই অগ্নিবিদ্যাকে ঋষি অথর্বা এবং অঙ্গিরা প্রবর্তিত করেন। মাঝে মাঝে সেটা ক্ষীণ হয়ে যায়। তাকে আবার জ্বালিয়ে দিতে হয়। এটাই হচ্ছে অধ্যাত্ম সাধনার ভিতরে তেজ সঞ্চার করা, বীর্য সঞ্চার করা। সেটা দ্বিতীয় বরের আকাঙক্ষা। তৃতীয় বরে লোকোত্তরে পৌঁছবার আকাঙক্ষা। তিনটি লোক, প্রাকৃত, অপ্রাকৃত আর লোকোত্তর। প্রাকৃত লোকের সাধনা morality, নীতিপরায়ণতা বা ধর্মবোধ পর্যন্ত ওঠে। অপ্রাকৃত লোকের ভিতরে বিদ্যাপিপাসা spiritual aspiration জাগে। তাই দ্বিতীয় বরে দ্বিতীয় শ্রেণির লোকের জন্য শক্তি চেয়েছেন, শক্তিসঞ্চার চেয়েছেন। অনুষ্ঠানের সঙ্গে এটি যুক্ত। অগ্নিচয়ন বিদ্যা একটি যাজ্ঞিক অনুষ্ঠান। শতপথ ব্রাহ্মণ, যা ব্রাহ্মণের মধ্যে সবচেয়ে বড়, তার অর্ধেক ভাগে এই অগ্নিচয়ন বিদ্যার কথা রয়েছে।

অগ্নিচয়ন হচ্ছে নতুন ভাবে আগুন জ্বালান। প্রথম বেদি প্রস্তুত করতে হয়। বেদির জন্য ইষ্টক চাই, যার মাঝে অগ্নিকে চয়ন করতে হবে। অগ্নিকে জড় collect করতে হবে। বেদিতে। তার জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান আছে। প্রথম ইষ্টক, তারপর বেদি, পরে অগ্নিচয়ন। ইষ্টকের বাহ্য অর্থ ইঁট, কিন্তু তার mystic meaning হচ্ছে যা আমি চাইছি, বাসনা, desire। বেদি, alter উঁচু বাঁধান জায়গা, তার গূঢ়ার্থ হচ্ছে জ্ঞানের পিপাসা। জানবার ইচ্ছা, তাই বেদি। বিদ্‌ ধাতুর অর্থ জানা। অগ্নি আগুন, গূঢ়ার্থ—আমার মাঝে অভীপ্সার শিখা, যে উপরের দিকে উঠে যায়। অজ্‌ ধাতু থেকে অগ্নি, অর্থ উপরে উঠে যাওয়া। অর্থাৎ লোকোত্তরের অভীপ্সা। অগ্নিচয়ন হচ্ছে যে-অগ্নি চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে তাকে বেদিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, সংহৃত করতে হবে। দেহ বেদি, হৃদয় অগ্নিস্থান। হৃদয়ের মাঝে আগুন জ্বালাতে হবে। অগ্নিশিখা সুষুম্না নাড়ী ধরে মূর্ধার দিকে এগিয়ে যাবে।

সমস্ত বেদিকে পাখির আকার দিতে হত। পাখি জীবাত্মার symbol; কখন শ্যেন, কখন হংস। প্রাচীন গ্রন্থে আছে, বাজপাখি সূর্যমণ্ডল থেকে সোম আহরণ করে নিয়ে এসেছিল। বাজ তীব্রগতি-সূচক। চিত্তের তীব্র সংবেগের প্রতীক। হাঁস জলে সাঁতার কাটে। আকাশের হাঁস সূর্য। আকাশ যেন নীলবর্ণ সমুদ্র। তার ভিতরে সূর্য যেন মন্দগতিতে অনায়াসে ভেসে চলেছে। সাধনাতে এই দুটো ভাবের দরকার। একদিকে চিত্তের গতি হবে বাজের মতো। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, সাধনা করবে ডাকাতের মতো। রোখ থাকা চাই। নির্বীর্যতা সবচেয়ে বড় অন্তরায়। বীর্যের প্রতীক বাজ। তীব্র সংবেগ কিন্তু ছটফটি নয়। আকুলতা ব্যাকুলতা নয়। একদিকে তীব্র সংবেগ, আর একদিকে হাঁসের মতো অনায়াসে সাঁতার কাটার ভাব। এটা আসে শ্রদ্ধা থেকে। 'তপঃ-শ্রদ্ধে যে হ্যপবসন্ত্যরণ্যে' (মু ১।২।১১) শ্রদ্ধা এবং তপঃ নিয়ে যাঁরা অরণ্যে থাকেন তাঁরা লোকোত্তর সিদ্ধি পান। প্রসন্নভাব থাকবে অথচ বীর্য দেখা দেবে। প্রসন্নভাবে যখন সাধনাতে এগিয়ে যাই তখন বাধা আসে, বাধাকে দূর করবার জন্য বীর্যকে উদ্বুদ্ধ করতে হয়। 'যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ মৃত্যু র্যস্যোপসেচনং...' কঠ ১।২।২৫। সাধনার পাথেয়, অন্ন হবে

'ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ'। ব্রহ্ম হচ্ছে প্রশান্তি, গো; ক্ষত্র তেজ, অশ্ব, বেগ। ইন্দ্রকে তাই গবেষক, অশ্বজিৎ বলা হতো। তাঁকে আবাহন আলোর চেতনা ও শক্তি নিয়ে আসার জন্য। ব্রহ্ম knowledge, শ্রদ্ধা; আর ক্ষত্র power, তপঃ। তার সঙ্গে চাটনি, উপসেচন হবে মৃত্যু। মাঝে মাঝে, মৃত্যুর প্রক্ষেপ চাই। মাঝে মাঝে একদম ফাঁকা হয়ে যেতে হয়। ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসন্নতা, ক্ষত্রবীর্য আর শূন্যতা এই তিনটি সাধনার পক্ষে আবশ্যক।

পূর্বে বলেছি, বেদি বাজপাখি বা হাঁসের আকারে তৈরি করা হতো। আমাদের দেহ একটা বেদি। সে যেন একটা পাখি। তৈত্তিরীয় উপনিষদে দেহকে হাঁসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তার মাঝে যে কামনা বাসনাগুলি রয়েছে সেগুলি ইষ্টক। এদের প্রত্যেকের মাঝে অগ্নি রয়েছে। এই সমস্ত সংহত করতে হবে হৃদয়ে। পাখির মাঝখানে তাকে উদ্যত করতে হবে। তখন সত্যকার আগুন জ্বলবে।

এই অগ্নিবিদ্যার একটা Peculiar form বিশিষ্ট রূপ যম নচিকেতাকে শেখাচ্ছেন। এটা নচিকেতার নামে প্রসিদ্ধ হবে। কেননা নচিকেতাই তাকে আবার জাগিয়ে তুলছে। নচিকেতা আগের সাধনাকে পুনর্জীবিত করছে। কিছু নাশ করছে না। ফিরে এসে শুধু সবার মাঝে প্রসন্নতা আনবে, লোকোত্তরের জ্ঞান নিয়ে আসবে।

দ্বিতীয় বরে নচিকেতা চাইছে স্বর্গলোকে কি করে যাওয়া যায়। স্বর্গের বৈদিক ধারণা ব্রাহ্মণ গ্রন্থে পাওয়া যায়। যজ্ঞের লক্ষ্য স্বর্গে যাওয়া। Heaven বা পৌরাণিক স্বর্গের যে কল্পনা আছে সেটা বিভ্রান্তিকর। **বেদে স্বর্গে গমন বলতে বোঝাত সূর্যমণ্ডলে অথবা সোমমণ্ডলে যাওয়া**। স্বর্গের ব্যুৎপত্তি সুবর্গ থেকে। বৃজ্ ধাতু থেকে 'বর্গ' অর্থ মোচড় দেওয়া, মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া। সুবর্গ অপবর্গ দুই আদর্শ। 'অপ' মানে away, অপবর্গ অর্থ অপেত অর্থাৎ সবকিছু থেকে মুখ ফেরান বা দুরে সরে থাকা (turning away from everything)। বৈরাগ্য যাদের আদর্শ তারাই অপবর্গ চেয়েছে। নচিকেতা তৃতীয় বরে চাইছে এই 'অপবর্গ' অর্থাৎ transcendentalএ চলে যাওয়া। বিরাট জ্যোতি-রাজ্যে যদি পৌঁছাই সেটা হবে 'সুবর্গ'। সেও turning away বটে কিন্তু turning away harmoniously। ঋগ্বেদে স্বর্গের বর্ণনা আছে—সেখানে অমৃত, অজস্র জ্যোতি, আনন্দ রয়েছে, মোদ প্রমোদের অভাব নাই, সেখানে ভয় নাই, মৃত্যু নাই। এটা চিত্তের একটা অবস্থা। যখন চিত্ত ঝলমল করে তখন স্বর্গে উত্তীর্ণ হয়েছি বলা যায়।

এ জীবনে স্বর্গলাভ করা মানে জরা মৃত্যুকে অতিক্রম করা। প্রাণের ধর্ম এই—জন্মাবে, বাড়বে, তরুণ হবে, স্তম্ভিত হবে, জীর্ণ হবে, মৃত্যু হবে। সূর্যের সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে। সূর্যের উদয় হল, বাড়ল, মধ্যাহ্নে পৌঁছল, তারপর ঢলল, সূর্যাস্ত হল। কিন্তু চেতনা যাতে বাড়তেই থাকে তা কি করা যায় না? কি করে জরা-মৃত্যু থেকে উদ্ধার পাব? সূর্য বা বিষ্ণু তার তারুণ্য, কৌমার্য কি করে অক্ষুণ্ণ রাখবে? আমাদের মাঝে সূর্যের উদয়াস্তের সঙ্গে জন্মমৃত্যুর সাদৃশ্য রয়েছে। আমরাও বারবার আবর্তিত হচ্ছি। আমরা এসেছি সূর্য থেকে, সূর্য সবসময় মাথা পর্যন্ত উঠে কি হেলেই পড়ছে? আদিত্য অদিতির পুত্র। অদিতি মহাশক্তি। বরুণ পুরুষ, অদিতি প্রকৃতি। এটা Transcendental তত্ত্ব। অদিতি অখণ্ডিতা অবন্ধনা। এ Consciousness, Energy of the Infinite চেতনা শক্তি সেই অনন্তের অসীমের। বৈদিক ঋষিরা এঁদের সম্বন্ধে খুব একটা কিছু বলেন না। সব সময় তাঁরা একটা মৌনতা অবলম্বন করে থাকেন। কিন্তু

তারাই পরমার্থ। বরুণ পরে শিব হয়েছেন, অদিতি হয়েছেন মহাশক্তি। স্বয়ং বরুণ আদিত্য। ভগ আদিত্য, অংশ আদিত্য (জীব চেতনা)। এই আদিত্য চেতনা। সেই আসল সূর্য। 'ন উদেতি ন অস্তমেতি'।

বাহিরের সূর্যে জীবনের প্রতিবিম্ব পাই। তাতে ছয় মাস উত্তরায়ণ ও ছয়মাস দক্ষিণায়নের তত্ত্ব বা principle কাজ করছে। উত্তরায়ণ দেবযান, দক্ষিণায়ন পিতৃযান। উত্তরায়ণে দিন বেড়ে চলেছে। এটাকে চিরন্তন করা যায় না? এটা আধ্যাত্মিক প্রশ্ন! আমাদের ভিতরে সেরকম কিছু কি নেই যাতে জরা-মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারি? 'অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম, অগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্ (ঋ৮।৪৮।৩)। আমরা সোম পিয়েছি, অমৃত হয়েছি, জ্যোতিকে জেনেছি, আমরা সব পেয়েছি। এভাবেই ঋষিদের ভিতরে আসল। বৈদিক ঋষিরা সূর্যোপাসক ছিলেন। সূর্যে নিজেকে উত্তীর্ণ করা, এটাই সুবর্গ। প্রত্যেকদিন মধ্যদিন পর্যন্ত সূর্য উঠে যায়। উত্তরায়ণে সূর্য ক্রমে ক্রমে বেড়ে চলে। আষাঢ়ের গুরুপূর্ণিমা পর্যন্ত দিনগুলি বাড়তেই থাকে। তাকে যদি রুদ্ধ করা যায় তাহলে we shoot beyond আমরা তার ঊর্ধ্বে যাব, পার হয়ে চলে যাব, অজস্র আনন্দ অজস্র জ্যোতি লাভ করব—যেখানে পরম মুক্তি হয়েছে। এটাই যাগ-যজ্ঞের আদর্শ। এটা positive experience, ইতিভাবনা। এটি অভিজিৎ নক্ষত্রে পৌঁছে যাওয়া। বিষ্ণুর যে তৃতীয় পাদ, বিষ্ণুর 'পরমম্ পদম্' সেখানে যদি পৌঁছে যাই, মধুর উৎসকে পাব। বিষ্ণু ত্রিবিক্রম। প্রথম পদে দিকচক্রবালের উপরে ওঠে, এটা তরুণ সূর্যোদয়। দ্বিতীয় পদে মাথার উপরে মাধ্যন্দিন সূর্য। তৃতীয় পদে অস্তে। প্রথমে উদয়, দ্বিতীয়ে মূর্ধাচক্রে, তৃতীয়ে সহস্রদল ভেদ করে shoot করছে সবার পারে চলে যাচ্ছে beyond everything। যজ্ঞে অগ্নিচয়ন করতে হবে, অগ্নি মন্থন করতে হবে, তারপর আগুনকে ঊর্ধ্বমুখী করে তুলতে হবে। যোগেও তাই; কুণ্ডলিনীকে মূলাধার থেকে সহস্রদল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া। 'ধ্যান-নির্মথনাৎ' ধ্যান দ্বারা চেতনার অগ্নিকে উপরের দিকে ঠেলা। সর্বত্র এইভাব ঘুরে ঘুরে আসছে। প্রত্যেকের মধ্যে অগ্নিশক্তি চিদ্‌বীজরূপে রয়েছে। তার একটা পিপাসা রয়েছে সূর্যের দিকে পৌঁছবার। উপলব্ধিতে উপমা সাহায্য করে। বাইরের সূর্য একটা প্রতীক। আমাদের ভিতরে অগ্নিকণা রয়েছে, শিশুর মতন আমাদের ভিতরে সে বাড়ছে, তাকে লালন করবে 'আপঃ' অর্থাৎ জলবালারা। তার অভীপ্সা সূর্যে পৌঁছবার। এই অগ্নিশিশুই নচিকেতা। নচিকেতা দ্বিতীয় বরে এটা পেতে চায়। এটা তার লোকোত্তরের দিকে অভিযান। এ অভিযান করতে হলে মৃত্যুকে বরণ করতে হয়। তাই তার আগে, আমি যেন ফিরে আসি সে-আশ্বাস নচিকেতা নিয়ে নিচ্ছে প্রথম বরে, যাতে পিছনের সঙ্গে বিচ্ছেদ না ঘটে। নচিকেতার প্রার্থনা, তুমি আমাকে এই রকম অগ্নি দেখিয়ে দাও যাতে আমি সেই লোকে পৌঁছতে পারি, যেখানে ভয় নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, শোক নাই।

দ্রব্যযজ্ঞেরও বিধান রয়েছে। Material things দিয়ে বাইরের নানা উপকরণ দিয়ে যজ্ঞ করা হতো। তার ফলশ্রুতিতে রয়েছে 'য এবম্ বেদ'—যজ্ঞের রহস্য যে জানে সেও তার ফল পাবে। অধিকার ভেদে দ্রব্যের সঙ্গে বা বিনাদ্রব্যে যজ্ঞ করা যেতে পারে। জ্ঞান ছাড়া কর্ম করলে কিছু ফল তো পাবেই কিন্তু 'যদ্ বিদ্যয়া করোতি তৎ বীর্যবত্তরং ভবতি।' কোনো অনুষ্ঠান ছাড়াই জ্ঞান দিয়ে সেই ফল পেতে পারি। যজ্ঞে এটা ক্রিয়া, এটা বিদ্যা

দুটো বলা হয়। ক্রিয়াই বিদ্যা নিয়ে আসে। আর যার চিত্ত পরিশুদ্ধ সে শুধু বিদ্যা, দিয়েই ফল লাভ করতে পারে। যজ্ঞের ক্রিয়া জটিল ব্যাপার। সেটাকে অন্তর দিয়ে ভাবনা করে যোগসাধনা হয়। বেদি দেহ-পাখি, এ যদি মনে করি মূলাধার থেকে অগ্নিকে জাগ্রত করে নাভিচক্র, হৃৎচক্র, ভ্রূচক্র ভেদ করে যেতে হয়। ঋষিরা হৃদয় থেকে এগিয়ে যেতেন।

কী করে স্বর্গলোক লাভ করতে পারি? Cosmic Consciousness আয়ত্ত করতে পারি? **লোক** শব্দ এসেছে রোক—রুচ্ ধাতু থেকে যার মানে to shine, এর থেকে লোক—আলোর জগৎ। স্বর্গলোক—সে একটা আলোর জগৎ যেখানে আমরা সৌষম্যের ভাবনায় (in harmony with everything) এক হয়ে যেতে পারি। **অশনায়া পিপাসা,** আর **শোক,** এর থেকে উত্তীর্ণ হওয়া। বৌদ্ধেরা বলতেন, রাগদ্বেষমোহ থেকে উত্তীর্ণ হওয়া। এগুলি থেকে উত্তীর্ণ হলে নির্বাণ পাব। উপনিষদের ঋষিরা শোক এবং মোহ থেকে উত্তীর্ণ হলে মুক্তি পাব বলতেন। অশনায়া পিপাসা এবং শোক। যেখানে শোক আর মোহের কথা বলা হয়েছে সেখানে মোহ হচ্ছে তমোবৃত্তি। আর শোক (√শুচ্) চিত্তের জ্বালা, রজোবৃত্তি, চিত্তের বৃত্তির যাতে বিক্ষোভ হয়। লোভ রাগ দ্বেষ ইত্যাদি থেকে এই বিক্ষোভ হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ বলতেন চিত্তকে শোকগ্রস্ত বা মোহগ্রস্ত হতে দেবে না। অশনায়া বুভুক্ষা, দেহের অধীন হওয়া। ক্ষুধা তৃষ্ণা অশনায়া শুধু দেহের নয়, যে কোনো desire, অভাববোধ থেকে কামনা আসে। অভাব দূর হয় যখন চিত্ত প্রশান্ত হয়। তখন মানুষ আপ্তকাম হয়। 'অশনায়া বৈ মৃত্যুঃ', 'অশনায়া বৈ পাপ্মা'। যেখানে শোক, হৃদয়ের জ্বালা, সেখানেই পাপ। সে মৃত্যু জরা অবসাদের দিকে নিয়ে যায়। তার থেকে সাবধান হওয়া উচিত। বৈষ্ণব সাধনায় দেখি চিত্তের আকুলি-বিকুলি ছট-ফট করা একদিকে মন্দ, একদিকে ভাল। সাধনার আরম্ভে সেটা অত্যন্ত খারাপ। আমাদের মূর্চ্ছিত করে। বিরহের ব্যাকুলতা অপ্রাকৃত। এটা প্রথমে ফোটে না। অনিঃশেষে যখন তাঁর ভিতরে আবিষ্ট হয়ে থাকি তখন তাঁকে সমস্ত আধার দিয়ে ধরতে গিয়ে একটা দিব্য বেদনা দেখা দেয়। প্রথমে যে ব্যাকুলতা বা ছটফটি আসে সে মূঢ়ের কথা, অবিদ্যার কথা। কিন্তু যখন দিব্য বেদনা জাগে তখন প্রতি মুহূর্তে অমৃত উছলে ওঠে। প্রাকৃত জীবে এ আসে না। প্রাকৃত জীবে অভীপ্সা থাকা চাই, কিন্তু ব্যাকুলতা আসতে দিতে নাই। প্রাকৃত ভালবাসাতে এটাই দেখি। সব সময় একটা অভাববোধ, একটা না-পাওয়ার অতৃপ্তি অনুভব করি। ভগবানকে ভালবাসা, এটা অপ্রাকৃত বস্তু। সেখানে বীর্যের পথ ধরতে হয়। বাধা যা আসে তাকে আত্মবীর্য দিয়ে জয় করতে হয়। হৃদয় দিয়ে যারা সাধনা করে তাদের ব্যাকুলতা অন্যপ্রকারের হবে। সেটা সিদ্ধের ব্যাকুলতা। একবার যাকে পেয়েছে তাকে বারবার পেতে চায়। অসিদ্ধের যে ব্যাকুলতা তাকে সযত্নে বর্জন করতে হয়। যখন এসব থেকে সরে যাই তখন ভয় নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই। ভয় হচ্ছে তমোবৃত্তি, একটা অভিনিবেশ। দেহ থেকে সে জন্মায়। আমরা দেহকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাই। তাই মৃত্যুভীতি চরম ভীতি। অন্য সব ভীতি তার রূপান্তর মাত্র। এটা অন্ধতামিস্র। যদি আলোর জগৎ ফুটে ওঠে তখন অন্ধতামিস্র থাকে না। চিত্তবৃত্তি কখনো অবসন্ন হয় না; পরিশ্রান্ত হয় না। জরাও থাকে না; মৃত্যুও থাকে না। দিব্যশক্তির প্রভাবে নচিকেতা এটাকে পার হয়ে গেছে। ভগবৎকৃপায় একটা flash এর মতো কিছু সময়ের জন্য আমরা আমাদের সমস্ত সাধ্যের একটা তৈরি ছক (blue-print) পেয়ে যাই, তারপর তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য

আবার নতুন করে সাধনা করতে হয়।

স্বর্গলোকে পৌঁছবার উপায় নিজের ভিতরে আগুন জ্বালান। অগ্নিচয়ন ছাড়া, মন্থন ছাড়া আগুন জ্বালান যায় না। কিন্তু সে অগ্নি কে জ্বালাবে? নচিকেতা বলছে, যে-অগ্নিকে ধরে আমরা স্বর্গে যাব, তাকে তুমি অর্থাৎ যম অধিকার করে রেখেছ। তার মানে স্বর্গে যেতে হলে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যেতে হবে, বারবার মরতে হবে। যেমন চিত্তবৃত্তি নিরোধ, এটা মনের মৃত্যু। তেমনি প্রাণের ক্রিয়াকে রুদ্ধ করতে হবে, এটা প্রাণের মৃত্যু। বৌদ্ধরা বলতেন বাইরে ভিতরে ফাঁকা হতে হবে, যেন একটা মৃত্যু। আমাদের জীবন যেন অন্ধকারের মাঝে জোনাকির আলো। বিরাট শূন্যতার মাঝে আমাদের জীবন জ্বলছে। তাই মৃত্যুই বড়, জীবন তার অধীন। মৃত্যু বিবস্বান্ যদি হয় তাহলে ভিতরের আগুন জ্বলে, আর স্বর্গলোকে পৌঁছতে পারি।

ব্রহ্ম, ক্ষত্র, আর মৃত্যু এই তিনের আধার নিতে হবে। চলার পাথেয় হবে ব্রহ্মবিদ্যা ও ক্ষত্রতেজ আর মাঝে মাঝে থাকবে মৃত্যু।

নচিকেতা বলছে, স্বর্গ্য-অগ্নিকে তুমি অধিগত করে রেখেছ। আমি শ্রদ্ধান্বিত তুমি আমাকে দেখিয়ে দাও। এটা তার মৃত্যুকে সমর্পণ। যারা সুবর্গ চেতনা লাভ করেছে, তারা নন্দিত হয়, অমৃতত্বকে তারা লাভ করে (positive sense of immortality)।

সাধনা এইভাবে করতে পারি ঃ প্রথমে এই ভাবনা করতে হয় আমি সূর্য থেকে এসেছি। Solar energy-ই life রূপে দেখা দিয়েছে। এটা বৈজ্ঞানিক সত্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাবিত্রী' নামে কবিতায় এই কথা বলেছেন। তোমার থেকে আমি এসেছি, তোমার আলোতেই আমার সব গড়া। গায়ত্রী মন্ত্রেও এই কথাই রয়েছে। আমি মরে যেতে পারি কিন্তু সূর্য থাকবে, নিত্য সূর্য থাকবে। যারা মনে করে পৃথিবীতেই সব শেষ হবে, তারা জড়বাদী। কিন্তু সৌরমণ্ডলে পৌঁছবার কথা বেদে রয়েছে।

ব্রহ্মরন্ধ্রের ঊর্ধ্বে সূর্য। সেখান থেকে একটা রশ্মি ব্রহ্মতালু বিদীর্ণ করে সুষুম্না নাড়ী ধরে হৃদয় পর্যন্ত আসে। সেটাই চিদগ্নি। বিন্দুর আকারে সে রয়েছে। সূর্যই মহাপ্রাণ। অজর অমর। তারই কণিকা অপান শক্তিকে ধরে হৃদয়ে এসেছে। হৃদয় থেকে আবার প্রাণশক্তি দিয়ে উপরে উঠতে চেয়েছে। তাই প্রাণে আমরা ছাড়া পাই, অপানে বাঁধা পড়ি। যে বায়ু প্রাণরূপে সর্বত্র রয়েছে সে মহাপ্রাণ। শ্বাস টানা, সেটা অপান, শ্বাস ছাড়া—প্রাণ। উর্ধ্বচারী প্রাণ তখন মহাপ্রাণে মিলিয়ে যায়। এই শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ প্রাণ-অপাণ ভূতে ভূতে সমাবিষ্ট।

হৃদয়ে বিন্দুদর্শন করলে সেটা হল আত্ম-জ্যোতি দর্শন। সূর্যে পৌঁছে যে দর্শন করব সেটা ব্রহ্মদর্শন। আর রশ্মিতে রশ্মিতে, সর্বভূতে দর্শন করা সেটা সর্বাত্মভাব। এটাই অমৃতত্ব।

মরি আমি, আমার অহং, আমার দেহ। পরমাণুগুলি মরে না, তারা নিত্য। একদিকে জড় পরমাণু নিত্য আর অন্য একদিকে আত্মচৈতন্য নিত্য। জড় পরমাণুর আধার পৃথিবী, সে-ও নিত্য। পৃথিবী আমার মা, আমি পৃথিবীর পুত্র। 'হিরণ্যবক্ষা পরমব্যোমে অদিতি রূপিণী।' অথর্ববেদে পৃথিবীসূক্ত রয়েছে। পৃথিবীতে যদি সমাপন্ন হয়ে যেতে পার সেটাও এক প্রকারের অমৃতত্ব। 'অত্রৈব সমবলীয়ন্তে।' সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো পৃথিবীর মাঝে মিলিয়ে যাওয়া। তাই সিদ্ধের মৃত্যু যখন হয় পৃথিবী শক্তিদীপিত বা রূপান্তরিত হয়,

Charged হয়। কবর দেওয়ার ভাবনার পিছনে এই রহস্যভাবনা, mystic ভাব ছিল। মিশরের মমির ভাবনায় দেহকে অমর বা চিরন্তন করে রাখা হয়েছে। রাজার দেহের ভেতরে mystic power রহস্যময় দিব্য শক্তি রয়েছে বলে মানা হতো।

আত্মচৈতন্যে যারা বেশি জোর দেয় তারা দ্যুলোকের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়। তাদের দেহকে মৃত্যুর পর অগ্নিতে পুড়িয়ে দেওয়া হতো। দেহ অনিত্য আত্মা নিত্য। মহাবিদেহ ভাব। দ্যুলোকে মিশিয়ে যাওয়া, পিতৃচৈতন্যে সমাবিষ্ট হওয়া। আমার মাঝে দুটোই সমাবিষ্ট রয়েছে, সেভাবও আসে। অমৃতত্ব যেমন আত্মার তেমন দেহেরও। আত্মবাদী দেহকে পুড়িয়ে দিচ্ছে, যারা দেহবাদী তারা গোর দিচ্ছে।

১৪।। **প্রজানন্** আমি জানি। কাকে জানি? মৃত্যুকে। তাই এ প্রজ্ঞা মহাশূন্যের প্রজ্ঞা। বুদ্ধের প্রজ্ঞাপারমিতাও শূন্যতা থেকে আসে। যম বলছে আমি তোমাকে সে জ্ঞান দিচ্ছি। তুমি **নিবোধ** 'নি' অন্তরের গভীরে 'বোধ' জেগে ওঠ; গ্রহণ কর। **প্রতিষ্ঠা**—পৃথিবীতে যদি মিশিয়ে যাই তাহলে হয় 'প্রতিষ্ঠা', যদি দ্যুলোকে মিশিয়ে যাই তাহলে হয় **অনন্তলোকাপ্তি**।

দেহের জন্য পৃথিবী, বিদেহের জন্য দ্যুলোক। মৃত্যুর সাধনার দ্বারা প্রজ্ঞান বীর্য দিয়ে তারা পৃথিবীর সঙ্গে বা দ্যুলোকের সঙ্গে এক হয়ে যায়। এ যে **স্বর্গ অগ্নি** গুহাতে নিহিত রয়েছে। গুহা কোথায়? তোমার হৃদয়ে। যেখানে শ্রদ্ধা সেখানে আগুন রয়েছে। এখানে বাহ্য ক্রিয়াকলাপকে যৌগিক রূপ দেওয়া হয়েছে। উত্তর বেদিতে যে গর্ত থাকত সেখানে অগ্নির জন্ম হতো। আমাদের দেহে সে জায়গা হচ্ছে হৃদয়।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃপুরুষঃ জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।। কঠ২।১।১২

ব্রাহ্মণে আনুষ্ঠানিক, বা ক্রিয়াপর ব্যাখ্যা আছে। উপনিষদে দার্শনিক বা ভাবনামূলক ব্যাখ্যা আছে।

সূর্যভাবনা। হৃদয়ের চিৎশক্তি সেই নচিকেতা, সেই জীবসত্তা, কুমারসম্ভবের কুমার। তাকে উপরের দিকে ঠেলে দেওয়া এটাই নচিকেতার অভিযান। সে যখন সৌরলোকে পৌঁছায়, সৌরলোকের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়, তখন প্রতিষ্ঠা আর অনন্ত লোকাপ্তি দুটোই পায়। এটা positive দিক, ইতিবাদ। এটা না পেলে negative দিক, নেতিবাদ বা শূন্যবাদ ঠিক বোঝা যায় না।

১৫।। স্বর্গ্য অগ্নি কিভাবে চয়ন করতে হয়, কিরকম আর কত ইষ্টক লাগবে, সে সব যম নচিকেতাকে বোঝাচ্ছে। এ সম্বন্ধে কৃষ্ণযজুর্বেদে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। এখানে সেই সব details-এর প্রয়োজন নেই। তাই খুব সংক্ষেপে বলা হয়েছে। যম যা বলে যাচ্ছে নচিকেতা তা পুনরাবৃত্তি (repeat) করছে। আমাদের চিত্তবৃত্তি অনুসারে ইঁটগুলির নাম দেওয়া হয়েছে ব্রাহ্মণে।

১৬।। এখানে যমকে মহাত্মা বলা হয়েছে। যিনি Cosmic consciousness বিশ্বচেতনায়, ব্যাপক চৈতন্যে পৌঁছেছেন, তিনি **মহাত্মা**। যিনি individual consciousness, ব্যক্তিচেতনা উপলব্ধি করেছেন তিনি **জ্ঞানাত্মা**। আর যিনি transcendent সর্বাতিশায়ীকে পেয়েছেন তিনি **শান্তাত্মা**। গুরু যখন শান্তাত্মা হন, তখন গুরু চুপ হয়ে যান। তিনি দক্ষিণামূর্তি গুরু, মৌন দ্বারাই জ্ঞান দেন।

যম নচিকেতার উপরে খুশি হয়েছেন। তাই তাকে একটা extra অতিরিক্ত বর দিচ্ছেন। বলছেন তোমার নামেই এ অগ্নি প্রসিদ্ধ হবে। তার নাম হবে **নাচিকেতাগ্নি**। তার সঙ্গে একটা **সৃঙ্কা**, হার উপহার দিচ্ছেন। অমৃতত্ব লাভের পর বিভূতি আসে। সেটাই এই হার। লোকোত্তরের পথে এই সৃঙ্কা বা bar বাধা বা শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়ায়। সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভূতি ফুটবে। যদি তার বশ হয়ে যাই, তাহলে পতন না হতে পারে কিন্তু সেখানেই আটকে যাব। সৃঙ্কা দেওয়ার এই তাৎপর্য। বৌদ্ধেরা তাই তার প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁরা বলতেন যাগযজ্ঞ দিয়ে তোমরা যেখানে পৌঁছাও সেটা আভাস্বর ব্রহ্মলোক, সেটা রূপাবচর ভূমি। হয় তোমাদের পতন হবে নয় তোমরা আটকে যাবে।

তাই শুধু ভাবে পাওয়া নয়, অভাবেও পেতে হবে, তাহলে স্বভাবে পাওয়া যায়। তিনি ভাব আর অভাব দুই-এরই ওপারে। শুধু আনন্দ দিতে নয়, সম্ভোগ আর বিপ্রলম্ভ দুটো দিয়েই পাওয়া। গোপীচেতনা তাঁকে সব সময় পায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যদি না চলে যেতেন, সব সময় ব্রজে থাকতেন তাহলে গোপীদের সর্বনাশ হতো। ভাবে পাওয়ার সঙ্গে এই সৃঙ্কা রয়েছে।

স্বর্গ্য অগ্নি আদিত্য লোক বা অমৃতত্বকে পাওয়ার জন্য। নাচিকেত অগ্নিচয়নের ফলশ্রুতি আধ্যাত্মিক দিক থেকে দেখতে গেলে কামনাকে সংহত করা। তিনটি লোক পার হয়ে আদিত্য মণ্ডলে পৌঁছান। ভূলোক অন্তরিক্ষ লোক পার হয়ে দ্যুলোকে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অথবা তাকেও ছাপিয়ে যাওয়া। নাচিকেত অগ্নি তিনবার চয়ন করতে হবে।

১৭।। তিনটি ভূমিতে কামনাকে সংহত করে তার উর্ধ্বে যাওয়া। পৃথিবীতে আগুন প্রত্যক্ষ, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎ, আর দ্যুলোকে সূর্য। আর দুটো অগ্নির কথা আছে, চন্দ্র আর তারকা। আগুন হচ্ছে তপোবীর্য, তপঃশক্তি। তার তাপ হল বীর্য বা শক্তি আর আলো হল প্রজ্ঞা। ভূলোকে প্রথমে আগুন জ্বালাতে হবে। বৈদিক দর্শনে দুটি দৃষ্টি, অধিদৈব দৃষ্টি, আধ্যাত্মিক দৃষ্টি। অধিভূত আর এক দৃষ্টি আছে সেটা সাধারণ দৃষ্টিতে থাকে। স্থূল বাহ্য অগ্নি (material fire) একটা প্রতীক। ভিতরেও একটা আগুন জ্বলে; সেটা অধ্যাত্ম অগ্নি। ভিতরে অগ্নি যখন উদ্দীপ্ত হয় তখন বাহির আর ভিতরের আগুনের উপরে অগ্নি দেবতাকে দেখি। তাকেই বৈশ্বানর বলা হয়েছে। অধিভূত বস্তু উপলক্ষ্য মাত্র। তাঁর ভাব অন্তরে জাগানো, আর তাঁর প্রসাদ দিয়ে দেবতাকে লাভ করা, যিনি অন্তরে এবং বাইরে সমভাবে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন, এ ভাবটা সব সাধনায় দেখা যায়। লোকগুলি বাইরেও আছে, ভিতরেও আছে। পৃথিবীতে আলোর পিপাসা জ্বলছে। আমরা পৌঁছতে চাই সূর্যে। এই উপলব্ধিকে উপলক্ষ্য করে বলা হয়েছে : ''অগন্ম জ্যোতিঃ অবিদাম দেবান্।'' ইন্দ্রকে বলা হয় সূর্যম্ জজান, যিনি সূর্যকে জন্ম দিয়েছেন। এই আলোকে অন্তরিক্ষ লোক পার করতে হয়। পৃথিবীর আলোকে বলা হতো 'গো'। তা থেকে গবেষণা—'গো'কে খুঁজে বার করা। গো কে আগে করে যাওয়া, মানে Psychic-কে front-এ আনা, চৈত্যপুরুষকে সামনে আনা, অর্থাৎ অন্তরের আগুনকে বাহির করা। এই 'গো'কে পণিরা, আমাদের ভিতরের বণিক্‌বৃত্তিরা হরণ করে নিয়ে যায়। বণিক বুদ্ধি দেবতাকে সব উৎসর্গ করে না। পণিরা 'গো' চুরি করে একটা পাষাণ প্রাচীরে ঢাকা জায়গায় লুকিয়ে রাখে। তাকে খুঁজে বার করতে দেবতারা সরমা দেবশুনী কুক্কুরীকে পাঠান। সে 'গো'র খবর নিয়ে বৃহস্পতিকে দেয়। তখন বৃহস্পতি ও ইন্দ্র বাক্ ও বজ্র দিয়ে সে পাষাণ প্রাচীর ভেঙে

দেয়। গোযূথকে ছাড়িয়ে দেয়, অবরোধ মুক্ত করে। তখন আলোকসমূহ পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। সরমাকে বলা হয়েছে 'সরণ্যু' যা ঊষার আর একটা form রূপ। যখন বোধ (Intuition) জাগে, প্রাতিভজ্ঞান যখন ফুটে ওঠে, তাকে বলে ঊষার আলো। এই হল সরমা। তার প্রাণশক্তি তীব্র, ঘ্রাণশক্তি তীব্র। একে পাই যখন আমাদের জীবনে ভোর হয়। সে আলো দেবতার প্রসাদে এমনিই আসে। সে আমাদের ভিতরের আলোকে খুঁজতে চায়, কিন্তু আমাদের ভিতরের বণিক্‌বৃত্তি তাকে খুঁজে বের করতে দেয় না। তখন বৃহস্পতির বাক্‌শক্তি আর ইন্দ্রের বজ্রশক্তি আমাদের ভিতরের আলোকে প্রকাশিত করে।

পার্থিব জীবনে লুকিয়ে আছে দিব্যজীবনের সংবোধ। এটা গোযূথ। অগ্নি দিব্য অভীপ্সার দেবতা। প্রাণবাসনা যখন ঊর্ধ্বমুখী হয় তখন তাকে পাই। এ আগুন এমনি জ্বলে না। অগ্নি মন্থন করতে হয়। পার্থিব চেতনায় দিব্য ভাবের আবেশ যখন হয়, তখন বাধা আসে। তাকে অতিক্রম করতে হবে। অন্তরিক্ষে বাধা আসে মেঘের থেকে। তাকে 'বৃত্র' বা 'অহি' আবরক, বা সাপ বলা হতো। তারা আলোকে আবরণ করে রেখেছে। তা থেকে মুক্ত করতে যে রুদ্র শক্তি কাজ করে, তার সহায়ে ইন্দ্র এবং মরুদগণ থাকে। বিদ্যুৎ চমকায়, দেবতার আভাস পায়। অন্তরিক্ষলোক প্রাণলোক। আমাদের বাসনা বিষয়ের সঙ্গে অভিযুক্ত। তার সঙ্গে লড়বে বজ্রতেজ দিয়ে। প্রথম আলোর ঝলক দেখা দেয় বিদ্যুৎচমকে। আকাশে সূর্যের উদয় হয় সর্বশেষে। তখন ক্ষণিকের বিদ্যুৎ স্থির সৌরজ্যোতিতে প্রকট হয়। তখন পৌঁছই দ্যুলোকে, আদিত্য লোকে। এই তিন প্রকারে নাচিকেত অগ্নি চয়ন করতে হয়। এখানে স্থূল পার্থিবচেতনায়, অন্তরিক্ষে প্রাণচেতনায়, এবং দ্যুলোকে সূক্ষ্ম মূর্ধন্য-চেতনায় অগ্নি প্রদীপ্ত করতে হয়। অগ্নিকে বীর্যপ্রকাশ করে ফুটিয়ে তুলতে হয়, দেবতাকে আবাহন করতে হয়, তাঁর প্রসাদেই সব হচ্ছে।

যে তিনবার নাচিকেত-অগ্নিচয়ন করতে পারে সে তিনটা লোকের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে পারে। **ত্রিণাচিকেতঃ ত্রিভিরেত্য সন্ধিম্‌** দেহচেতনা, প্রাণ-চেতনা, আর আমাদের মন বা বোধি-চেতনা তিনটারই মাঝে সংযোজক রাস্তা তৈরি করতে পারে। এটা দেবযান, আলোর পথ। সাধারণতঃ দেহ এবং তার বাসনা, প্রাণ এবং তার কামনা, আর মন এবং তার ভাবনা, এদের ভিতরে বিরোধ থাকে। তিনটাকে যদি সন্ধি করা যায়, তাহলে তাদের ভেতরে আলো প্রকাশ পায়, একটা সামঞ্জস্য আসে। এই সামঞ্জস্য আনা—এটাই 'ত্রিভিরেত্য সন্ধিম্‌।'

এই তিনটার ভিতরে যে সামঞ্জস্য করতে পারে সে **ত্রিকর্মকৃৎ হয়**। যজ্ঞ যখন জীবনের সমস্ত কর্মকে বোঝায় তখন যজ্ঞকে কর্ম বলতে পারি। সুকৃত দেবতার জন্য, আমাদের জন্য নয়। সে কর্ম দেবাভিমুখী। দুষ্কৃত অন্ধ, সংকীর্ণ অহংবুদ্ধি, anxiety neurosis এর মূল, এটা দুষ্কৃতির বীজ। অসুর দুষ্কৃৎ। তাকে পরাজিত করে সুকৃৎ। যার দেহ প্রাণ মন এক হয়েছে সে স্বচ্ছন্দে তিনটে ভূমিতে কাজ করে যেতে পারে। যখন কর্ম করবে, যজ্ঞভাবনা-যুক্ত হয়ে অর্থ্যাৎ দেবতার জন্য করবে। এ রকম কাজ করব যাতে পৃথিবীর হিংসা ইত্যাদি খারাপ জিনিষ প্রশ্রয় না পায়।

এভাবে যে কর্ম করে সে জন্মমৃত্যুর আবর্তনকে পার হয়ে যায়। এটার literal আক্ষরিক এবং psychological আধ্যাত্মিক অর্থ রয়েছে। চিৎশক্তির আবির্ভাব, সেটাই জন্ম। এ আগুন জন্মায় আর বাড়ে। যখন অবসান হয় তখন মৃত্যু। কিন্তু যদি 'বর্ধমানম্‌

স্বে দমে', অর্থাৎ বেড়েই চলে, তখন আর মৃত্যু থাকে না। তাহলে জন্মাবারও প্রশ্ন থাকে না। নাচিকেত অগ্নির শেষ ক্রিয়া হচ্ছে দ্যুলোকে অগ্নি চয়ন করা। তার ফলে আদিত্যে অর্থাৎ জ্ঞানের নিত্য দীপ্তিতে আমরা প্রতিষ্ঠিত হতে পারি। এর সাধনা হচ্ছে দেহপ্রাণমনের গ্রন্থিগুলিকে বিদীর্ণ করা। এটা বীর্যের প্রকাশ। অর্থাৎ ক্ষাত্রকর্ম। তার সঙ্গে আবার সবসময় একটা শ্রদ্ধা রাখা। সাধনা ব্যর্থ হচ্ছে না, আমি যা করছি তার শতগুণ দেবতারা আমার জন্য করছেন, এ বোধকে জাগ্রত করা। এটা ব্রহ্মভাব। আর তার সঙ্গে মৃত্যুর প্রক্ষেপ মাঝে মাঝে থাকবে। প্রচেষ্টার অনুভূতি, প্রসাদের অনুভূতি, তার মাঝে শূন্য।

ফলশ্রুতি—পরম দেবতাকে জানব, আর পাব **নিচায্য**। এটা একটা mystic experience। বাইরের অর্থ 'দেখে'। ভিতরের অর্থ, একটা কিছুকে নিচিত করা, মানে চারিদিক থেকে গুটিয়ে এনে প্রতিষ্ঠিত করা। এটা থেকে 'নিকায়' এসেছে। Atomic Structure, আণবিক সংগঠনের ভিতরে একটা কেন্দ্রবিন্দু থাকে। সমস্ত structure গঠনটা একটা নিকায়। 'নিচায্য' মানে হবে সে-কেন্দ্র বিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে। আমাদের যে কোনো কেন্দ্রে দেবশক্তিকে সংহত করে, ঘনীভূত করে যদি তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি তাহলে সেটাও হল 'নিচায্য'। অর্থাৎ যে কোনো অনুকূল কেন্দ্রে ভগবৎ শক্তিকে নিহিত করতে হবে। সে দেবতা কি রকম? তিনি **ঈড্য**, তিনি **ব্রহ্মজ**, তিনি **জ্ঞ**। ঈড্য অর্থ পূজনীয়। তার মূল অর্থ হচ্ছে যাকে উদ্দীপ্ত করা যায়। আগুন কাঠের ভিতরে থাকে, সেটা ঈড্য অর্থাৎ তাকে জ্বালিয়ে তুলতে হবে। সে দেবতাকে সাধনার দ্বারা লাভ করতে হবে। সেটাই ঈড্য কথার দ্বারা ইঙ্গিত করা হচ্ছে। তার একটা সাধনা আছে,—'স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্। ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ।' (শ্বে. ১।১৪) নিজের দেহকে অধর-অরণি করে আর প্রণবকে উত্তর-অরণি করে ধ্যান দ্বারা মন্থন করে সে দেবকে পেতে হবে। অগ্নি মন্থনের উপায়—বাইরের আগুন অরণি দিয়ে জ্বালাতে হয়, আর ভিতরের আগুন জ্বালাতে হলে সমস্ত দেহকে অধর-অরণি হিসাবে মনে করতে হবে। যেমন শবাসনে শুয়ে আছি। তখন দুটি কেন্দ্রে, হয় হৃদয়ে অথবা ভ্রূমধ্যে, preferably হৃদয়ে মন্ত্রশক্তি বা চিৎশক্তি অবিশ্রাম ধারায় আমার অন্তরে নেমে আসছে, এটা 'নির্মথনম্'। এটা আধ্যাত্মিক অগ্নিমন্থন। ঋগ্‌বেদে আছে 'অগ্নিম্ ঈড়ে পুরোহিতম্', আমি আমার সমস্ত surrender করলাম সমর্পণ করলাম, নিজেকে ছেড়ে দিলাম, তাঁকে অনুভব করতে চেষ্টা করছি, তখন উপর থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ করে হৃদয়ে নেমে আসছেন তিনি। এটা প্রণবের ধারা, ইষ্টমন্ত্রের ধারা। আদিত্য থেকে আসে। এই হল ঈড্য দেবতা বা দেবতার ঈড়ন।

তিনি **ব্রহ্মজ** এবং **জ্ঞ**। জ্ঞ যিনি জানেন অর্থাৎ জ্ঞাতা, সাক্ষিচৈতন্য, ঋগ্‌বেদে যাকে জাতবেদা বলা হয়েছে। তিনি প্রত্যেকের ভিতরে নিষণ্ণ রয়েছেন। সাধনার দ্বারা তাঁকে প্রকাশিত করতে হবে। এখানে কঠোপনিষদে তাঁকে বলা হয়েছে 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃপুরুষঃ জ্যোতিরিব অধূমকঃ মধ্যে আত্মনি তিষ্ঠতি।' এটাই Phychic being, চৈত্যপুরুষ। এই অধূমক জ্যোতি জ তিনি জন্মান। ব্রহ্ম থেকে তিনি আবির্ভূত হন। ব্রহ্মের প্রাচীন বৈদিক অর্থ ছিল চেতনার বিপুলতা। বিষয়ের সব আসক্তি যখন ছেড়ে দিই, তখন চেতনা বিপুল হয়। যখন ব্রহ্মভাব জাগ্রত তখন দেবতাকে স্তুতি করা হতো। এই চেতনার প্রসার থেকে যে মন্ত্র ওঠে তাও ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ও মন্ত্র হতে যিনি জন্মান তিনি ব্রহ্মজ। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে

বাসনা-নির্মুক্ত চেতনা শান্ত, স্বচ্ছ ও প্রসারিত হয়। সে বিপুল চেতনার মাঝে আত্মস্বরূপে দেবতাকে যখন অনুভব করি তখন 'ব্রহ্মজ'। তিনি 'ঈড্য', তিনি 'ব্রহ্মজ', তিনি 'জ্ঞ'। তিনি অন্তর্যামী। বিদিত্বা, √বিদ্ বিদ্যা, বেদন, প্রাপ্তি। তাঁকে জানা তাঁকে পাওয়া, তাঁকে ঘনীভূত করে আধারে চিৎকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করা। এমনি করে যখন প্রতিষ্ঠিত করি তখন আমার সমস্ত কিছু প্রশান্ত হয়ে যায়। তাঁর সঙ্গে মিলে যাই, একাকার হয়ে যাই। ইমাম্ শব্দ এই জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, যম যেন নচিকেতাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিচ্ছে। এটা প্রত্যক্ষদর্শন direct vision এর মত, উপনিষদে অনেক জায়গায় এইরকম প্রত্যক্ষদর্শনের কথা রয়েছে। অত্যন্তম্ শান্তিম্। এমনি তার শান্তি যা সমস্ত অন্তকে অতিক্রম করে গিয়েছে। এখানে যম সুকৌশলে নচিকেতার তৃতীয় বরের ফলে যা আসবে, তার ইঙ্গিত দিয়ে দিচ্ছেন।

বৈদিকরা ইতি আর নেতিবাদের মাঝে কোনো বিরোধ দেখতেন না। একই অনুভবের এপিঠ ওপিঠ বলে মানতেন। পরে ইতিবাদ ব্রহ্মণ্যভাবনার আর নেতিবাদ বৌদ্ধভাবনার প্রতীক হয়ে গেল। বেদে ইতি আর নেতির মিলন আছে। এখানে ইতিভাবনা, তার ওপারে যদি চলে যাই তাহলে নেতিভাবনা। এভাবে যদি মন্থন করে, তাহলে সে শান্তিতে তলিয়ে যায়। ইতি আর নেতি ভাবনাকে সূর্যের গতির সঙ্গেও মেলানো যেতে পারে। ইতির দিক যেন মধ্যাহ্ন পর্যন্ত বাড়া, যেখানে অজস্র জ্যোতি। আমাদের ভিতরেও তা আসে। সূর্যের গতি যখন অস্তের দিকে যায় তাকে যারা স্বীকার করে তারা নেতিবাদী। এক শ্রেণির সাধক সূর্যের অস্তের গতিকেও স্বীকার করতেন। তাঁরা থাকতেন সাক্ষী বা দ্রষ্টা রূপে। যে কোনো অনুভূতিতে এ ভাব আসে। দেবাতর সঙ্গে যদি সংযুক্ত হতে না পারি তাহলে অবক্ষয় ঘটে। কিন্তু একটা পরম অনুভূতি যদি repeated হয়, যদি একটা চরম আনন্দ বা জ্যোতিদর্শন বারবার হয় তখন সূর্য ডুবে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়। প্রথমে সংবেদ শ্লথ হয়ে যায়। ভিতরে উলটো দিকে একটা ক্রিয়া হতে থাকে। একটা নিথর শান্তি আসে। জ্যোতি ম্লান হওয়ার জন্য কোনো বেদনা বোধ হয় না। এটা বৌদ্ধ নির্বাণ। আদিত্য-জ্যোতির অস্তগমন হচ্ছে ঘরে ফেরা return to home। বরুণ এই অব্যক্ত জ্যোতিতে আবির্ভূত হয়। ঋগ্‌বেদে রাত্রিসূক্তে এই কথা রয়েছে। রাত্রি তাকাল, চোখ মেলল, অন্ধকারকে তার জ্যোতি দিয়ে খণ্ডিত করল।

ব্রহ্মকে যদি ইতিভাবনা দিয়ে সঙ্কীর্ণ করি, তাহলে সেটাও অবিদ্যা। অব্যক্ত জ্যোতি দিয়ে যদি ব্রহ্মকে দেখি তাহলে একটা অনন্ত শান্তি পাওয়া যায়। 'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোযমগ্নিঃ।' এ 'অত্যন্তম্ শান্তি' তারই সূচনা করছে। শঙ্কর-দর্শনে সদ্‌ব্রহ্মের বোধ, বৌদ্ধ দর্শনে অসদ্‌ব্রহ্মের—যদি দুটোর সামঞ্জস্য আনা যায় তাহলে এটার অনুভূতি আসে। প্রথম অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া, আর সেখান থেকে আলোকে আবিষ্কার করা। তান্ত্রিকরা যাকে নৈশী সাধনা বলতেন, সেও এই অত্যন্তম্ শান্তির সাধনা। উপনিষদের বাকি সবটুকু এটারই বিস্তার। কিন্তু নচিকেতা তাকে এখানে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারে নি। অগ্নিচয়নের ফলে আলো জ্বলে উঠে শেষে নিভে যাবে, তারপরেও তুমি থাকবে।

১৮।। ইতিভাবনার উপরে আবার জোর দেওয়া হচ্ছে। অগ্নিচয়নে বিদ্যায় যে ভূমিতে পৌঁছতে পারে বিশুদ্ধ অধ্যাত্মবিদ্যায়ও সেখান পৌঁছতে পারে। যেখানে 'অসৎ'

সেটাও এই অগ্নিদ্বারা পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এটা বিশদভাবে বলা হয়েছে। 'অনিত্য সাধনা দ্বারা নিত্যকে পেয়েছি।' যজ্ঞদ্বারা কর্মদ্বারা সে-শান্তি আসে না,—এরকম ভুল ধারণা আমাদের মধ্যে আছে। শঙ্করাচার্য সেটা প্রচার করেছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়, অধিকারী হিসাবে সব হয়।

এতৎ ত্রয়ং বিদিত্বা ত্রিণাচিকেতঃ ভবতি। এইভাবে শ্লোকের প্রথম লাইন বুঝতে হবে। Ritual wayতে করা হোক, যমের ধারাতেই হোক বা আধ্যাত্মিক ধারাতে, সব বাসনার সংগ্রহণ করতে হবে। দেহ, প্রাণ, মন সবেরই। চণ্ডীতে এই একই কথা আছে। দেহ-প্রাণ-বোধিতে আগুন জ্বালান।

পাশ অর্থাৎ noose বা বন্ধন। আমাদের জ্ঞান যখন কোনো সীমাতে থাকে তখন তা হল মৃত্যুস্পৃষ্ট জ্ঞান। ওটা দেহ প্রাণ মনের মধ্যে আবদ্ধ। যে এইরকম অগ্নিচয়ন করতে পারে, সে তার আধারের প্রত্যেকটি বিভাগে যে পাশ রয়েছে তাকে সামনের দিকে ঠেলে দেয়। দেহের চারিদিকে গণ্ডী থাকে। প্রথম অগ্নিচয়নে সে-পাশ সামনের দিকে ঠেলে দিলাম। দেহ থেকে মুক্ত হলাম। আবার প্রাণবাসনাতে আবদ্ধ হই। দ্বিতীয় অগ্নিচয়নে সে-পাশকে সামনের দিকে ঠেলে দিলাম। প্রাণ থেকে মুক্ত হলাম। তৃতীয় অগ্নিচয়নে মন বুদ্ধির পাশ থেকে মুক্ত হলাম। এইরকম করে চেতনার প্রসার ঘটাতে হয়। তখন আর শোক থাকে না। আর স্বর্গলোকের আনন্দ অনুভব করা যায়।

১৯।। যে স্বর্গ্য অগ্নি তুমি গ্রহণ করেছ সে তোমার নামেই প্রসিদ্ধ হবে। ইতিভাবনার জয় হল। লৌকিক ভাবনা, ইতিভাবনা আর নেতিভাবনা। প্রথম বরে লৌকিক ভাবনা, দ্বিতীয় বরে ইতিভাবনা। তৃতীয় বরে নেতিভাবনা।

এখন তৃতীয় রাত্রির রহস্যের কথা হবে।

২০।। সাধারণ মানুষে **বিচিকিৎসা** অর্থাৎ সংশয় বা সন্দেহ রয়েছে। কেউ বলে **অস্তি,** কেই বলে **নায়মস্তি**। যারা বলে অস্তি তারা 'আস্তিক'। যারা বলে 'নায়মস্তি' তারা নাস্তিক। সাধারণভাবে বুদ্ধদেবকে নাস্তিক বলা হয়। সেটা কিন্তু ঠিক নয়। আসল নাস্তিক সে যে মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না, দেহাতিরিক্ত চৈতন্যের সত্তা স্বীকার করে না। যদি কেউ বলে দেহ মরে গেলে চৈতন্য থাকে না, দেহ আছে বলেই চৈতন্য এসেছে এরাই নাস্তিক। আমাদের দেশে চার্বাকরা নাস্তিক ছিল। তারা জানত দেহ চারভূতে তৈরি হয়েছে আর তাতে চৈতন্য পঞ্চমভূত। বুদ্ধদেব এরকম নাস্তিক ছিলেন না।

'নাস্তিক'-এর আর একটি mystic অর্থ রহস্যার্থ রয়েছে। যখন আমি সমস্ত ইতিভাবনা পার হয়ে যাব, তখন আমার কোনো অস্তিত্ব থাকবে কিনা। যারা বলে কিছুই থাকবে না তারা নাস্তিক। যারা বলে কিছু থাকবে তারা আস্তিক। এদিক থেকে শঙ্করাচার্যকে আস্তিক আর বুদ্ধদেবকে নাস্তিক বলা যেতে পারে। বেদে এটারও সমন্বয় করা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মেও তার মীমাংসা আছে। বুদ্ধ পূর্ণজ্ঞানী, সম্যক্ সম্বুদ্ধ। মালঙ্কপুত্রের প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধদেব যা বলেছেন সেটা মহাযান সম্প্রদায়ের ভিত্তি। তিনি বলেছিলেন থাকবে একথা বলা যায় না। এই কথা শেষের দিকে এই উপনিষদে যমও বলেছেন। যা থাকে তা অবর্ণনীয়। আবার বুদ্ধ বলেছেন আমি থাকব না, তাও বলা যায় না। বুদ্ধ চেতনা তিন প্রকার, ধর্মকায় বুদ্ধ, সম্ভোগকায় বুদ্ধ, নির্মাণকায় বুদ্ধ। নির্মাণকায় যিনি শরীর ধারণ করেছেন আর উপদেশ দিচ্ছেন। তাঁর চেয়ে সূক্ষ্মকায় হচ্ছে সম্ভোগকায় বুদ্ধ। আর ধর্মকায়

সবার মূলে, শূন্য, তথতা। সে সব সময় থাকে। সে জন্যই বুদ্ধ বলেছেন থাকব না সেটাও বলা যায় না। থাকব সেটাও বলা যায় না। আবার বুদ্ধদেব এখানে আবির্ভূত হওয়ার ফলে এমন একটা শক্তি বিকীর্ণ করা হল যে তিনি চলে যাওয়ার পরে বহুযুগ ধরে সেটা কাজ করে যাবে; যতদিন না আর এক বুদ্ধ এসে সে ভার নেন।

মহানির্বাণের প্রসঙ্গে কীভাবে বুদ্ধ পরপর ভূমিতে উঠে যাচ্ছেন তার বর্ণনা আছে। আটটি ধ্যানভূমি পরপর পার হচ্ছেন। চারটি রূপাবচর ভূমি আর চারটি অরূপাবচর ভূমি, যেখানে সমস্ত রূপ খসে যায়, যার চরম হল 'নৈব সংজ্ঞা নৈব অসংজ্ঞা।' তার উপরে নির্বাণ ভূমি। রূপাবচর আর অরূপাবচর দুটোই ধ্যানভূমি। বুদ্ধচেতনা নির্বাণভূমিতে পৌঁছে আবার নামছেন, আর এখানেই নির্বাণলাভ করলেন। ত্রিপিটকে এর কোনো ব্যাখ্যা করা হয়নি। শুধু বর্ণনা করা হয়েছে। থাকবে না সেটা বলতে পারি না—এটা তারই উত্তর। বুদ্ধচেতনা শূন্যে সমাপন্ন হল কিন্তু তার করুণা নেমে এল। এখানে করুণা থেকে যায়। এটার ওপরে উপনিষদে বেশি জোর দেওয়া হয় নি। যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই কথা বলেছেন! ইতি-ভাবকে অতিক্রম করা সেটাই 'প্রেত্য' 'ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি' যে চেতনাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে তার কোনো সংজ্ঞা নেই। এই উপনিষদে যমও বলছেন 'ন তত্র সূর্যো ভাতি...'। এক এক করে সব আগুন নিভে যাচ্ছে, কিন্তু একটা আলো রয়ে যাচ্ছে। সে আলো কি সক্রিয়? এখানে তা স্পষ্ট বলা হয়নি। মহাযানীরা বলতেন করুণার জন্য বুদ্ধচেতনা নেমে আসছে।

নচিকেতা তৃতীয় প্রশ্নে নেতির রহস্য জানতে চায়। এই রহস্য জানতে হলে মৃত্যুর ভিতর দিয়ে পার হতে হয়, অবিদ্যার রহস্য জানতে হয়। 'অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া অমৃতমশ্নুতে।' অবিদ্যা দুই প্রকারের। একটা প্রাকৃত অবিদ্যা, যেটা সাধারণত অজ্ঞানরূপে জীবনে দেখি। আর একটা রাহস্যিক— সেটা হচ্ছে নেতি দিয়ে সমস্তকে শূন্য করা। এইভাবে নিজেকে শূন্য করে রিক্ত করে যদি মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারি তাহলে তারপরে নেতি থেকে আবার ইতির সমস্ত ঐশ্বর্য ফুটে ওঠে। আগে মরণ তারপরে সম্ভোগ। প্রথমে যে অবিদ্যা দেখা যায় প্রাকৃত জীবনে, সেখানে সম্ভোগ আছে কিন্তু সেটা মৃত্যুর পাশে পরিবেষ্টিত। এখানে বার বার জন্মান আর মরা। এখানকার মৃত্যু প্রাকৃত মৃত্যু। এই মৃত্যুকে পার হতে গেলে বিশ্বচেতনায় পৌঁছাতে হয় (Universal Consciousness)। কিন্তু এই প্রাপ্তিই শেষ প্রাপ্তি নয়, এর উজানে যেতে হবে। বিশ্বাত্মক হবার পরে বিশ্বোত্তীর্ণ হতে হবে। বিশ্বোত্তীর্ণ হয়ে আবার বিশ্বে ফিরে আসা। এটা হচ্ছে অসম্ভূতিতে গিয়ে আবার সম্ভূতিতে ফিরে আসা। তাই এ সাধনাতে মৃত্যু হবে উপসেচন। মাঝে মাঝে তার প্রক্ষেপ থাকবে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে মুহূর্তে মুহূর্তে নিজেকে ফাঁকা করা। আত্মসমর্পণের পিছনে এই রহস্য রয়েছে। আমরা যে মন্ত্র জপ করি তার ফল শেষে ইষ্টকে সমর্পণ করতে হয়। যোগসাধনাতেও এই ভাবনা দেখি। সমাধি দিয়ে যাকে লাভ করলাম, যে জ্ঞান পেয়েছি তারই একটা সংস্কার নিজের ভিতরে উৎপন্ন করে তাঁর উপরে সব ছেড়ে দেওয়া। তারপরে সে নিজেই আমার ভিতরে ফুটে উঠবে।

যখন বিশ্বের সম্ভোগ—বৌদ্ধরা একে বুদ্ধদেবের সম্ভোগ বলতেন, তাকে অতিক্রম করে শূন্যতা, তথতা, রিক্ততাতে পৌঁছাতে যাই তখন সম্ভোগের আবেগ আরো বেড়ে যায়। মধুমতী প্রজ্ঞার ভূমিকায় যতসব প্রলোভন দেখা দেয়। ব্যাসমুনি বলেছেন এখানে

উত্তীর্ণ হলে ইন্দ্রিয়ারাম ইত্যাদি সম্ভোগ আসে, তাকে বিচ্ছিন্ন করতে হয়। তাকে যদি পার করে যেতে পারি, তাহলে শূন্যতায় পৌঁছই, আর সেই শূন্যতার ফলে সব ইতি—ঐশ্বর্য ফোটে।

সাধারণতঃ ইতির ঐশ্বর্য সাধককে অভিভূত করে। যদি তাকে অতিক্রম করতে পারি, তাহলে আমরা তার প্রভু নিয়ন্তা হতে পারি। এটাই শিবের বৈরাগ্যের দিক। শিব পরম বৈরাগী। কিন্তু তাঁকেই অবলম্বন করে বিশ্বপ্রকৃতির লীলা চলছে। সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে মহাপ্রকৃতি তার কোলে বসেছে। রিক্ততা এবং পূর্ণতা পাশাপাশি। আমাদের শক্তি পূজাতেও এই ইতি এবং নেতির ধারাটি সুন্দর করে দেখান আছে। শক্তি আমাদের ভিতর ফুটছে—প্রথমে সে 'নন্দা', এটা তার বালিকাবস্থা। তখন সে উচ্ছল আনন্দময়ী। তার পরে 'নন্দা' শক্তির ভিতরে দেখা দেয় 'ভদ্রা', কল্যাণময়ী। এটা কিশোরী অবস্থা। তারপরে আসে তারুণ্য—এখানে সব বিরোধী শক্তি দেখা দেয়। বিরোধী শক্তিকে জয় করতে হবে, তখন যে রূপটি ফুটল তা হলো 'জয়া'। তারপরে সে শক্তি নিঃস্ব হয়ে যায়। তখন সে হয় 'রিক্তা'। দুর্গোৎসবে এই ভাব ফুটিয়ে তোলা হয়। ষষ্ঠীতে সে 'নন্দা', সপ্তমীতে সে 'ভদ্রা', অষ্টমীতে সে 'জয়া' মহিষাসুরমর্দিনী; নবমীতে 'রিক্তা' শূন্যা—লব্ধ জয়কে সে প্রত্যাখ্যান করে। অষ্টমী আর নবমীর মাঝখানে সন্ধিপূজা আছে, গভীর রাত্রিতে সে পূজা হয়। জয়লাভ করে, সিদ্ধি পেয়ে, সব সমর্পণ করে শূন্য হয়ে যাওয়া। নবমীর বলি তাই পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্গের সূচক। এরই ইঙ্গিত দেওয়া আছে কেনোপনিষদের উপাখ্যানে (৩।১)। সেখানে বলা হয়েছে 'ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে, তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত। ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি।' ব্রহ্মই জয়লাভ করলেন আর দেবতারা সে জয়ে মহিমান্বিত হলেন। কিন্তু দেবতাদের অভিমান হল জয়লাভ আমরা করেছি, এর মহিমা আমাদের। তখন তাঁদের অভিমান দূর করবার জন্য ব্রহ্ম যক্ষ রূপে (mystery) রহস্যমূর্তিতে তাঁদের সামনে প্রকট হলেন। দেবতারা প্রথমে অগ্নি ও বায়ুকে পাঠান। কিন্তু তারা পরাভূত হয়ে ফিরে আসে। তখন দেবতারা ইন্দ্রকে পাঠান। ইন্দ্রও প্রথম তাকে চিনতে পারলেন না, আর তখন যক্ষের জায়গাতে একটা মহাশূন্য দেখা দিল। আর সেই মহাশূন্যে দেখা দিল একটি নারীমূর্তি, তিনি উমা হৈমবতী। তিনি ইন্দ্রকে ব্রহ্মের মহিমা বুঝিয়ে দিলেন। সর্ব প্রথম ইন্দ্রই ব্রহ্মের জ্ঞান পেলেন, তাই ইন্দ্র দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রচেতনা যখন শূন্য হল তখনই সে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারল! সাধনার বেলায় এই একই কথা খাটে। যখন কোনো সিদ্ধি লাভ করি তখন যদি মনে করি এ বিজয় আমাদের, তখন দেবতা তা সহ্য করেন না। তাঁর কাছে আবার আমাদের পরাভব মানতে হয়। তখন সব সমর্পণ করে রিক্ত হতে হয়। তারপরে আবার ঐশ্বর্য ইত্যাদি ফিরে পাই পূর্ণরূপে যথার্থভাবে।

নচিকেতা দ্বিতীয় বরে সম্ভূতির সব ঐশ্বর্য পেয়েছে। অনেক সাধকের এখানেই শেষ। কিন্তু বিবেক জাগ্রত হলে মধুমতী ভূমির বন্ধন কেটে সে চলে যায়। তার একটা গুণবৈতৃষ্ণ্য আসে। গুণ, স্বভাবের প্রতি তৃষ্ণার ভাবকে ছাড়িয়ে যায়। তখন পরম বৈরাগ্য লাভ হয় আর তারই ফলে কৈবল্য, লাভ হয়। তখন 'কেবল', একা নিঃসঙ্গ হই। প্রথমে একটা tussle দ্বন্দ্ব আসে, ঐশ্বর্যের প্রলোভন সাধক প্রত্যাখ্যান করে। প্রত্যাখ্যান করার পর শূন্যতায় গিয়ে আবার স্বরূপে ফিরে আসে।

কুমারসম্ভব আখ্যায়িকার পিছনেও এই একই ভাব ফুটে উঠেছে। শিব নিঃসঙ্গ। একান্তে তপস্যা করছেন, পার্বতী প্রথমে মদন ও বসন্তের সাহায্যে শিবকে ভুলাতে গেলেন। কিন্তু শিবের তৃতীয় নয়নে মদন ভস্মীভূত হল। তখন পার্বতী তপস্যা করতে গেলেন। যখন পার্বতী তপস্বিনী হলেন তখন শিব নিজেই তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁদের মিলনে আবির্ভূত হল কুমার শক্তি (Cosmic force), যিনি তারকাসুর জয় করলেন।

তাই রিক্ততার মাঝেও যে সমস্ত প্রলোভন আসে তাকে জয় করতে হয়।

অবিদ্যার দ্বারা সমস্ত কিছু 'নেতি' করে দিয়ে, শূন্য করে দিয়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করতে হবে, তারপরে নেতি থেকে ফিরে এসে অমৃতের সম্ভোগ করতে হবে।

২১।। নচিকেতার প্রশ্নের উত্তরে যম বলছেন, তুমি যার রহস্য জানতে চেয়েছ, 'অণুরেষ ধর্মঃ'। যে সমস্ত কিছুকে ধারণ করে আছে, তাই হল ব্রহ্মের অস্তিভাব। বৈদিক ঋষিরা বলতেন, সূর্যই ধারক। আবার সূর্যের পিছনে আছে আকাশ, যার মাঝে সূর্য ওঠে, অস্ত যায়। এই আকাশই সত্যিকার ধারক। আকাশ শূন্য। যে মতে সূর্যকে ধারক মানা হয় সেটি ব্রাহ্মণ্য মতবাদ; আর যে মতে আকাশকে ধারক মানা হয় সেটি বৌদ্ধ মতবাদ। আকাশ অর্থাৎ শূন্যতাই সবাইকে ধারণ করে রয়েছে। কিন্তু তার ধারণা করা কঠিন। যেহেতু তা সূক্ষ্ম, অণু। নিজে অণুর মতো হয়ে গেলে তাকে ধারণা করা যেতে পারে। তাই দরকার একটা বিন্দুতে নিজেকে গুটিয়ে আনা। তখন আশে পাশে শুধু শূন্যতা থাকে মাত্র, একটা অস্তি ভাব থাকে কিন্তু কোনো উপাধি থাকে না।

এই অণুর মতো সূক্ষ্ম ধর্মকে দেবতারাও ঠিক করে ধরতে পারেন নি। দেবতাদের ভেতরেও একটা বিচিকিৎসা জেগেছিল। দেবতারা হচ্ছে diversified spiritual forces. বহুধা বিচ্ছুরিত অধ্যাত্ম শক্তি। **এই শূন্যতার রহস্যই যমের তত্ত্ব। দেববাদ দিয়ে তা জানা যায় না।** দেবতারা ইতিবাচক, Positive realisation; তাকে বিসর্জন দিলে ইতি ছাড়লে তখন নেতি পাব। তারপর আবার ইতিতে ফিরে আসব। এক এক করে সব জ্যোতিগুলো নিভে গেল কিন্তু সেই পরম অন্ধকারে একটা জ্যোতি দেখা গেল, যার প্রকাশে সব কিছু আলো পায়, যার ভা-তে সব বিভাত।

এ তত্ত্ব জানা অত্যন্ত কঠিন। যদি দেবভাবে আসক্ত থাকি, তাহলে জানা যায় না। অথচ এটাই সমস্ত কিছুর ধারক। যম নচিকেতাকে বলছেন, 'এটা নাই বা জানলে, তুমি অন্য কিছু চাও।' কিন্তু আর কিছু চাইবার তো নেই। দ্বিতীয় বরে 'ইতি' রূপে সবই পাওয়া গেছে। এখন 'নেতি' যদি না দেয় তাহলে আর পাবার কিছু নেই।

তিনটে স্তর। প্রথম স্তরে প্রাকৃত সম্ভোগ দ্বিতীয়ে অপ্রাকৃত সম্ভোগ। প্রথমে সূর্যতেজোদ্ভাসিত পৃথিবীতে, দ্বিতীয়ে সূর্যলোকে, আলোর জগতে নচিকেতা পৌঁছেছে। সে তার ওপারে যেতে চেয়েছে, অন্য কিছু চায় না। যম তাকে আর কি দিতে পারে? সূর্যে যে পৌঁছেছে তাকে পার্থিব প্রলোভন লুব্ধ করতে পারে না। সৌরজগতে প্রলোভন থাকতে পারে নচিকেতা তাতেও প্রলুব্ধ হয়নি।

যমের প্রস্তাব ছেলেভুলান কথা। শূন্যতার রহস্য জানতে হলে নিরোধ সংস্কার উৎপন্ন করতে হয়। একদিনে ফাঁকা হওয়া যায় না। সম্ভোগের সংস্কার বার বার এসে বাধা দেয়, তখন তাকে বারবায় নিরোধ করে নিরোধের সংস্কার উৎপন্ন করতে হয়।

ইতিভাবনার প্রলোভন আসতে পারে, কিন্তু নিরোধ সংস্কার যদি পাকা হয় তাহলে তখন তারা আর কিছু ক্ষতি করতে পারে না। এই ভাবকে বৌদ্ধরা 'ধর্মনৈরাত্মাম্' বলতেন। 'পুদ্গলনৈরাত্ম্য' আর 'ধর্মনৈরাত্ম্য'। পুদ্গলনৈরাত্ম্য হচ্ছে নিজের ভিতরে শূন্য হব, বাইরের জগৎ এমনি বয়ে যাবে। তাতে আমি তটস্থ থাকব। এটা হীনযানী মত। মহাযানীরা বলতেন তা শেষ নয়। তাঁরা ধর্মনৈরাত্ম্যের কথা বলতেন। তোমার ভেতরে যে শূন্যতা আসবে তাকে বাইরেও অনুভব করতে হবে। তখন সিদ্ধি করায়ত্ত হল বলা যাবে। এটাকে বলা হতো বিনাশ। অন্তরেও ফাঁকা, বাইরেও ফাঁকা। এইভাব যারা অবলম্বন করত তাদের বৈনাশিক বৌদ্ধ বলা হতো।

নচিকেতা তৃতীয় বরে এটাই চাইছে। কিন্তু সব সময় শূন্যতার অবস্থাতেই থাকবে তা নয়। নিরোধ সংস্কার থাকবে, কিন্তু সে নিরোধের মাঝে সব ফুটে উঠবে। ভব এবং নির্বাণ দুইই একাকার হয়ে যাবে। তখনই তোমার ঠিক সিদ্ধি হবে। প্রখ্যাত বৈনাশিক বৌদ্ধাচার্য নাগার্জুন বলতেন, নির্বাণ যদি তোমার আসক্তির ব্যাপার হয়, তখন তোমার পাওয়া সম্পূর্ণ হল না। এই কঠোপনিষদেও বলা হয়েছে তুমি এমন জায়গায় পৌঁছাবে যেখানে, যা এখানে সেই ওখানে—যা ওখানে সেই এখানে। ভব ও নির্বাণের কোনো বিরোধ থাকবে না।

২২।। যে সত্য দেবতার অগোচর, যাকে তারাও ধারণ করতে পারেনি, যাকে জানা কঠিন আমি তাকেই চাই। এটাই সাধক চিত্তের জিদ, লক্ষ্যে পৌঁছবই। সে লক্ষ্য হল চরম পরম রিক্ততা। অস্তিত্বকে জানতে গেলে নাস্তিতে ডুবতে হবে।

২৩-২৪।। যম সব প্রাকৃত জগতের প্রলোভন দেখাচ্ছেন। শতায়ু, পুত্র-পৌত্র-হস্তি-অশ্ব-সোনা, অনেক ভূমি দিতে চাইছেন। অর্থ কামের চরম দিতে চাইছেন।

পার্থিব জীবনের প্রলোভন **মহাভূমি**। স্বর্গলোকের প্রলোভন দিব্য ভূমি; যেখানে চিন্ময় ভোগ সেই ভূমি। অপার্থিব জগতে ভোগ সম্ভব হয় ভাবনার দ্বারা। 'ইহ' ভোগ এখানকার ভোগ। 'অমুত্র' ভোগ ওখানকার ভোগ, দুটোর প্রতি বিরাগ আনতে হবে। অনেক সময় আমরা আন্তর ভাবনার দ্বারা ভোগ করি। দুটোকেই ছেড়ে যেতে হবে। শূন্যে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। ইহভোগ **শতায়ু**, অমুত্র ভোগ **চিরজীবিকা**।

২৪-২৫।। যে যে কাম মর্ত্যলোকে দুর্লভ সে সব যম দিতে চাইছে।

বামা-তন্ত্রে যাকে নায়িকা বলা হয়েছে সে হচ্ছে মহাশক্তির হ্লাদিনীশক্তির বিকার। পুরাণে তাকে অপ্সরা বলা হয়েছে।

মধুমতী ভূমিতে যখন সাধক আসে তখন একটা প্রকৃতিপুরুষের সামরস্য আসে। কিন্তু প্রথমে যেটা আসে সেটা আসল নয়, নকল। এটা একটা চরম প্রলোভন। যাকে পেতে চেয়েছি, মনে হয় তাকে পেয়ে গেলাম। এটা সাধকের পক্ষে সর্বনাশের। এটাতে সাধনার objective রূপ বিনষ্ট হয়। সত্যিকার সামরস্য অদ্বৈতের সামরস্য। পুরুষ আর প্রকৃতি সেখানে এক হয়ে থাকে কিন্তু নিম্নভূমিতে দুটোর মাঝে ভেদ থাকে। যেমন একটি গন্ধর্ব, একটি অপ্সরা। এ দুটোর মাঝে ভেদ যদি মিটে যায়, যদি এক হয়ে যায়, তাহলে তারা শিবশক্তির স্বরূপ হয়। কিন্তু তার প্রতিষ্ঠা হয় শূন্যতায়।

যম নচিকেতাকে প্রাকৃত অপ্রাকৃত সব ভোগ দিতে চেয়েছে।

২৬।। এবার নচিকেতা যমকে উত্তর দিচ্ছে। এটা উদাসীনের জবাব, বৈরাগীর

জবাব। মর্ত্যলোকের সম্ভোগ আজ আছে কাল নেই। এই সম্ভোগ ইন্দ্রিয় দিয়ে হয়, এবং তা ইন্দ্রিয়গুলোকে জীর্ণ করে দেয়। সুতরাং তুমি যা দিতে চেয়েছ সে তোমার কাছেই থাক। আমার তাতে কোনো প্রয়োজন নেই। তুমি যে কোনো ভোগের বস্তু দেবে, তুমিই আবার তার অন্ত করে দেবে।

২৭।। এটাই নচিকেতার আসল জবাব। **বিত্ত** মানে সম্ভোগের বস্তু যা পাবার জন্য আমরা ছটফট করি। বিত্তৈষণা একটা ইচ্ছা বা সেই এষণা ত্রয়ের এক, যা ত্যাগের কথা সব সাধনায় বলা হয়। বিত্তৈষণা, পুত্রৈষণা, লোকৈষণা। ভোগের উপকরণ সঞ্চয় করা সেটা বিত্তৈষণা। পুত্ররূপে এসে আবার আমি তা ভোগ করব, তার জন্য পুত্রকামনা এটা পুত্রৈষণা। আবার অপার্থিব লোকে দিব্য বিত্তকে সম্ভোগ করার ইপ্সা, এটা লোকৈষণা। মানুষকে বিত্ত দিয়ে তৃপ্ত করা যায় না। আমাদের চিত্ত বিত্তলাভ করে, কিছুদিনের জন্য তা সম্ভোগ করে, আবার আরো কিছু চায়।

নচিকেতা আরো বলছে আমি যখন তোমাকে দেখেছি, পেয়েছি তখন বিত্ত তো আমি আপনা থেকেই পাব। এর অর্থ হচ্ছে, যদি শূন্যে, রিক্ততায় থাকতে পারি তাহলে বিত্ত আপনি আসবে। পেতে হলে ছাড়তে হবে। বাইরের পাওয়া মানুষকে সন্তোষ দিতে পারে না। অন্তরে যদি পাই সেইটেই সত্যিকার পাওয়া। তখন তারই প্রতিমূর্তি বাইরে দেখতে পাই। কিন্তু অন্তরকে রিক্ত করতে হবে।

২৮।। মর্ত্যলোক থেকে দেবলোকে উত্তীর্ণ হয়েছি, এর পরে তুমি আমাকে কি করে প্রলুব্ধ করবে? যদি সত্যকে না জেনে ফিরে যাই তাহলে দেখতে পাব বর্ণ রতি প্রমোদ। বাইরে যা দেখছি শুধু তাই দেখেই আকৃষ্ট হব, তাতে আমি রাজি নই।

২৯।। **মহতি সাম্পরায়ে**—সম্+পরায়। পরায়—পলায়ন। সম্যক্‌রূপে পলায়ন, বৈরাগ্য, escapism বলে যাকে গালি দিই, সেটা আসলে হচ্ছে সম্যক্‌রূপে চলে যাওয়া। এটাই অপবর্গ, জগৎ থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুখ ফিরিয়ে যাওয়া, এটা একটা গতি। সৌরমণ্ডল ভেদ করা, উল্কার মতো ছোটা the great departure, বৌদ্ধেরা বুদ্ধের সংসারত্যাগকে বলেন মহাভিনিষ্ক্রমণ। কামজগতের সমস্ত কিছুকে ছাড়িয়ে যাওয়া, সেই মহাশূন্যতার দিকে বেরিয়ে যাওয়া। তার সিদ্ধি হচ্ছে মহা-পরিনির্বাণে। প্রথমে আসে মহাসাম্পরায়, যা পর্যবসিত হবে মহাশূন্যতায়। তখন সমস্ত আলো তার মাঝে ফুটে ওঠে। ঈশোপনিষদে তাই বলা হয়েছে 'তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথাঃ'—প্রথমে ছাড়া তার পরে ভোগ। দুর্গাপূজার তিথিগুলিতে যেমন দেখা যায়, নবমীতে দুর্গা হন রিক্তা আর দশমীতে তিনি হল পূর্ণা। সব যদি ছাড়তে পারি তাহলে সব পেতে পারব।

প্রথম অধ্যায় [প্রথম বল্লী সমাপ্ত]

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় বল্লী

১।। যমের উপদেশ। নচিকেতা যদি সিদ্ধচেতনাই হয় তাহলে উপদেশের কোনো প্রয়োজন নেই। উত্তম অধিকারী সে, তৈরি হয়ে এসেছে। শুধু স্পর্শেই তার ভিতরে সব ফুটে ওঠে। এটাকে শাম্ভবী দীক্ষা বলা হতো। তৈরি আধার গুরুর কাছে এসেছে, তাকে কোনো উপদেশের প্রয়োজন হয় না। মধ্যম অধিকারী সে যার ভিতরে সাড়া দেয়, কিন্তু তার ভিতরেও শক্তি সঞ্চার করতে হয় যদিও বাইরের বাহুল্যের দরকার হয় না। এটাকে শাক্তীদীক্ষা বা বেধীদীক্ষা বলা হতো। গুরু শিষ্যকে বেছে নিচ্ছেন আর তার ভিতরে শক্তি সঞ্চার করছেন। যেন তাকে বিদ্ধ করছেন। মন্দ অধিকারী বা অধম অধিকারী, তাকে জাগাতে হলে অনেক কিছু করতে হয়। তাদের ভেতরে শক্তি সঞ্চার করবার জন্য তাদের মন্ত্র দেওয়া হয়। একেই মান্ত্রীদীক্ষা বলা হতো। এটা lowest type-এর, সবচেয়ে নিম্নভাবের দীক্ষা। তবে সাধারণের জন্য এটাই উপকারী। কিন্তু আমরা মান্ত্রীদীক্ষাকেই মনে করি একমাত্র দীক্ষা। সেটা ভুল। আরো দুটো দীক্ষা যে রয়েছে সেটা আমরা অনেকে জানি না। অধিকারী যদি উত্তম বা মধ্যম হয়, তাহলে তাদের মন্ত্র নিতেই হবে তার কোনো মানে নেই।

শাস্ত্রে যখন উপদেশ দেওয়া হয়, তখন অধম বা মধ্যম উভয়ের অনুকূল উপদেশ দেওয়া হয়। উত্তমের জন্য কোনো উপদেশের দরকার নেই এবং শাস্ত্রেরও দরকার নেই। সেখানে গুরু অন্তর্যামী—মনের মানুষ। ভালবাসা আত্মসমর্পণ দিয়েই বস্তুলাভ। সেই মনের মানুষ যাঁকে সামনে পেলাম এমনভাবে আমার চিত্তকে তিনি আবিষ্ট করলেন যে তার বাইরে আমি কিছুই দেখছি না। ভাগবতে যেমন গোপীদের কথা বলা হয়েছে, তারা শুধু কৃষ্ণকেই দেখছে। এক গোপী অন্য গোপীকেও দেখছে না। গোপীদের সহজ ভালবাসা। তার কাছে উদ্ধবের তত্ত্বজ্ঞান পরাভূত হল। কৃষ্ণ যখন মথুরায় চলে যান, উদ্ধব ওদেরকে বোঝাচ্ছেন—তোমরা কাঁদছ কেন? কৃষ্ণ তো সর্বব্যাপী। তখন গোপীরা বল্ল 'সে কী! আমরা তো তাকে শুধু অন্তর দিয়ে পাইনি, আমাদের অন্তর বাহির সমস্ত দিয়ে তাকে পেয়েছি।' শাস্ত্রজ্ঞান সহজ ভালবাসার কাছে বৃথা। ভালবাসাই তাদের শাস্ত্র, অনুরাগই শাস্ত্র। বৌদ্ধরাও এইকথা বলতেন। যাঁরা বুদ্ধকে সম্যক্‌রূপে পেয়েছেন তাদের জন্য 'বুদ্ধবচনম্ অবচনম্'। শঙ্করাচার্যের দক্ষিণামূর্তি গুরুর পিছনে এইভাব রয়েছে।

নচিকেতা যদি উত্তম অধিকারী, তাকে উপলক্ষ্য করে সমস্ত জগতের জন্য উপনিষদ রচনা করা হয়েছে। গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ যেন হরপার্বতীর সম্বন্ধ বলা হয়। আগম নিগম দুইপ্রকারের তত্ত্ব-উপদেশ আছে। যেখানে শিবগুরু, পার্বতী শিষ্যা সেটা আগম। আর

যেখানে পার্বতী গুরু আর শিব শিষ্য সেটি নিগম। উভয়েই উত্তম অধিকারী। গুরু ও শিষ্য দুইই সমান। উত্তম অধিকারীকে লক্ষ করে জগতের কল্যাণের জন্য উপনিষদতত্ত্বের প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু উপদেশ আসলে মধ্যম আর অধম অধিকারীর জন্য।

২।। সাধকের দুই শ্রেণি। **মন্দ** ও **ধীর**। মন্দ, যাদের বুদ্ধি মলিন, অথচ সত্যের একটা পিপাসা মনের মধ্যে জেগেছে। আর যাদের বুদ্ধি প্রোজ্জ্বল তারা ধীর। মানুষের সামনে জগৎ আসে **শ্রেয়** এবং **প্রেয়** রূপে। প্রেয় বস্তু আমাদের সংস্কারের অনুকূল থাকে, তাই তাকে ভাল লাগে। কিন্তু এটা অসম্পূর্ণ, মিথ্যা ব্যাপার। এতে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় না। ইন্দ্রিয়শক্তি অবসন্ন হয়ে পড়ে, প্রজ্ঞালাভ হয় না। প্রেয়কে নিয়ে যাঁরা মুগ্ধ হন তাঁরা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারেন না। প্রেয়কে ছাপিয়ে শ্রেয়ভাবনা। শ্রেয় আমাকে আশ্রিত করে রয়েছে—আত্মার শ্রী। আর ইন্দ্রিয়ের প্রীতি প্রেয়। সে বাইরের ইন্দ্রিয়ও হতে পারে বা অন্তরের ইন্দ্রিয় মনও হতে পারে। শ্রেয়কে যখন আমাদের মাঝে আবিষ্কার করি তখন আমাদের আত্মশ্রী হয় প্রীতির কারণ। আমরা এ দুটো ঠিক তফাৎ করতে পারি না। আমরা আনন্দের জন্য বিষয়ের উপর নির্ভর করি, কিন্তু এটা ঠিক নয়। বিষয় না থাকলেও আমরা আনন্দ পেতে পারি, যদি আত্মশ্রীকে গ্রহণ করি। আমাদের ভিতরে এই শ্রেয় এবং প্রেয় দুটোই ঘটে। ভিতরের উল্লাসকে কায়েমী করতে হবে। বাইরের বস্তুকে আশ্রয় করে যে প্রীতি সে শাশ্বত হয় না। **সম্‌পরীত্য**—সম্-পরীতি সম্যক্‌রূপে চারিপাশে ঘুরে একটা বস্তুকে পাওয়া। যে-কোনো প্রীতির বস্তু সামনে এলে তার চারিদিকে ঘুরে তার বিচার করতে হয়, এ জিনিষ ঠিক কিনা তার 'বিবেক' করতে হয় (discrimination), সে যদি আত্মশ্রীর প্রতিকূল হয় তাহলে তাকে প্রত্যাখ্যান করতে হয় কিন্তু যে মন্দধী সে প্রেয় বস্তুকে আঁকড়ে ধরে। কেননা, তার লক্ষ্য হচ্ছে **যোগক্ষেম**। যা পাইনি তাকে পাওয়া যোগ, আর যা পেয়েছি তাকে আঁকড়ে ধরা সেটা ক্ষেম। এটা বুদ্ধির মন্দতার লক্ষণ। এটা পরমার্থ থেকে মানুষকে ভ্রষ্ট করে।

সেইজন্যে **বিবিনক্তি** অর্থাৎ হৃদয় দিয়ে 'বিবিচ্য' বিবেক করে। যে বস্তু আমার আত্মার জন্য দরকারি তাকে গ্রহণ করব। যদি পারি কোনো বস্তু ছাড়াই আনন্দ পাব। গীতাতে বলা হয়েছে 'নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন। ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ।। (৩/১৮) অর্থাৎ বস্তুনির্ভর না হওয়া। যা বাইরে পাচ্ছি, তা অন্তরে রয়েছে এই ভাবে বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। শ্রেয় এবং প্রেয়ের বিবেক সাধনার প্রথম ধাপ। যে করতে পারে সে ধীর। যে পারে না সে মন্দ। অবশ্য একদিন মন্দেরও change (পরিবর্তন) আসবে। ভোগ করতে করতে বৈরাগ্য আসবে। ভুক্তভোগের বৈরাগ্য। তখনই পাকা বৈরাগ্য আসে। তখন প্রেয়ই শ্রেয়ের রাস্তা দেখিয়ে দেয়।

শ্রেয় এবং প্রেয়ের দর্শন একটা জীবনদর্শন। সাধারণ মানুষ প্রেয়কে বরণ করে। তখন অর্থ আর কামই তাদের পুরুষার্থ হয়। তারা মন্দ। যাদের ধর্মবুদ্ধি প্রবল হয়, তারা মোক্ষের দিকে যায়, তারা ধীর। তখন অর্থ কামকে ছাপিয়ে শ্রেয় দেখা দেয়। **হীয়তে অর্থাৎ** এখানে অর্থ মানে goal বা লক্ষ্য, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। প্রেয়ের লক্ষ্য আশু তৃপ্তি। শ্রেয়ের অর্থ বা লক্ষ্য পরমার্থ, প্রেয়ের ঊর্ধ্বে উঠে যাওয়া। তখন মানুষ আত্মচেতনা লাভ করে, আত্মশক্তির অনুভব পায়। একটা সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রবৃত্তিই **মুখ্য**। কিন্তু প্রবৃত্তিতে তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়। মানুষ self-conscious আত্মসচেতন। প্রাকৃত ভোগেও যদি

আত্মসচেতন হই তাহলে ভোগকে প্রশাসন করবার শক্তি পাই। তখন ধীরে ধীরে, ভোগের দ্বারাও শ্রেয়কে পেতে পারি। 'কালেন আত্মনি বিন্দতি'। এরা ধীর, যারা শ্রেয়কে বরণ করে। শ্রেয়কে বরণ করে সে সাধু হয়, সিদ্ধ হয়, তার কল্যাণ হয়। আর প্রেয়কে যে বরণ করে 'হীয়তে' ক্রমে ছোট হয়, অবসাদগ্রস্ত হয়।

সংসারচক্র, ভবচক্র ঘুরতেই থাকে। অহোরাত্র সূর্যের উদয়-অস্তের মতন সে-চক্রের আবর্তন। তার উর্ধ্বে যে গেল সে মুক্ত—'অহোরাত্রবিদ্'। সাধন জীবনেও ওঠা-নামা চলে। প্রেয়ের সংস্কার থেকে যায়, তারই আবর্তন চলতে থাকে। অহোরাত্রের পারে উঠলে সূর্যলোক। এটা কোনো নির্দিষ্ট স্থান নয়, সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া, বিবিক্ত হওয়া। গুণ-বৈতৃষ্ণ্য, পরবৈরাগ্যকে লক্ষ করে এখানে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। এটা শূন্যতার সাধনা। গোড়া থেকেই সবকিছুকে শূন্য করতে হয়। এটা কোনো ক্লিষ্ট সাধনা নয়। এটাকে সহজভাবে করতে পারি। কারো সঙ্গে যদি জড়িয়ে না থাকি তাহলে এটা সহজ হয়। বৌদ্ধেরা এটাকে 'স্মৃতি-উপস্থান', স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখা বা সমপ্রজ্ঞতা বলতো। উপনিষদে এটাকে সমনস্কতা বলে। সোজা কথায় রামকৃষ্ণদেব বলতেন, হুঁসে থাকা। আসক্তিকে যদি শিথিল করে দিতে পারি তাহলে ক্রমশ চেতনা অন্তর্মুখ হয়, আর এটাই আত্মবোধে রূপান্তরিত হয়।

সাধন জগতে একটা বিপদ দেখা দেয়। যেমন ভাবের সাধনাতে দেখা যায়। বৈষ্ণবরা একটা জায়গায় বড় ভুল করেন। অবশ্য এটা দার্শনিকতার ভুল—নির্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্মকে তাঁরা দূরে সরিয়ে রাখতে চান। বৈষ্ণব সাধনাতেও প্রথমে শান্ত ভাবের কথা বলা হয়েছে। এখানে বিবেক কথাতেও একই জিনিষ। ভাগবতেও বলা হয়েছে, যে সমস্ত মুনি আত্মারাম, যাঁরা নিজের মাঝে নিজে নন্দিত, যাঁরা নির্গ্রন্থি তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে হরিকে ভজন করেন। ভাগবতের এই শ্লোকে দ্বন্দ্বের সমাধান পাই। সিদ্ধির প্রথম ধাপ মৌন-নির্গ্রন্থি। আর এ হওয়া সত্ত্বেও প্রেম জাগে। ভালবাসার সাধনা করতে হলে প্রথম শান্ত হতে হবে। নাহলে ভাবের উদ্বেলতা আসে আর সাধনা পণ্ড হয়।

ভাবের তর্পণ করতে ভাল লাগে, সে প্রেয়। এটা কিন্তু শ্রেয় নয়। যেটা চাই সেটা আঁকড়ে রাখি এটা বিবেকের পথ নয়। সমস্ত সাধনায় বিবেকজ্ঞান রাখতে হবে। সূর্যের মাঝে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আর তাকে অতিক্রম করে যাওয়া, এ দুটির মূল হচ্ছে বিবেক। বিবেক যদি না থাকে, ইতিভাব বন্ধনকারক হয়। নচিকেতার দ্বিতীয় বর চরম নয়, সেটাকেও ছাপিয়ে যেতে হবে। যখন সত্যিকার বিবেকজ্ঞান হয় তখন ভগবানকে নিয়েও বিলাস করা চলে না। পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হয়। রিক্ত হলে সেটা হয়। আমি সম্ভোগ করব না আমি সম্ভুক্ত হব। আমি কিছু চাইব না এই ভাবের পরে যে উল্লাস জাগে, সেটা সত্যিকার সৌর চেতনা।

হিরণ্যপুরুষ তাকেই বলা হয়েছে। তার দুটি রূপ। তার একটা রূপ শুক্লভাসম্পন্ন আর একটি রূপ পরকৃষ্ণ অন্ধকার। সূর্যের দিকে তাকালে প্রথম একটা শুভ্রতা দেখতে পাই, পারার মতন যেন টলমল করছে। তার মাঝে ডুবে গেলে, তার ওপারে একটা গভীর অন্ধকার দেখতে পাই। পুরাণে এই ভাব নারায়ণ এবং লক্ষ্মী এবং কৃষ্ণ আর রাধার রূপে পরিণত হয়েছে। লক্ষ্মী শ্রী আলো। আকাশের শ্রী সূর্যমণ্ডল যেখানে জমাট বাঁধল, নারায়ণের দেহে তা কৌস্তুভমণি তাঁর আত্মশক্তিই শ্রী—সমস্ত ইতিভাবনার সম্পুট,

সমাহার। অন্য দিকে নারায়ণ তিনি পরম নেতি, পরম অন্ধকার। এটাতে বৈষম্য কিছুই নাই, সমস্ত একসূত্রে গাঁথা। স্বর্গলাভ এবং স্বর্গকে ছাপিয়ে যাওয়া দুটোরই বর্ণনা করা হয়েছে, তাই প্রথমে বিবেক ভাবের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। শূন্যতা প্রাপ্তির চরম, কিন্তু এটাকে গোড়াতেও আনতে হবে।

৩।। নচিকেতা যখন দ্বিতীয় বর লাভ করেছিল, তার সঙ্গে যম একটা সৃঙ্কা উপহার দিয়েছিলেন। শৃঙ্খল শব্দের সঙ্গে এর একটা সম্বন্ধ আছে। সৌর চেতনার সঙ্গে সঙ্গে বিভূতি আসে। তার প্রলোভনে যদি পড়ি তাহলে ঊর্ধ্ব থেকে নেমে যেতে পারি। এটাই ইতিভাবনার ভয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ভয় সত্য হয়। সিদ্ধপুরুষেরও বিভ্রম হয়। তাদের ভিতরে পরম বৈরাগ্য—নেতিভাবনা প্রবল হয় না তাই বিভূতি তাদের প্রলুব্ধ করে। কিন্তু যদি সূর্যের ওপারে চলে যাই তাহলে সমস্ত সূর্যগ্রহণ করলেও তাতে প্রলুব্ধ হব না। দেবতারা অমৃতলোভী ছিলেন, কিন্তু শিবের কাছে বিষ ও অমৃত দুটোই সমান ছিল। আমাদেরও মরণ ও জীবন দুটোকেই নিতে হবে।

জীবনে প্রলোভন আসে, আসক্তি আসে, সেগুলোকে বিত্তময়ী সৃঙ্কা বলা হয়েছে। আমরা সবসময় কিছু পেতে চাই আর যা পেয়েছি তাকে আঁকড়ে রাখতে চাই। আমাদের ভিতর যে সত্ত্বগুণের স্ফুরণ হয় তাকে যদি বেছে নিতে পারি তাহলে অনাবিল হতে পারি। কিন্তু আমাদের যেতে হবে সত্ত্বগুণের ওপারে।

গৌড়পাদ সাধককে চারটি বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান থাকতে বলেছেন। একটা কষায়-বর্জন। আসক্তির সূক্ষ্ম সংস্কারকে কষায় বলে। তাকে বর্জন করতে হবে। দ্বিতীয় বিক্ষেপ-বর্জন। চিত্তের চঞ্চলতার জন্য যে বিক্ষেপ আসে তার বর্জন। তৃতীয় লয়-বর্জন। চিত্ত লয় হয় কিন্তু প্রাপ্তি হয়নি। তখন একটা আচ্ছন্নতা আসে। ঘুমের ভাব আসে, এটাকে দূর করতে হয়। জেগে থাকতে হয়, সচেতন থাকতে হয়। চতুর্থ—রসাস্বাদ ছাড়তে হবে। আমার যেটা ভাল লেগেছে, তাকেও আঁকড়ে ধরব না।

এই শ্লোকে যম নচিকেতাকে বলছেন বিবেক তোমার মাঝে স্বভাবসিদ্ধ। তাই তোমাকে প্রিয়রূপ বা প্রিয়কাম কোনো জিনিষ লুব্ধ করল না। যেখানে মানুষ ডুবে যায়, সেই বিত্তময়ী সৃঙ্কা তোমাকে লুব্ধ করেনি।

৪।। প্রেয় ও শ্রেয়—এরাই এখানে অবিদ্যা ও বিদ্যা। অবিদ্যা হচ্ছে যাকে সম্পূর্ণ রূপে জানি না। মোহ হচ্ছে যেটা অবলম্বন করে অবিদ্যা থাকে। বিদ্যা যদি থাকে কামনা থাকে না; সমস্ত কিছুর প্রশান্তি হয়ে যায়। প্রশান্তি থেকে প্রসাদ জাগে, সেখান থেকে সত্যিকার আত্মতর্পণ হয়। ভাললাগা চাইতে নেই, সেটা আপনি আসে। রিক্ততার মাঝে যে প্রসন্নতা জাগে, তাতে আনন্দের একটা দিক খুলে যায়। রিক্ত হওয়াতেই লাভ বেশি। ব্যাসদেব মহাভারতের একটি জায়গায় বলেছেন তৃষ্ণার পরিতৃপ্তিতে আমরা যে আনন্দ পাই তার চেয়ে তৃষ্ণা ত্যাগের আনন্দ অনেকগুণ বেশি।

যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্।।

নচিকেতার মাঝে সেই বিদ্যার অভীপ্সা জেগেছে। আমরা সবাই সাধক; কিন্তু কেউ প্রৌঢ় বাজশ্রবস, কেউ কিশোর নচিকেতা। প্রৌঢ় নিজেকে ঠকায় কিন্তু কিশোর তত্ত্বজ্ঞানের দিকে চলে যেতে পারে। নচিকেতার মতো যে সাধক, সে প্রথম থেকেই চাঁদের আলোর

মতো কলায় কলায় বেড়ে চলে। তাদের প্রথম থেকেই বৈরাগ্য, রিক্ততার ভাবনা সহজ। অবিদ্যা থেকে সুরু করে আমরা বিদ্যার দিকে যাই। যখন বিদ্যার অভীপ্সা জাগে তখন 'সকল' (নিষ্কলের বিপরীত) চেতনাকে অতিক্রম করতে পারে। অবিদ্যা আর বিদ্যা বিপরীত, আলো আর অন্ধকারের মতন। আলোর দিক উত্তরায়ণ—বিদ্যার দিক। অবিদ্যার দিক দক্ষিণায়ন,—অন্ধকারের দিক। উত্তরে দেবতার চৈতন্যের প্রকাশ; দক্ষিণে যম, চৈতন্যের আবরণ।

নচিকতোর মাঝে বিদ্যার প্রকাশ জেগেছে তাই সে বিচলিত হচ্ছে না। সৌর চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হলেও সম্পূর্ণরূপে অবিদ্যা যায় না। তাই তাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তার বাইরে চলে যেতে হয়। প্রথম শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা, পরে শ্রীকৃষ্ণের মাথুর। এটি বিপ্রলম্ভ। তাতে জাগল রাধার বিরহ। বৃন্দাবনলীলা ইতি ভাবের চরম। তার মাঝেও মাঝে মাঝে বিপ্রলম্ভ দেখা দিচ্ছিল, কিন্তু শেষে শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে চলে গেলেন। তখন রাধা পরকৃষ্ণের মাঝে শুক্লভা দেখছে। মহাপ্রভুর জীবনেও আমরা এটা দেখতে পাই। ইতিতে পাওয়া শুধু নয়, নেতিতে গিয়ে আবার সেখানে ইতিকে পাওয়া। রূপগোস্বামী তাঁর গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাসের অনেক বর্ণনার শেষে বলেছেন—'ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে' বিপ্রলম্ভ না থাকলে সম্ভোগের পুষ্টি হয় না। মৃত্যুর কোলে জীবন—শিবের কোলে পার্বতী—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'। কৃষ্ণপ্রেম তপ্ত ইক্ষুচর্বণের মতো। ইক্ষু যদি তপ্ত থাকে তাহলে মুখ পুড়ে যায়। তবু চর্বণ ছাড়তে ইচ্ছা হয় না। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জীবনে এটা দেখা যায়। তাঁর গম্ভীরাতে পুড়ে যাওয়া (বিরহতাপ-দগ্ধ হওয়া) এরই লক্ষণ। কামনাকে অতিক্রম করেই দিব্য কামনা পেতে পারি। তার জন্য শূন্য, মৃত্যুর ভূমিকায় থাকতে হবে। নচিকেতার চেতনার সঙ্গে গোপীচেতনার তুলনা করা যেতে পারে। যে perfect জীব, psychic being, তার কিশোর চেতনা, তার ভাবে নেতি-ইতি, বিপ্রলম্ভ-সম্ভোগ একসঙ্গে থাকে, এটাই দিব্যভাব।

৫।। অবিদ্যার অবস্থার বর্ণনা। যাদের ভিতরে অবিদ্যা তারা মনে করে তারা সব পেয়ে গিয়েছে। বিদ্যা পেয়ে গিয়েছে। বস্তুত তারা মূঢ়, কেবল পাক খাচ্ছে, সোজা রাস্তায় চলছে না। তাদের অহঙ্কার যায় না। তারা পরকে উপদেশ দিতে যায়, কিন্তু তারা একই ভূমিতে পাক খাচ্ছে। এই সমস্ত মোহ খুব উঁচু স্তরেও থেকে যায়। এটা মৃত্যুর মাঝেই থাকা। তাকে অতিক্রম করা হয়নি। শেষে সে চেতনা অবসন্ন হয়ে যায়। এদের সব সময় আলো থাকে না, স্থির জ্যোতি থাকে না, আলো আসে ঝলকে ঝলকে।

৬।। যারা মূঢ়, তারা বাল, তারা হল বোকা। তারা মনে করে এ লোক আছে। এর ওপরে কিছু নেই। তারা সাম্পরায় দেখতে পায় না। প্রাকৃত জীবনে এবং সাধনজীবনেও তাই ঘটে। অবিদ্যা সহজে যায় না। সিদ্ধ চেতনাতেও অবিদ্যা থাকে। তখনই শুম্ভ-নিশুম্ভের মতো অবস্থা হয়। শুম্ভ ও শুভ্র একই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুর, অথচ শিবের মতো, দেবতুল্য। কিন্তু কোথাও না কোথাও তাদের অবিদ্যা রয়েছে। তারা স্বর্গকে অধিকার করে ঠিক দেবতাদের মতনই স্বর্গরাজ্য চালাচ্ছে। কিন্তু পরিপূর্ণ রিক্ততা তাদের আসেনি, তাই মহাশক্তি তাদের কামনার বস্তু হল। মহাশক্তিকে তারা কান্তারূপে চেয়েছিল। যখন শুম্ভ বধ হল তার আগে দেবীকে নিয়ে শুম্ভ মহাশূন্যে উঠে গেল। দেবীকে সে জড়িয়ে ধরল। তাকে হৃদয়ের পাশে পেয়েও চিনতে পারছে না। অহং রয়ে যায়, অবিদ্যা রয়ে যায়।

মহাশক্তির সংস্পর্শ পেয়েও সে সংস্পর্শ কার্যকরী হয় না। শেষে মহাশক্তি তাকে নিহত করেন।

বেদেও এই ভাবের কথা অন্যরূপে আছে। অসুরদের তিনটি পুরী ছিল। পৃথিবীতে লোহার পুরী, দেবতারা তাকে ভেঙে দিলেন। অন্তরিক্ষে রজতপুরী, দেবতারা তাকেও ভেঙে দিলেন। আর দ্যুলোকে হিরণ্যপুরী, সোনার পুরী, হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। এখানে অবিদ্যার শেষ অধিকার। দেবতারা তাকেও ভেঙে দিলেন। পুরাণে তাই শিবকে 'ত্রিপুরারি' বলা হয়েছে। দেহ-প্রাণ-মনই তিনটি পুরী। মন পর্যন্ত অবিদ্যা রয়েছে। যদি শিবের মত হতে পারি, চেতনাকে যদি আকাশবৎ করতে পারি, তাহলে এ অবিদ্যাকে অতিক্রম করতে পারি। দ্যুলোকের উপরে চতুর্থলোক আছে সেটাই স্বর্লোক। এটা তুরীয় বা তুরীয়চেতনা। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি ও তুরীয়। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক ও স্বর্লোক। স্বর্লোকই শিবের চেতনা, সেখানে যদি পৌঁছাই তাহলে কামনা থাকে না, পতন হয় না।

মহাশূন্যের পথ **সাম্পরায়**। এটা তৃতীয় পথ। **পিতৃযান** আমাদের প্রাকৃত জীবন, যেখানে একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে। মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র, তাই পিতৃযানের অধিষ্ঠাতা চন্দ্র। **দেবযান** আলোর পথ। সূর্য মধ্যগগনে যখন পূর্ণমণ্ডল, সেই সূর্যের পথে চলাই দেবযান। সিদ্ধচেতনা এর উপান্ত ভূমি পর্যন্ত যেতে পারে। তার পরের পথ হচ্ছে সাম্পরায়—বৌদ্ধেরা বলতেন মহাযান। মহাশূন্যের পথ। অন্ধকারের, রিক্ততার পথ। বালের কাছে মূঢ়ের কাছে সে পথ প্রতিভাত হয় না।

৭।। এটা গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের রহস্য। এই তত্ত্ব মহাশূন্যতার পথ, সাম্পরায়ের পথ। মূঢ়ের কাছে প্রতিভাত হয় না। অনেকে তার সম্বন্ধে শুনতেই পায় না। আর অনেকে শুনলেও ঠিক বুঝতে পারে না। অনেকে তার নিন্দা করে, তাকে প্রত্যাখ্যানও করে। ইতিভাবের সাধনা যারা করে, রসাস্বাদের আকাঙক্ষা যাদের আছে, তারা নেতিভাবকে ডরায়। গৌড়পাদ বলেছিলেন তারা 'অভয়ে ভয়দর্শিনঃ'। তার উপদেশ পেতে পারি যদি শিষ্য আর গুরু যোগ্য থাকে। এই শ্লোকে **বক্তা** গুরু, **লব্ধা** শিষ্য। **জ্ঞাতা** আচার্য, **অনুশিষ্ট** শিষ্য। ব্রহ্মের স্বরূপকে গুরু অনুভব করেন দুটি ভাব দিয়ে। প্রথম আশ্চর্য। এটা আধ্যাত্মিক সাধনার সম্পদ। বিস্ময় রসকে আদিরস বলে। বিস্ময়রস আসে যখন অসীমের সামনে সীমাবদ্ধ দাঁড়ায়। মহিমার বিভূতি যখন উন্মুক্ত হতে থাকে, তখন সীমার চেতনার মাঝে জাগে আশ্চর্য! আশ্চর্য বক্তা বা গুরু যম, পরম দর্শন তার চেতনাকে আপ্লুত করেছে; তাকে বলবার সে চেষ্টা করছে। আর কুশল হচ্ছে শিষ্য, নচিকেতা, যে কুশলতাপূর্বক তা' জেনে নিচ্ছে। মহাশূন্যে সাধনা চলছে। দক্ষিণামূর্তি গুরু, নিঃসঙ্গ। উপদেশের রীতি মৌন। বুদ্ধদেব উপায়কৌশল বলতেন। কিভাবে দিচ্ছেন আর কিভাবে নিচ্ছেন? বলা যেতে পারে, বক্তা আশ্চর্য হয়ে দিচ্ছেন আর শিষ্য কুশল হয়ে গ্রহণ করছেন।

আশ্চর্য ভাবনা, লোকোত্তর চেতনা যখন লৌকিক চেতনায় প্রবেশ করে, সেও আশ্চর্যকারী হয়। এটা বোধিচেতনা, হৃদয় দিয়ে পাওয়া। 'হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তঃ।' এই ভাবনা তখন সমস্ত আধারে সংক্রামিত হয়, তখন শুধু অস্তিতার বোধ থাকে। এই উপনিষদেই বলা হয়েছে, 'অস্তি ইত্যেব উপলব্ধব্যঃ'। পাপপুণ্য, ভালমন্দ, কিছুই নেই, কোনও উপাধি নেই শুধু সন্মাত্র, অস্তিতামাত্র Real reality থাকে। সে ক্রমশঃ প্রসন্ন, transparent হয়। এটা সহজ সাধনা। কবীরের ভিতরে আমরা এটা দেখতে পাই। আঁখ ন

মুদোঁ, কান ন রূঁধো সহজ সমাধ ভলী।' অষ্টাবক্র এই ভাবকে বলেছেন 'যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ'। এই অস্তিত্বের Symbol হচ্ছে 'ওম্'। ওমের অর্থ হাঁ, তুমি আছ। 'অস্তি', আছেন, এই ভাব। এর ফলে আসে প্রসন্নতা, তারপরে প্রসন্নতার মাঝে আসে নানারকম বিভূতি জ্ঞান, আনন্দ, প্রেম সমস্ত আপনা থেকে সহজে ফোটে।

৮।। এই তত্ত্ব অত্যন্ত সূক্ষ্ম। শূন্যতার উপদেশ। নিজেকে যদি ছেড়ে দিই তাহলে না থাকার মাঝে থাকা আসে। ছেড়ে দেওয়ার পর কেউ এসে যেন তোমাকে পাইয়ে দেয়। এটাই গুরুবাদের রহস্য। শিবই একমাত্র গুরু। শিব ছাড়া জ্ঞান হয় না। প্রেম হয় না। দক্ষিণামূর্তি গুরু হওয়া চাই। কিন্তু অনেকে আছে যারা শুম্ভনিশুম্ভের মতো গুরু। তারাও গুরু কার্য করত, যজ্ঞ ভাগের বিধান দিত। এরকম গুরু দিয়ে কাজ হয় না। গুরু ছাড়া কিছুই হয় না, একথা একদিকে ঠিক। শিবগুরু ছাড়া কিছু হয় না। মৃত্যু, যম, শূন্যতাই গুরু। **ন অবরেণ প্রোক্তঃ** যে শিব নয় রিক্ত নয়, সে বললে হয় না। গুরুশক্তি অবর হলে চলে না। বরগুরু হওয়া চাই সদগুরু হওয়া চাই। সে গুরু শূন্যতা, সে যম, সে রিক্ত। অবর গুরু শুম্ভ নিশুম্ভের মতো।

পরম শূন্যতা বহুচিন্তা করলেও পাওয়া যায় না। যে-কেউ যদি বলে তাহলে তুমি পথ পাবে না। যে বলবে তাকে হতে হবে যম, শিব, মৃত্যু; কেননা এ তত্ত্ব **অণীয়ান্**, সূক্ষ্ম, পরমাণুর মতো, তর্ক-বুদ্ধির অতীত। যম **অতর্ক্য, অণুবৎ**।' বৈষ্ণব দর্শনে জীবাত্মাকে অণু বলা হতো। অণুদর্শনই আত্মদর্শন। চেতনাকে অন্তর্মুখী করে একটা বিন্দুতে লয় করে দেওয়া। বিন্দুচেতনাই অণু। এ জন্য অণুর কথা বারবার বলা হয়েছে। এটাই জীবসত্তা। বৈষ্ণবরা বলতেন তিনি অংশী, জীব অংশ। তাঁকে গুটিয়ে পেতে পারি, ছড়িয়ে গিয়েও পেতে পারি, তাই তাঁকে অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ বলা হতো। যাঁরা 'অণোরণীয়ান্' মানতেন তাঁরা মুনি। 'মহতো মহীয়ান্' মানতেন যাঁরা, তাঁরা ঋষি। এটা মুনি-উপনিষদ। তাই এখানে অণুতে গুটিয়ে যেতে হয়।

৯।। আগের শ্লোকের অনুবৃত্তি। নাস্তির তত্ত্ব তর্ক দিয়ে, মন দিয়ে জানা যায় না। অথচ সে জানার জন্য কারো একটা অপেক্ষা থাকে, তিনি হলেন আচার্য বা গুরু। আমায় আচার্য কি দিয়ে জানিয়ে দেবেন সেটা কোনো ভাষা দিয়ে বোঝানো যায় না। আশ্চর্য ও কৌশল দুটোরই দরকার পড়ে। যিনি উপদেশ দেবেন তিনি আশ্চর্য হয়েছেন, যে গ্রহণ করে সে কুশলী হয়ে গ্রহণ করে। কৌশল হল মনের ওপারে যে বোধি জাগে। তাকে বলে প্রজ্ঞান বা বিজ্ঞান। নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।।২৪ জ্ঞানের সমস্ত অভিমান ছেড়ে দিয়ে তাকে শ্বাস প্রশ্বাসের মতন গ্রহণ করা। চলাফেরাতে সহজ হতে হবে। কোথাও wrong movement হবে না। বাহিরে ভিতরে শান্তি প্রশান্তি ধ্যানচিত্ততা থাকবে। একটা কিছু পেতে চাইছি সে ভাব আসবে না। কোনো ব্যাকুলতা থাকবে না। বস্তুকে শ্রদ্ধার দ্বারা জানছি, সে আপনিই আমার ভিতরে আবিষ্ট হচ্ছে, ঊষার আলোর মতন। এটা প্রজ্ঞান, এটা কৌশল। এ প্রজ্ঞান আচার্যতে থাকবে, ঠিক এইরকম শিষ্যের মধ্যেও সে প্রজ্ঞানের ভাব থাকবে। আর থাকবে আশ্চর্যের বোধ। যদি মন্যসে সুবেদেতি দ্রভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্''—(কেনোপনিষদ), যদি মনে কর তুমি জেনেছ তাহলে কিছুই জাননি। সে জানা-অজানার বাইরে। সকল জানা ফুরিয়ে যায় অথচ জানি। রামকৃষ্ণদেব বলতেন বোধে বোধ হয়। মন দিয়ে জানা যায় না,

এটাই আশ্চর্য। এভাব আচার্য থেকে শিষ্যে সংক্রামিত হয়। এটা Communication এর ধারা। তর্কের গতি মন পর্যন্ত। মন বলে যা বুঝি, সেটা দার্শনিকদের ভাবনার ফল। গীতাতে মনকে ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলা হয়েছে। Sense mind-এর বাইরে যদি মনের কল্পনা করি তাহলে এই **মতিকে** পাব। সংহিতা উপনিষদে মন elastic term। শ্রীঅরবিন্দ আধুনিক যুগে তাকে ব্যবহার করেছেন। তাই তিনি Higher mind, Illumined mind, Intuitive mind, Overmind, Supermind ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'মনো বৈ যজমানঃ' 'মনো বৈ ব্রহ্ম', 'মনো বৈ অনন্তম্, 'মনো বৈ দৈবং চক্ষুঃ' ইত্যাদি সংহিতা উপনিষদে রয়েছে। এ মনকে spiritual mind অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই থেকে মতি-মন্ত্র-মনন-সুমতি ইত্যাদি শব্দ হয়েছে। প্রাকৃত মনের ওপর আলো পড়লে মন তার আজ্ঞাধীন হয়, বিধেয় মন ক্রমে তার প্রসাদ পায়। এই মনোজাত সম্পদকে 'মতি' বলে। মন শান্ত রয়েছে, হঠাৎ সে তার উৎসকে খুঁজে পেল, পদ্মের মতন তখন সে ফুটে ওঠে। মন যেন ভরে যায়। তখন সে হয় মতি। সে মতিতে দেবতার সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগ স্থাপিত হয়। তাঁকে এই ভাবে ইন্দ্রিয় দিয়ে, দেহ দিয়ে পাওয়া যায়। নচিকেতাকে যম বলছে তুমি মতি পেয়ে গেছ। তোমার মন ভরে গেছে। তুমি হয়েছ **সত্যধৃতি** পরম সত্যকে ধারণ করবার ক্ষমতা পেয়েছ।

এই কথা অষ্টাবক্র অন্যভাবে বলেছেন। যেখানে যেখানে মন যাচ্ছে, সেখানে সেখানে সমাধি। বুদ্ধদেব চিত্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন। চিত্তের ধর্ম পরম বিশ্রাম লাভ করা। বিষয়ে মন যে চঞ্চল হয় তার অর্থ সে তার নিজের স্বভাবে ফিরে যেতে চায়। বিত্তকে যখন বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করি, তখন সে তার স্বরূপকে পায় না বলে ছটফট করে। মাছকে যখন ডাঙায় তোলে তার মত অবস্থা হয়। সে আবার জলে ফিরে যেতে চায়। পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গ সাধনের মাঝে যে প্রত্যাহার রয়েছে তার পিছনে এইভাব রয়েছে। সংস্পর্শজনিত আনন্দকে যদি কেউ অনুভব করে তবে সে আনন্দের মনেও চিত্তের প্রশান্তিকে সে পায়। যেমন যখন গান শুনতে যাই তখন যদি শুধু গান শুনি তাহলে তর্ক দিয়ে পাওয়ার মতন শুধু intellectual আনন্দ পাব। কিন্তু তাতে মতি পাওয়া যায় না। কিন্তু যদি কোনো সহজ সুরের পরিপূর্ণ দরদ দিয়ে গাওয়া গান শুনি তাহলে তাতে চিত্ত লীন হয়ে যায়। তখন যে আনন্দ পাব সেটা প্রত্যাহার। চিত্তসত্ত্বকে বৈদিকরা মতি বলতেন। যখন তন্ময় হই তখন বাইরের গান, অন্তরের আনন্দ, পরম তত্ত্ব সব একাকার হয়ে যায়। মন সমাহিত হয়।

আমরা বিষয় দেখে তার দিকে ছুটে যাই, তাকে পেতে চাই, একে যদি analysis বিশ্লেষণ করি তা হলে যেমন Bergson বলেছেন যখন শুধু intellectual Perception হয়, মন দিয়ে বুঝি। তখন মনে হয় যেন একটা জিনিষের চারিদিকে ঘুরছি কিন্তু তাকে ঠিক জানছি না। যখন এ চেষ্টাকে ছেড়ে দিই তখন তার সঙ্গে identity-র ভাব, তন্ময়তা আসে। তখন ভিতর দিয়ে সেই বস্তুকে দেখি এটা মতি বা intuition।

প্রথম পরম তত্ত্বের জন্য শ্রদ্ধা। বিবেক হবে, তার চেয়ে বড় শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা থেকে আভাস পাওয়া যায়। তখন বুদ্ধিকে স্তম্ভিত করে দেখা দেয় আলো ফোটার ভাব। বাইরে যেরকম আলো ফুটছে তেমন ভেতরেও আলো ফোটে। তখন আশ্চর্য ভাব আসে। এই সূর্যোদয়.... সূর্য আত্মা.... আত্মারূপে প্রাপ্তি হচ্ছে। হৃদয়াকাশ প্রভাস্বর হয়ে উঠছে। শ্রদ্ধা নিয়ে চিত্তের যে অবস্থা পাই সেটা মতি। এই মতি যখন প্রবলা হয় তখন সে হয় প্রজ্ঞান। ঋষিরা এর প্রেরণা পেতেন আকাশ থেকে, সূর্য-তারা থেকে, পর্বত থেকে, নদী থেকে,

পৃথিবী—যে বিস্তীর্ণ হয়ে রয়েছে—তার থেকে। চারিদিকে বৃহতের পরিমণ্ডল, আকাশ হয়ে বায়ু হয়ে রয়েছে। 'বায়ো ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি' সর্বব্যাপী বোধের ভিতরে নিজের বোধকে নিমজ্জিত করা। যা আছে তাকেই উপলব্ধি করতে হবে। এটাই technique এটাই কৌশল।

শ্রেষ্ঠ প্রিয়তম। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন ভক্ত চার প্রকারের, আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু আর জ্ঞানী। সবাইকার থেকে জ্ঞানী ভক্ত শ্রেষ্ঠ। তাকে আমি নিজের মতো ভাবি।

ছান্দোগ্যে গুরুকে 'অমানব পুরুষ' বলা হয়েছে। অমানব পুরুষই সত্য। না হলে গুরুশিষ্যের সম্পর্কে মালিন্য ঘটে। যম বলছে, সেই মতিকে তুমি পেয়েছ, তুমি সত্যধৃতি হয়েছ। বত আহা, appreciation। তোমার মতন প্রষ্ঠা আর হবে না, যার ভিতরে আমার সব ঢেলে দিতে পারি।

১০।। এই শ্লোক সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেউ বলেন এই উক্তি নচিকেতার। আমার মনে হয়, এটা যমের উক্তি। যম সম্বন্ধে একটা ইতিহাস আছে শতপথ ব্রাহ্মণে। যম মানুষ ছিলেন 'যমৌ বৈ মনুষ্যঃ', যিনি প্রথম মরেছেন। এর mystic meaning রহস্যার্থ আছে। মৃত্যুর মূলে 'মৃ' ধাতু। তার একটা অর্থ জড় হয়ে যাওয়া, যেমন 'মৃ' থেকে মৃত্তিকা। আরেকটা অর্থ আলোয় ঝলমল করে ওঠা। মরুৎ বা মর্মর (marble) এই অর্থ থেকে এসেছে।

প্রাকৃত মৃত্যু আমাকে জড় করে দেয়। আমার দেহ জড় হয়ে যায়। এখানে 'মৃ' ধাতুর অর্থ মৃত্তিকা। কিন্তু যখন আমরা বিজ্ঞান ভূমি বা যোগ ভূমিতে উত্তীর্ণ হই তখন মৃত্যু যেন একটা জ্যোতিঃ-সত্তাকে লাভ করে। হৃদয়ের প্রদ্যোত জ্বলে ওঠে। তখন অন্ধকার আসে না, আসে আলো। যোগী মৃত্যুসময়ে যাকে পায় সে যম। সে ইহলোক আর পরলোকের সেতু। ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে 'পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজঃ'—এখানে যোগীর মৃত্যুর বর্ণনা আছে। সে আদিত্যমণ্ডলের মাঝে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। একর্ষি-চেতনা-যে চিত্তকে আকর্ষণ করছে। আরেকটা 'প্রাজাপত্য সূর্য'; যেখানে চেতনা projected হচ্ছে। তার মাঝখানে 'যম'। যমের dual বা দ্বৈত ভূমিকা, একদিকে সঙ্কর্ষণ অন্যদিকে বিচ্ছুরণ। সে-শক্তিকে স্থাপন করা হয় ভ্রূমধ্যে। শিবের ডমরুর মতন যেন সেখান থেকে একটা ত্রিকোণ উপরের দিকে চলে গেছে, আর একটা ত্রিকোণ হৃদয়ের দিকে এসেছে। ভ্রূমধ্যে চেতনা বিন্দুবৎ হয়। হৃদয় থেকে আরম্ভ করে ভ্রূমধ্যের ওপারে মহাশূন্য পর্যন্ত যেন একটা multiplication sign, X এর মতন। একটা overhead consciousness, মূর্ধন্যচেতনা, আর একটা হৃদয়ে পরিব্যাপ্ত। দুই এর সেতু যম। এটা জীবনেও পেতে পারি আর মৃত্যুকালে যদি চেতনা থাকে তাহলে এইভাবে মরতে পারি। 'যমো বৈ মনুষ্যাণাং প্রথমো মমার'। যোগী মৃত্যুর সময়ে বিষ্ণুর পরমপদ পায়। যমশক্তি মৃত্যুশক্তিরূপে জগতে ছড়িয়ে রয়েছে। তার অন্যদিকে অমৃতের সাধনা চলছে। এটাই immortality-র side, তাই যম বৈবস্বত, বিবস্বানের পুত্র। পরম জ্যোতি যখন ব্যষ্টিচেতনায় স্থির হয় তখন ভ্রূমধ্যে স্থির হয়। এই মৃত্যুশক্তি সমস্ত জীবের মাঝে বিচরণ করে। কী করে নাচিকেত অগ্নি দিয়ে লোকোত্তীর্ণ হওয়া যায়—অনিত্যকে দিয়ে নিত্যকে প্রাপ্ত হওয়া যায় সেটা আগের বরে বলা হয়েছে। অগ্নিরহস্য দ্বারা universal consciousness, বিশ্বাত্মক চেতনাকে সৌরসত্তাকে

লাভ করা। এটাই অনিত্যকে দিয়ে নিত্যের প্রাপ্তি।

শেবধিঃ এটা প্রাচীন শব্দ। ঋগ্‌বেদে অনেক জায়গায় ব্যবহার হয়েছে। পরে তার ব্যবহার কমে গেছে। যেমন জলধি, পয়োধি, তেমনি শেবধি। নিঘণ্টুতে অর্থ রয়েছে ধন বা সম্পদ। কিন্তু নিরুক্ত দিয়ে এই শব্দের বিশ্লেষণ করলে তার mystic অর্থ, রহস্যার্থ বেরোবে। 'শেবঃ' হচ্ছে শিবের প্রাচীন রূপ। দেবতাকে 'সুশেব' বলা হতো। তার অর্থ সমুজ্জ্বল, সুকল্যাণ যিনি শয়ান—তিনি শিব। প্রশান্তি, নিস্পন্দতা। এই 'শেব' যাতে নিহিত রয়েছে সে শেবধিঃ'। যে কোনো ভোগের বস্তুকে শেবধি বলা যেতে পারে। সে বস্তু যখন পাই তখন সম্ভোগের অন্তে একটা প্রশান্তি আসবেই, কিন্তু আমরা সে প্রশান্তিতে চিত্তকে স্থির করি না। পাবার ফলে যে তৃপ্তি আসে সে প্রশান্তিরই ভাব। আমরা আস্বাদনের প্রতি মন দিই, বিরামের প্রতি মন দিই না। সে প্রশান্তিতে যদি চিত্তকে সমাহিত করতে পারি তাহলে ভোগ দিয়েও সাধনা চলতে পারে। নিত্যতা আসত যদি সকলের শেষে প্রশান্তি আসত।

এটাকে সাংখ্য দিয়ে বোঝানো যায়। প্রকৃতির চাঞ্চল্য হচ্ছে বৈচিত্র্য। ভোগের জীবন সেটাও বিচিত্র। কিন্তু ভোগের পর যে উপশম আসে সেটাকে জীব গ্রহণ করতে পারে না। শিব তাকে ধরতে পারে। প্রকৃতি শিবে লয় হয়ে যায়। ভোগের বস্তু শেবধি। সে ভিতরে ভিতরে শিবকে বহন করছে।

এই শেবধিকে প্রাকৃত চেতনা অনিত্য বলে বোঝে। সে অনিত্যকে দিয়ে নিত্যকে পাওয়া যায় না। কিন্তু যদি ভোগের অবসানে শিবকে দেখতাম তাহলে ভোগ দ্বারাও তাকে পেতে পারতাম। তার জন্য অগ্নিচয়ন করতে হয়, আহুতি দিতে হয়।

বন এক অর্থে কাঠ, অরণ্য, আর এক অর্থে to desire, to try, to win এই desire প্রত্যেকের মাঝে রয়েছে। অগ্নি বনস্পতি, বন, কাঠের পতি, কামনা পতি। সমস্ত কামনা যখন এক জায়গায় সংহত হয় তখন আগুন জ্বলে। 'বনস্' থেকে Venus, গ্রীকদের সৌন্দর্যদেবতা। কামনাগুলিকে সংহত করলে জ্বালান হয় নাচিকেতাগ্নি। অনিত্য ভোগ যদি সংহত হয় তখন সেখানে সুশেবধি দেবতাকে দেখতে পারি। তাহলে অনিত্য দিয়েও নিত্যকে পাওয়া যায়। 'তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথাঃ।' আমাদের মাঝেই সিদ্ধের জ্ঞান লুকান আছে। 'আহার কর মনে কর আহুতি দিই শ্যামা মাকে।'

যম বলছেন আমি জানি শেবধি অনিত্য। অধ্রুবকে দিয়ে ধ্রুবকে পাওয়া যায় না। সেজন্য আমি নাচিকেতাগ্নি জ্বালিয়েছি। তখন অনিত্য বস্তুকে দিয়ে নিত্য বস্তুকে পেয়েছি।

উপনিষদে দ্বিতীয় বর ও তৃতীয় বরের মাঝে একটা বিরোধাভাস দেখা যায়। দ্বিতীয় বরে সৌরচেতনা আর তৃতীয় বরে লোকোত্তর চেতনা। কিন্তু তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে যে তিনটি বরের কথা বলা হয়েছে সেগুলিকে antagonistic রূপে পরস্পরবিরোধীরূপে বর্ণনা করা হয়নি। দ্বিতীয় বরে যজ্ঞদ্বারা যেটা পাচ্ছে সেটাও নিত্য, লোকোত্তর চেতনা। আর তৃতীয় বরে নচিকেতা চাচ্ছে কি করে পুনমৃত্যুকে জয় করতে পারবে। তখন যম বলছেন, 'য এবং বেদ'। নাচিকেত-অগ্নির রহস্য যদি তুমি জান তাহলে তুমি পুনর্মৃত্যুকে জয় করতে পারবে। যজ্ঞ বৃথা নয়। প্রথম থেকে সে পরম চেতনার দিকে আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। যজ্ঞ আর জ্ঞানের ভিতরে পরে বিরোধ দেখা দিয়েছে। শঙ্করাচার্য জ্ঞানবাদী ছিলেন তিনি জ্ঞানকর্মের অসমুচ্চয়কে বিশেষভাবে প্রচার করেছেন। এই বিরোধ উপনিষদে একটু দেখা যায়, কিন্তু

ব্রাহ্মণ সংহিতায় একেবারে নেই। জ্ঞান-কর্মের অসমুচ্চয় এটা অবৈদিক ভাবনা, বৌদ্ধ ভাবনা। সাংখ্যরা দেবতাকে যজ্ঞকে স্বীকার করতেন না। তাঁদের ভাব বৈদিকদের ভিতরেও ঢুকেছে। এ বৌদ্ধ ভাবনা যখন ব্রাহ্মণদের প্রভাবিত করল তখন এলেন শঙ্করাচার্য। সেজন্য তাঁর ভিতরে জ্ঞান কর্মের অসমুচ্চয় বিশেষভাবে দেখা দিল। অদেব অযজ্ঞ, এগুলি অবৈদিক ধারা। এই উপনিষদে এই বিরোধের কথা একটু দেখা যায়। অনিত্যকে দিয়ে নিত্যকে পেয়েছি, এর ব্যাখ্যা করতে শঙ্করাচার্যকে মুস্কিলে পড়তে হয়েছিল, এজন্য তিনি একটা 'অ'কারকে বাদ দিয়ে বলেছেন, নিত্য দ্বারাই নিত্যকে পাওয়া যায়। কিন্তু এটা কষ্টকর ব্যাখ্যা আর ব্রাহ্মণের বিরোধী।

১১।। সৌরচেতনা লাভের ফলগুলি বলা হয়েছে। কিন্তু সেখানেও ভোগতৃষ্ণা থেকে যেতে পারে। যদি আত্মতৃপ্তির জন্য ব্যবহার করি তাহলে পতন হবে। তাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। জ্ঞান যদি না হয় তাহলে পুরুষার্থ বিপদ ঘটাতে পারে। প্রজ্ঞাদৃষ্টি যদি না খোলে তাহলে ঐশ্বর্য পতন ঘটাতে পারে।

এমন একটা ভূমিতে উঠি, যেখানে যা ইচ্ছা করি, তাই পাওয়া যায় কিন্তু সেখানে বিবিক্ত হতে হয়। সৌরচেতনা crisis এর জায়গা, সংকটের ভূমি। সমস্ত জগত্ সেখানে প্রতিষ্ঠিত। Life's root জীবনের মূল। সেটি হল **জগতঃ প্রতিষ্ঠা** তার অন্যদিকে জীবনকে ছাপিয়ে অতিষ্ঠা, Transcendent।

ক্রতু সিসৃক্ষা, সৌরচেতনা dynamism। সেখানে ফোটে power, will to create শক্তি, সিসৃক্ষা। সে **অনন্ত**। তারও ভূমি পেয়েছে। প্রজাপতি হওয়ার ক্ষমতা পেয়েছে।

অভয়স্য পারম্। যাকে মানুষ ডরায়, জরা মৃত্যু, ব্যাধি, সবার উপরে তুমি গিয়েছ। সেখানেই তুমি আশ্রয় নাওনি, নিরাশ্রয় হয়ে রয়েছে, নিরালম্ব।

স্তোম praise, স্তুতি, অভিনন্দন, সমস্ত পৃথিবী নন্দিত হয়। পার্থিব চেতনা সিদ্ধ চেতনাকে বরণ করে respond করে। তুমি **প্রতিষ্ঠাকে** লাভ করেছ, কিন্তু সেখানে পৌঁছে তারও ওপারে যেতে চেয়েছ।

বিসৃষ্টি ও **অতিসৃষ্টি**। বিসৃষ্টি হচ্ছে নীচের দিকের ধারা। 'কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ'। অতিসৃষ্টি হচ্ছে বিন্দু থেকে উপরের দিকে উঠে যাওয়া। অতি সৃষ্টি এখানে বারবার ব্যবহার করা হচ্ছে। নচিকেতার ভিতরে তার জন্য ভাব জেগেছে।

১২।। একটা যজ্ঞ আছে সেটাকে 'পৌর্ণমাস' যজ্ঞ বলে। চেতনা তখন পূর্ণিমার চাঁদের মত ফুটে ওঠে। আর একটা যজ্ঞ আছে তাকে 'দর্শ' যজ্ঞ বলে। অমাবস্যার মাঝে লয় হওয়া। অমাবস্যা হয় যখন চন্দ্র সূর্যের সহাবস্থান হয়। তখন মন রূপ চন্দ্র লয় হয়ে যায়।

দেবী পূজার সময়ে তিনটি পক্ষ আসে। পিতৃপক্ষ, দেবীপক্ষ, প্রেতপক্ষ। পিতৃপক্ষের সাধনা মনুষ্য লোকের সাধনা। দেবীপক্ষের সাধনা দেবলোকের সাধনা। আর প্রেতপক্ষের সাধনা লোকোত্তরের সাধনা।

লক্ষ্মীপূজা পৌর্ণমাস যজ্ঞ। সেটা পূর্ণতার পূজা। তারপর আসে শ্যামাপূজা। জৈনেরা এবং বৌদ্ধেরা তাকে প্রজ্ঞার পূজা বলত। যারা প্রলয়ের পথ ধরেছে, এটা তাদের পূজা। এটা শূন্যতার পথ।

নচিকেতার তিনটি বরে তিনটি পথের কথা আছে। প্রথম বরে মনুষ্যলোকের কথা, সে মনুষ্যলোকে ফিরে যাবে, পিতৃদের কাছে যাবে; এটা পিতৃপক্ষ। নচিকেতার প্রথম বর

পিতৃযান। দ্বিতীয়বরে দৈব চেতনা লাভ করা, সৌর চেতনা লাভ করা। এটা দেবীপক্ষ দেবযান। তৃতীয়বরে লোকোত্তরের সাধনা 'যেয়ম্ প্রেতে', এটা প্রেতপক্ষ, সাম্পরায়, মহাপ্রয়াণ, মহাযান।

চেতনা যখন লয় হয় এখন একটি সূর্য নয়, অনন্ত সূর্য জেগে ওঠে। বারুণী রাত্রি। সেটা থেকে দীপান্বিতা হয়েছে। তাই অমাবস্যার দিনে দীপান্বিতা। প্রতিষ্ঠার পর অতিষ্ঠা।

যখন সূর্য বিষুবে থাকে তখন দিনরাত সমান। উত্তরায়ণের সময় যখন সূর্য কর্কটের দিকে আসে তখন দিন বাড়ে, রাত্রি ছোট হয়। আর যখন মকরের দিকে যায় তখন দিনগুলি ছোট হয়, রাত বাড়ে। যারা রাত্রে সাধনা করে তাদের অন্ধকারের সাধনা। তখন চারিদিকে অন্ধকার থাকে, সে Transcendence এ তুরীয় ভূমিতে আলোকে জাগাতে হয়। যারা ঋতুপর্যায়ের সাধনা করে তারা উত্তরায়ণের সময় দিনের সাধনা করে, দক্ষিণায়ণের সময় রাত্রির সাধনা করে।

যে দেবতা **অধ্যাত্মযোগাধিগম্য** তাঁকে হৃদয়বেদির কেন্দ্রে nucleus এ গুটিয়ে আনতে হয়। **গুহাহিত** গুহাতে নিহিত। গুহার ভিতরে যে অন্ধকার থাকে তাকে আবিষ্কার করতে হয়। তিনি 'পরঃ কৃষ্ণ, 'শুক্ল ভার ওপারে।

গহ্বরেষ্ঠম্। এটা অনুভব হয় যখন depth এর অতল গভীরের দিকে যায়। সূর্যের দিকে অভিযান যখন শুরু হয় তখন চেতনা বিস্ফারিত হয়, কিন্তু যদি সূর্যের nucleus এ কেন্দ্রবিন্দুতে যাই তাহলে মনে হয় চেতনা যেন ডুবছে, যেন অন্ধকারের মাঝে অন্ধকার। নাসদীয় সূক্তে আছে, 'তম আসীৎ তমসা গূঢ়ম্।' Astronomically জ্যোতির্বিদ্যায় যাকে dark nebulae বলে, abysmal depth। অতল গভীরতা। এই পরম অন্ধকার থেকে উৎসাহিত যে আলো, সেখানে যাওয়া।

গুহাকে শঙ্করাচার্য বুদ্ধিগুহা বলেছেন। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। যাজ্ঞবল্ক্য একটা উপমা দিয়ে মৈত্রেয়ীকে বলেছেন, একটা ঢাক যখন পেটা যায় তখন তার শব্দকে ধরা যায় না, কিন্তু যদি ঢাককে নেওয়া যায় তাহলে শব্দকে ধরতে পারি। ঢাকের ভিতরে শূন্যে শব্দ পাওয়া যায়। ভিতরে vibration জমাট হয়, তাই বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। 'নৈব সংজ্ঞা, নৈব অসংজ্ঞা।' এটাকে বুদ্ধি বলা যেতে পারে না। অসংজ্ঞা বলতে পারি। অন্ধকারই সচেতন হতে পারে। এটাই গুহা, গুহার depth, গভীরতা। খুব tired ক্লান্ত হওয়ার পর যখন ঘুমাই তখন ঘুমের মাঝে যেন মনে হয় জেগে তলিয়ে যাচ্ছি। এটা নিরুদ্ধশক্তির একটা জমাট ভাব। 'গহ্বরেষ্ঠম্' শব্দের ভিতরে একটা tunnel এর সুড়ঙ্গের ভাব রয়েছে; যেন অন্ধকারের গভীরে চলে যাচ্ছি। তিনি **পুরাণম্** অনন্তকাল ধরে ছিলেন। পুরাণের একটি ব্যাখ্যা আছে, যে পুরাতন ছিল সেই আবার নতুন হয়ে আসছে। অসম্ভূতির দিক যেন নিত্য নবীন হয়ে ফুটছে।

এ তত্ত্বকে যে জানে সে **ধীর** হয়। **হর্ষশোক** কে পার করে যায়। আলোর মতো ফুটে ওঠে। অন্ধকারই আলো হয়ে গেল। সেটাই **দুর্দর্শ**।

১৩।। আগের শ্লোকে লোকোত্তর সম্বন্ধে পরিপূর্ণ বিবৃতি দেওয়া হল। পূর্ণজ্ঞান বিদ্যুতের ঝলকের মতো একবার ফুটে ওঠে; সেটা আবার মিলিয়ে যায়, তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আবার সাধনা শুরু হয়। তার জন্য আমাদের অন্তরের গভীরে ডুবতে হয়। শুধু বাইরে থেকে অন্তরে যাওয়া মাত্র নয়, অন্তরের গভীরে তলিয়ে যাওয়া।

এতৎ শ্রুত্বা ভেতরে তলিয়ে গেলে 'শ্রবণ' আসে। মর্ত্য-চেতনা লোকোত্তরের খবর পায়। এই শোনা অমানব পুরুষ থেকে শোনা। মহাশূন্য যেন নেমে আসছে। **সম্পরিগ্রহ**—সে মহাশূন্য চারিদিক থেকে যেন তাকে বেষ্টন করে আছে। সে তত্ত্বকে সম্যক্‌রূপে আপন করে নেওয়া। প্রথম শ্রবণ, পরে সম্পরিগ্রহণ।

সে মহাশূন্যকে বলা হয়েছে **ধর্ম্য**। ধর্মাৎ অনপেতম্'—ধর্ম্যম্। ধর্ম হচ্ছে সমস্তসত্তার মূলে যে পরম সত্তা, যে সব কিছুকে ধরে আছে। কখন বলা হয়েছে সূর্যই ধর্ম। আবার কখন সূর্যের ওপারে যে শূন্য রয়েছে তাই ধর্ম। যেমন মিত্রের ধর্ম তেমনি বরুণের ধর্ম। পুরাণে যমকে বলা হতো ধর্মরাজ। পাপ পুণ্য, ভালমন্দের বিচারক। **অণুরেষ ধর্মঃ** এখানে সেই শূন্যতাকেই লক্ষ করা হয়েছে। ধর্মের এই অর্থকেই বৈনাশিক বৌদ্ধেরা গ্রহণ করেছেন। তথতাকে তাঁরা বুদ্ধের ধর্মকায় বলতেন। ধর্মচক্র প্রবর্তন হচ্ছে এই শূন্যতাকেই চালু করে দেওয়া। ধর্ম—যম—মৃত্যু—বাইরে থেকে অন্ধকার কিন্তু ভিতরে আলো, হৃদয়ের প্রদ্যোৎ। এই সত্যাণুধর্মকে **প্রবৃহ্য** প্রবৃহণ বা প্রবর্হণ করতে হবে। অন্যত্র আছে, কুশের ভেতর থেকে যেমন একটা শিষ বের করা হয় তেমনি সে পরম সত্তাকে দেহাদি কোষ থেকে বের করে ছড়িয়ে দিতে হয়। সহজ ভাষায়, গভীরে ডুবে যে শূন্যতাকে পেয়েছি তাকে অনুভব করা, সেখানে একটা বিন্দুতে চিত্তকে লয় করা। তারপর এই অণুত্ব সর্বত্র ব্যাপ্ত হবে। দেহ শূন্যতার দ্বারা পূর্ণ হবে। সত্য বা সে শূন্যতা দেহকে ছাপিয়ে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হবে। শুধু অন্তরে ডুবে যাওয়াই নয়, সে শূন্যতা দিয়ে দেহকে ছাপিয়ে পূর্ণ শূন্যে পৌছান। 'সর্বম্ শূন্যম্'। এটা 'সর্বম্ খল্বিদম্ ব্রহ্ম' এর উল্টো দিক। একটা নেতির দিক, একটা ইতির দিক। ভিতরে যা রয়েছে তাকে পরিব্যাপ্ত করা। একটা পরিব্যাপ্তির দিক, আর তার corresponding movement সহচারী স্পন্দন যে সূক্ষ্মতম তত্ত্ব; তাকে পেতে হবে। **'অণুম্‌এতম্ আপ্য'**। শূন্যতার বোধ ইতি ভাবনার বিরোধী opposite। বিন্দু চেতনা থেকে বিস্ফারণ। একদিকে অণুভাবনা একদিকে প্রবর্হণ।

কুণ্ডলিনী সাধনাতে এই ভাব রয়েছে। প্রথম দেহকোষ, দেহভাব, দেশ-জ্ঞানকে অবলম্বন করে দেহকে শূন্যবৎ করা হতো। সে শূন্যে ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে মেরুদণ্ড দিয়ে মূলাধার পর্যন্ত একটা পথ, মৃণালের মতো একটা নাল বা rod, চলে গিয়েছে। তার ভিতরে আবার ডুবতে হয়। প্রথম নাল rod হচ্ছে সুষুম্না নাড়ী। তার ভিতরে বজ্রিণী, তারও ভিতরে চিত্রিণী, আর শেষে ব্রহ্মনাড়ী বা ব্রহ্মরন্ধ্র। প্রথম সুষুম্না নাড়ী বাইরের কোষে। এটা পদ্মের মৃণালের মতো। তার শুভ্র জ্যোতি। বেদে একে দেবযান বলা হতো। উপনিষদে হিতা নাড়ী। এটিকে অবলম্বন করে সমস্ত প্রাণ উর্ধ্বস্রোতা হয়। সেটা সূর্যমণ্ডল পর্যন্ত চলে যায়। দ্যুলোক থেকে পৃথিবী পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। পরম চেতনার সঙ্গে তার যোগাযোগ রয়েছে। এই সুষুম্নার ভিতরে একটা গ্রন্থি ভেদ করে নাভিচক্রে উপস্থিত হয়। সেখান থেকে উপরের দিকে আর একটা fine course, সূক্ষ্ম ধারা বা নাড়ী রয়েছে। সুষুম্নার অনুভব হচ্ছে সুখময় রসচেতনার অনুভব। এর ভিতরে যে নাড়ী সেটাতে ওজঃ শক্তির অনুভব হয়। তখন বজ্রিণী দিয়ে উর্ধ্বস্রোতা হয়। ভিতরে তাপ সঞ্চারিত হয়, আর সমস্ত চৈতন্যকে হৃদয় পর্যন্ত তুলে দেয়। সেখান থেকে তার ভিতরে আর একটা নাড়ী পাওয়া যায়, সেটা চিত্রিণী। সেখানে সূক্ষ্মভাবনা চিন্ময় স্রোতে রূপান্তরিত হয়, আর সে চেতনাকে ভ্রূমধ্য পর্যন্ত ঠেলে দেয়। তারপর আরো সূক্ষ্মতর রন্ধ্র আছে, এখান থেকে শূন্যতা পাওয়া যায়। দেহ প্রাণমন সমস্ত

ফাঁকা হয়ে যায়। ভিতরে সমস্তটা শূন্যতায় পৌঁছয়। আমরা সর্বব্যাপী হই। আজ্ঞাচক্র থেকে সহস্রদল পদ্ম দিয়ে মহাশূন্য পর্যন্ত ব্রহ্মনাড়ী। সেখানে পরিব্যাপ্তি আসে। কঠোপনিষদে নাড়ীর বর্ণনা আছে, তার ভাবনাকে অবলম্বন করে হঠযোগীরা এইসব আবিষ্কার করেছিলেন। সমস্ত কিছু ফাঁকা হয়ে যাওয়া—এটাই প্রবর্হণ। যে ধর্ম, শূন্যতাকে আশ্রয় করে যা পেয়েছি, সে মহাশূন্য; সে ধর্মতত্ত্বকে প্রথম অনুরূপে পেয়ে তাকে 'প্রবৃহ্য' করতে হয়, ছড়িয়ে দিতে হয়। আত্মচৈতন্যকে ব্যাপ্ত করলে যেমন মুক্তি আসে তেমনি আবার আত্মচৈতন্যকে সংহত করেও মুক্তি পাওয়া যায়।

ব্রহ্মরন্ধ্র একটা সূক্ষ্মধারা, পদ্মনালের মতো। সূক্ষ্মেও পৌঁছই আবার বিরাটকেও পাই। যুগপৎ দুটোরই অনুভব। 'অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্।' সমস্তকে সমরস অনুভব করা এটা বন্দ্মভাবনা। এক বিন্দুতে সমস্তকে গুটিয়ে আনা এটা অণুভাবনা। একদিকে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম আর একদিকে 'প্রবৃহ্য' পরিব্যাপ্তি।

এ যখন পাওয়া যায়, তখন আনন্দ পাওয়া যায়। **মোদনীয়ম্**। আনন্দ দিয়ে সমস্ত পরিব্যাপ্ত হয়।

বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসম্ মন্যে। যম নচিকেতার রূপান্তর দেখতে পাচ্ছেন। নচিকেতাকে মনে হচ্ছে যেন একটা **সদ্ম**, মন্দিরের মতো। তার আধার সমস্ত **বিবৃত**,—ফাঁকা। তার অণু পরমাণু উন্মুক্ত, খোলা। তার মাঝ থেকে সূক্ষ্মতর তত্ত্ব সমস্তই বিকীর্ণ হচ্ছে। দেহভাবনা কখনো কখনো একেবারে থাকে না। যদিও একটু থাকে, শূন্যতার ভাব তার মাঝে প্রবল থাকে, শূন্য-চেতনা তার মাঝে ফুটে ওঠে, তার থেকে শূন্য ভাবনা বিকীর্ণ হয়। সাধারণত মানুষের চেতনা বাঁধা থাকে, প্রথম অন্নময় কোষে, এটা স্থূল কোষ। তার চেয়ে সূক্ষ্মতর প্রাণময় কোষ, তার ভিতরে মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, আনন্দময় কোষ। এই পঞ্চ কোষের মাঝে আমাদের আত্মা যেন বাঁধা রয়েছে। যে সে আত্মাকে পায়, তার এই কোষগুলি ফাঁকা হয়ে যায়। এটাই বিবৃত সদ্ম। যমের দেখাতে নচিকেতার ভিতরে তার অনুকরণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, এটা শাম্ভবী দীক্ষা।

গুহাহিত একটা তত্ত্ব। সে গহ্বরেষ্ঠ। একদিকে চেতনার সঙ্কর্ষণ করছে, ভিতর থেকে শূন্যের দিকে টানছে। যখন সেখানে পৌঁছচ্ছে চেতনা অণু তত্ত্বে পৌঁছচ্ছে, তখন বাইরের কোষগুলি ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে আমরা এটা দেখতে পাই। একটা solid body নিরেট বস্তু তার মাঝে অনেক ফাঁক রয়েছে, যা আমরা দেখতে পাই না। এটা স্পঞ্জের sponge-এর মতো। তার molecule অণুগুলিকে যদি একত্রিত করি তাহলে আমরা দেখব যে সব matter পদার্থ একটা pinhead বিন্দুশীর্ষে এর উপর ধরা যায়, আর সব ফাঁকা, যেন মহাশূন্যে পরিব্যাপ্ত। জড় সমস্ত matter কে যদি একত্রিত করা যায় তাহলে মহাশূন্যের খুব ছোট একটা অংশ হবে। এটাকেই বলা হয়েছে, ব্রহ্ম চতুষ্পাদ, তার একপাদে সমস্ত বিশ্ব, আর ত্রিপাদে মহাশূন্য। ব্রহ্মরন্ধ্রে পৌঁছলে সমস্ত ফাঁকা হয়ে যায়। নচিকেতাকে এইরকম বিবৃতসদ্ম, ফাঁকা ঘরের মত মনে হচ্ছে যার মাঝে রয়েছে অণু, ধর্ম, শূন্যতা।

১৪।। এটি নচিকেতার উক্তি। এখনও পূর্ণজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আভাসে সমস্ত বস্তুকে পেয়ে গিয়েছে, কিন্তু সে কি, সেটা এখনও ঠিকভাবে জানা হয়নি। তাই নচিকেতা যমকে জিজ্ঞাসা করছে 'তুমি কি দেখছ? যা দেখছ তা আমাকে বল।' নচিকেতার মাঝে যে গূঢ়তম তত্ত্ব রয়েছে তার সম্বন্ধে নচিকেতা প্রশ্ন করছে। সে তত্ত্ব নচিকেতার খানিকটা জানা,

খানিকটা অজানা।

সেটা ধর্মও নয়, অধর্মও নয়। সেটা কৃত থেকে অন্য, অকৃত থেকে অন্য। ভূত থেকে অন্য, ভব্য থেকে অন্য। দুর্দর্শ তত্ত্ব এটা। Logic যুক্তি বা বিচার দিয়ে তাকে পাওয়া যায় না। সমস্ত দ্বন্দ্বের অতীত, তাকে জানতে হলে দ্বৈতের উর্ধ্বে উঠতে হয়। এটা শূন্যতার স্বরূপ।

যা সমস্ত কিছুকে ধারণ করে রয়েছে তাই **ধর্ম**, সমস্তের substance। ধর্মকে অবলম্বন করে বিভূতিগুলি ফুটে ওঠে। তারা ধর্মের বিপরীত মেরু opposite pole, **অধর্ম**, ফাঁকার ভিতরে পূর্ণতা। যেটা পূর্ণ সেটা অধর্ম। ভিতরে ফাঁকা সে ধর্ম। সে-বস্তু ধর্ম আর অধর্মে ওপারে। ভাব, অভাব, সৎ বা অসৎ, কোনো কিছু দিয়েই তাকে বলা যায় না। নাসদীয় সূক্তে আছে—'নাসদাসীৎ নোসদাসীৎ'। সত্ ধর্ম, অসত্ ধর্মের বিপরীত। সে দুটোও নয়, তাহলে কী? সত-অসতের অতীত। পরে মায়া সম্বন্ধে একথা ব্যবহার করা হয়েছে। 'ভাবাভাববিবর্জিত'। বৌদ্ধেরা 'চতুষ্কোটি বিনির্মুক্তম্' বলতেন। কোনো একটা জিনিষকে আমরা চার ভাবে প্রকাশ করতে পারি, কিন্তু কোনো ভাবই এখানে খাটে না। হয়তো সে সৎ, বা অসৎ, বা এদুটোকে মিলিয়ে আছে। আছে আর নাই। সৎ, অসৎ। না অসৎ, না সৎ। নাই, আবার আছে। চারিটার কোনটা দিয়ে তাকে বর্ণনা করা যায় না। সে অনুপাখ্য, নিরুপাখ্য।

এ ধর্ম পরে রূপে বা ক্রিয়াতে অভিব্যক্ত হয়। তখন আর একটা দ্বৈতের সৃষ্টি হয়। **কৃত** আর **অকৃত**। ঈশোপনিষদে তাকে বলা হয়েছে সম্ভূতি আর অসম্ভূতি। যা হয়েছে আর যা হয়নি। যতটুকু পেয়েছি তার চারিদিকে একটা অনন্তের পরিমণ্ডল রয়েছে। যা ভাব রূপে পেয়েছি তাকে ঘিরে রয়েছে অসীমের বিস্তার। যা হয়েছে তার তিনগুণ হয় নাই। আমরা যদি অকৃতকে ধরে নিই আর যদি ভাবতে পারি তার থেকে কৃত আসছে সেটা হবে সম্যক্‌দৃষ্টি। আমরা পরম দেবতার ভাবনাকে নামে, রূপে, বস্তুতে দেখি। কিন্তু তাতে চিত্তকে আবিষ্ট রাখলে চলবে না। এটা একটা অবলম্বন, আশ্রয় মাত্র। তার ওপারে যেতে হবে। সেখানে যে আছে সে অগম, অথচ আছে। বোধি দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে তাকে অনুভব করতে পারি। শ্রদ্ধাতে যত আবিষ্ট হব তত তার নামরূপ শিথিল হবে আর নামরূপের অতীত যে ভাব তা উৎপন্ন হবে। আর আমরা দেখব সেটা থেকে আবার নামরূপ বেরিয়ে আসছে। গীতাতে বলা হয়েছে 'বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ অতীন্দ্রিয়ম্'। ভাব অতীন্দ্রিয় বোধি দিয়ে পাওয়া যায়। বোধ থেকে রূপকে উৎসারিত দেখতে হয়। যেমন সূর্যজ্যোতিকে দেখতে পাই শূন্যে—শূন্য যেন বিদ্যুতের ঝলক। শূন্য থেকে সমস্ত কিছু আসছে, এই ভাবনাতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। প্রথম উত্তার, সেখান থেকে অবতার।

নচিকেতা অনুভব করছে সে কৃত নয়, অকৃতও নয়। তাকে grasp করা, ধরা যায় না, অথচ grasp এর ধরা ছোঁওয়ার বাইরে, সেটাও বলা যায় না।

ভূত যা হয়েছে। তার থেকেও অনেকখানি, যা হয়নি, **ভব্য** unborn। উপলব্ধির মাঝে এসেছে সেটা ভূত, আর ইন্দ্রিয় প্রাণ মন যাকে ধারণা করতে পারছে না, আর কিছু আছে যাকে আমরা পেতে পারছি না, সেটা ভব্য। তার চাপ যখন আসে তখন আধার ভেঙে যায়; জড়বৎ, উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ হয়ে যায়। এই ভূতভব্যকে দিয়ে সে বস্তুকে ধরা যায় না। এটাই আশ্চর্য দর্শন। তারই বিবৃতি। পরম তত্ত্বকে যখন সাক্ষাৎকার করি, তখন

একদিকে সীমাকে পরিপূর্ণ দেখি, তার উপরে অসীম উদ্যত হয়ে থাকে। শুধু এ কি! এ কি? বলা যায়। জ্ঞাতা আশ্চর্য। যমের আশ্চর্য ভাবনা নচিকেতার ভিতরে আবিষ্ট হচ্ছে।

১৫।। এটা যমের উত্তর। এর mystic অর্থ রহস্যার্থ রয়েছে। সমস্ত চেতনা বিস্মিত হয়ে রয়েছে। এটা ক্ষেত্র। এইভাবে শিষ্য, অন্তেবাসী যখন তৈরি হয় তখন এই শিষ্যের মাঝে গুরু ইষ্টের দর্শন করেন। আর গুরু বলেন 'তুমি কি, জান না, কিন্তু আমি জানি।' এই সময়ে বীজ নিক্ষিপ্ত করা হয়। এটাকে concrete, বাস্তব, মূর্ত করে বলব **ওম্ ইত্যেতত্‌**। আমাদের শাস্ত্রে কতকগুলি pronoun, সর্বনাম রয়েছে যারা বিশেষ ভাবকে সঙ্কেত করে। ইদম্, তৎ, এতৎ। 'ইদম্' বাইরের জগৎ, কৃত, অধর্ম, ভূত এসব যা কিছু। এটা থেকে ইদন্তা। শৈব দর্শনে জগৎকে বোঝাতে এটির বহুল ব্যবহার করা হয়েছে। এটা অহন্তা আর একটা ইদন্তা। অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান যা কিছু; objective world। **তৎ** যা লোকোত্তর, ইদমের ওপারে। যখন অনির্বচনীয় ভাবে ব্রহ্মকে বোঝাতে হয় তখন বলি তৎ। ঋগ্‌বেদে আছে 'তদেকম্'। উপনিষদে আছে 'তদেব ব্রহ্ম, ত্বং বিদ্ধি।' ব্রহ্মকে জানবে 'তৎ' বলে, 'ন ইদম্' ইদম্ বলে নয়। এষঃ বা **এতৎ**, অর্থাৎ এই আমার মাঝে, আধারের মাঝে। ইদম্ জগৎ, এষ আত্মা, তদ্ ব্রহ্ম।

'এতৎ' এই যে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। সেজন্য যম 'এতৎ' বলছেন। নচিকেতার হৃদয়ে মহাশূন্যের একটা nucleus কেন্দ্রবিন্দু রয়েছে। সেটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন তাই 'এতৎ'। সেটা **ওম্**, ওঙ্কারকেই তোমার মাঝে দেখছি। এটা নচিকেতার মাঝে বীজ নিক্ষেপ। নচিকেতার দীক্ষা। দীক্ষার ধারা হচ্ছে প্রথমে তত্ত্বের উপদেশ, দ্বিতীয়তঃ যমশক্তির আবেশ, যাতে নচিকেতার মাঝে আশ্চর্যবোধের একটা বিহ্বলতা এল। এই বিহ্বল অবস্থায় একটা পদ, মন্ত্র নিক্ষিপ্ত করা হল। এটা সংক্রামিত হবে। এটা শক্তি সঞ্চারের ধারা। এক বুদ্ধিগম্য, দুই হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট, আর তৃতীয় যখন বিবৃতসদ্মে বিস্ময়ের আবির্ভাব তখন বীজ নিক্ষেপ। এটা শাম্ভবী দীক্ষা। যে বীজ, **সেই পদ**। যে স্থান তুমি উপলব্ধি করবে, যে তোমার লক্ষ্য, যেখানে 'পদ্যতে' যেখানে পৌঁছবে, সেটাকে অক্ষরে যদি গুটিয়ে আনতে পারি তাহলে সেটাও পদ হবে। ওম্, একটি অক্ষর, syllable, আর একদিকে যেখানে পৌঁছাব, সেই বস্তু স্থান। একাধারে যুগপৎ বাচ্য ও বাচক। দুইই এক। সমস্ত উপনিষদে এই 'ওম্' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। মাণ্ডূক্য উপনিষদে তার সম্বন্ধে খুব clear পরিষ্কার করে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। এটা মন্ত্র সাধনা। **সংগ্রহেণ ব্রব্রীমি** সংক্ষেপে বলছি। পদ একটা living word জীবন্ত শব্দ। সে চিন্ময়। যে উত্তম অধিকারী সে গ্রহণ করামাত্র তার জ্ঞান হবে। কিন্তু এই বস্তু পাওয়ার জন্য মধ্যম এবং অধম অধিকারীকে সাধনা করতে হবে।

নচিকেতার আধার কিশোর চেতনা। তার ভিতরটা তৈরি ছিল। তাকে এইসব সাধনা কিছুই করতে হয়নি। কিন্তু যারা মধ্যম বা অধম অধিকারী, তাদের জ্ঞান হবার আগে সেই উত্তম অধিকারীর অবস্থায় পৌঁছতে হবে। তার জন্য তিনটি পথ, তিন প্রকারের সাধনা এখানে দেওয়া হয়েছে। এক বেদাধ্যয়ন, পতঞ্জলি যাকে বলেছেন স্বাধ্যায়। আমরা বলতে পারি শাস্ত্রপাঠ, মন্ত্রজপ, সবই তার অন্তর্ভুক্ত। সমস্ত পর্যবসিত হয় ওঙ্কারে। এটা ক্রিয়াবাদীদের, যাজ্ঞিকদের পথ। দুই, তপস্যা। এটা আর একটা ধারা। এটি থেকে মুনিপন্থার উদ্ভব। পরে এরা বৈদিকধারা থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। ইন্দ্রিয়, প্রাণ ইত্যাদিকে সংহত করে ভিতরে তাপ সঞ্চার করা, সে তাপে সবই প্রতপ্ত হবে, রূপান্তরিত হবে। তিন, ব্রহ্মচর্য,

ব্রহ্মবিহার। বৃহতের আলো নিয়ে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করা।

তপস্যার ধারাকে আত্মশুদ্ধির দিকে প্রয়োগ করতে পারি। তপস্যাকে ভিত্তি বা base করে স্বাধ্যায়ে ভাবনার ধারাকে উদ্দীপ্ত করা হয়। শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারী প্রথম sense control, ইন্দ্রিয়সংযম অর্থাৎ তপস্যা করতো। তারপর বিদ্যা দেওয়া হতো। তার মীমাংসা আর মনন করা হতো। শেষে বিশুদ্ধ বোধ নিয়ে সর্বত্র নিজেকে পরিব্যাপ্ত করা, সেটা ব্রহ্মবিহার। আগেকার কালে যখন অন্তেবাসী সমিৎপাণি হয়ে আচার্যের কাছে জ্ঞানলাভের জন্য যেত তখন তাকে শুধু বলা হতো 'বস ব্রহ্মচর্যম্'। কিছু সময়ের জন্য তাকে কোনো উপদেশ দেওয়া হতো না, শুধু বৃহতের ভাবনা নিয়ে চলাফেরা করা, সে ভাবকে নিজের ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া, শুধু সেই spirit কে imbibe করতে, ভাবে জারিত হতে বলা হতো। এটাকে আমরা তিনভাবে করি, যখন কোনো আশ্রমে যাই, বা সৎসঙ্গ করি। এটা যেন মনকে মুক্তি দেওয়া, পরিব্যাপ্ত করা। এগুলি সাধনপন্থা। তারপর যখন আধার তৈরি হয়, তখন বীজপ্রক্ষেপ।

১৬-১৭।। 'ওম্' সম্পর্কে দুটি বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে। **অক্ষর** আর **আলম্বন**। অক্ষর উত্তম অধিকারীর জন্য। অন্যান্য অধিকারীর জন্য প্রথম আলম্বন, তারপর অক্ষর। উত্তর অধিকারীর জন্য প্রথম অক্ষর, তারপর তাকে বজায় রাখবার জন্য আলম্বন। ওঙ্কারকে আলম্বন করলে তা জপ-স্বাধ্যায়ের অন্তর্গত। যদি তাকে অক্ষর মনে করি তাহলে সে নিরালম্ব। অক্ষর যা ক্ষরিত হয় না। জগতের সমস্ত কিছু ক্ষরধর্মী। তার অতীত যে শূন্যতা, চেতনার পরিব্যাপ্তি, সে নিরুপাধিক, সে অক্ষর। গীতাতে বলা হয়েছে 'অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্'। বৈখরী-বাক্‌রূপে 'ওম্'কে আলম্বন রূপে দেওয়া হয়, মন্ত্র বা স্পন্দরূপে। সে মন্ত্রকে অবলম্বন করে শূন্যে ফিরে যাওয়া। শূন্যের স্পন্দ, অক্ষরের স্পন্দ, সেই 'ওম্'। অক্ষরের দুটি অর্থ। একটি যার ক্ষরণ নেই, immutable। অন্য অর্থ syllable বা মন্ত্র। যখন 'ওম্' মন্ত্রকে অবলম্বন করে অর্থভাবনা করি তখন সেই নিত্য অপরিণামী অক্ষর রূপে সাধনা করি। আবার যখন জপভাবনা করি তখন মন্ত্র রূপে syllable রূপে সাধনা করি। পতঞ্জলির যোগসূত্রে আছে, 'ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ বা'। সেই ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করছেন—তিনি হচ্ছেন আমারই চেতনার বিশুদ্ধ রূপ। যার কর্ম নাই, যার ক্লেশ নাই, বিপাক নাই, আশয়-সংস্কার নাই। তিনি শুদ্ধ আত্মচৈতন্য। 'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। তজ্জপঃ তদর্থাবনম্।' ওঙ্কার যদি আলম্বন হয়, তাহলে জপ বিধেয়। ওম্-কে যদি অক্ষররূপে অনুভব করি তাহলে জপ আপনা থেকে হয়। যখন জপ আপনা থেকে হয় তখন অজপা হই। রবীন্দ্রনাথের একটা গানে আছে—সকল মম দেহ মন বীণা সম বাজে, মহারাজ একি সাজে এলে হৃদয়পুর মাঝে। ইষ্টকে 'ওম্'কে যখন অক্ষর রূপে জানা হয়, তখন জপ আপনা থেকে আসে। আমি তাঁর বীণা; তার চেতনা, তার আনন্দ, এ মন্ত্রে স্ফুরিত হচ্ছে, এই অবস্থায় বা অনুভবে পৌঁছতে হবে। যদি এমনি ভারে সাড়া না পাই তাহলে জপভাবনা, যেমন আর একটা গানে আছে—তনুবীণা তনুতারে নিঃস্বরে যে স্মরে তারে। —সে ঝঙ্কার বোধে স্মৃতিরূপে ফুটে উঠছে। সমস্ত কিছু দিয়ে তাকে স্মরণ করছে। সে স্মরণ বা স্মৃতি বাঙ্‌ময়ী হয়ে উঠছে। তন্ত্রে বলা হতো শরীর মন্ত্রশরীর হয়েছে। তখন হাড়ের মাঝে বা দেহের যে কোনো অংশে মন্ত্র ফুটে ওঠে। এমনকী দেহের প্রত্যেক রোমকূপে মন্ত্র ফুটে ওঠে। এটাই অজপা।

এই হল অক্ষর, এই হল ওঙ্কার, এটাই ব্রহ্ম, এটাই পরম। এগুলি শক্তি সঞ্চার। নচিকেতার মাঝে ঝঙ্কার উঠছে। তখন সাধক যা চায় তা পায়। তার অর্থ, সে সর্বময় হয়ে যায়। ওঙ্কারই সব কিছু। সাধকের চেতনা, মন্ত্র আর জগৎ একাকার হয়ে যায়। ভিতরে মহিমার অনুভব হয়। তখন হয় মন্ত্রস্ফুরণ, মন্ত্রচৈতন্য। মন্ত্র জীবন্ত। মন্ত্রই ইষ্ট। মন্ত্রই আত্মস্বরূপ। উচ্চারণ করার সময় মন্ত্রময় হব। একটা ব্যাপ্তিচৈতন্যের অনুভব। হয়তো আলো আসে বা নাদ, ঝঙ্কার সমস্ত নাড়ীতে সঞ্চারিত হয়। এ হতে হলে সব খালি, সব শূন্য হয়ে যেতে হয়, আর তার ভিতর দিয়ে সব আলো, ঝঙ্কার ছড়িয়ে যায়।

দ্বিতীয়তটা আলম্বন, মধ্যম কিংবা অধম অধিকারীর জন্য। তারা ব্রহ্মালোকের মহিমা লাভ করবে। প্রথমটা অক্ষর, উত্তম অধিকারীর জন্য। তাদের সর্বাত্মভাব আসে।

১৮-১৯।। এটা বিবেকজ্ঞানের কথা। যম মৃত্যুর অধিপতি। তাকে আমরা ডরাই। গীতাতেও আমরা এ দুটো শ্লোক পাই। তার ভাব হচ্ছে নচিকেতাকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে সেটা সূক্ষ্ম দেহে। সে 'প্রেত' হয়ে যমের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। স্থূল দেহ নিয়ে যায়নি। তাকে স্থূল দেহে ফিরে আসতে হবে। প্রথম বরে সেটা উল্লিখিত হয়েছে। ফিরে যাবে তখন স্থূল দেহের বোধ আসবে। কিন্তু বাইরের বস্তু নশ্বর। বারবার এটাকে ছাড়তে হবে। যদি কিছু মরে তাহলে দেহই মরে। কিন্তু তার মাঝে যে তত্ত্ব রয়েছে তার জন্মও নেই, মরণও নেই। ওটা নিত্য শাশ্বত। শরীর নষ্ট হলেও সে নষ্ট হয় না।

দেহের সঙ্গে আত্মার বিবেকজ্ঞান। সাধনার সময় তাকে এরকম ধরতে পারি—দেহকে ছাপিয়ে যাওয়া, দেহের মাঝে যে বোধ রয়েছে সে বোধকে ধরে রাখা। সে বোধের ভিতরে যদি দেহকে দেখি তখন দেহের রূপান্তর ঘটে। সে বিবৃত পদ্মের মতো ফাঁকা হয়ে যায়, আর তার ভিতরে যে আত্মতত্ত্ব নিহিত রয়েছে সেটা বেরিয়ে আসে। এটা হচ্ছে প্রজ্ঞানের প্রথম ধাপ। দেহ থেকে আত্মাকে আলাদা করে জানা। চৈতন্য যখন দেহ থেকে বিমুক্ত হয় তখন প্রাকৃত মৃত্যু হয়। আর যখন দেহকে আবিষ্ট করে থাকে তখন প্রজ্ঞা।

বিপশ্চিত্। পরবর্তীকালে এটা থেকে 'প্রাজ্ঞ' হয়েছে। এটা প্রাচীন শব্দ। দেবতাকে বলা হতো বিপশ্চিত্। তারপর সাধকদের জন্যও এ শব্দ ব্যবহার করা হতো। বিপঃ+চিত্। বিপঃ=বেপন, কম্পন, হৃদয়ের আবেগ। √চিত্=জানা। হৃদয়ের আবেগকে যিনি জানেন তিনি বিপশ্চিত্, তিনি অন্তর্যামী। যখন ভাব জাগে, চিত্ত ব্যাকুল হয়, তখন যত স্পন্দন ওঠে, প্রত্যেক স্পন্দনকে তিনি জানেন এবং তাদের আরো প্রদীপ্ত করে নেন। এটা বিপশ্চিতের লক্ষণ। এভাবে দেবতাকে যিনি জেনেছেন, এভাবে নিজের ভিতরে যিনি জেগে উঠেছেন তিনিও বিপশ্চিত্। যিনি বিপশ্চিত্, যাঁর প্রজ্ঞা জেগেছে তিনি দেহতত্ত্বের উর্ধ্বে। সমস্তকে যে সত্তা আবিষ্ট করে রয়েছে তার মাঝে দেহ। সে সত্তা **শাশ্বত পুরাণ**। যখন কিছুই ছিল না তখন তিনি ছিলেন, কালাতীত। তিনি শাশ্বত, অসীম কালে প্রবাহিত। তিনি **নিত্য**। নিত্যের mystic অর্থ রহস্যার্থ আছে। অন্তরতম গভীরে প্রবেশকে 'নি' বলে, যেমন নিবৃত্তি, ভিতরের দিকে ঢোকা। 'নি'তে যিনি রয়েছেন তিনি নিত্য—'গূঢ়ম্ অনু-প্রবিষ্টঃ।' শাশ্বত কাল থেকে তিনি রয়েছেন। তিনি **অজ**, তাঁর জন্ম নেই, মরণ নেই।

সেই সর্বব্যাপী, সর্বান্তর্যামী আমারই অন্তরাত্মা। এই যিনি জানেন তিনি বিপশ্চিত্। দেহ যখন তাঁর কাছে পোষাকের মতো। বারবার দেহধারণ করা যেন বস্ত্র বদলানো। তখন

দেহর উপর যা ক্রিয়া হয় তার কোনো প্রভাব effect দেহের উপর হয় না। এটাই মহামরণে সমাপন্ন হওয়া। শূন্যভাব বিদেহ ভাব দিয়ে দেহীকে দেখা। দেহের বিবর্তন হয়। একদিন দেহ যাবেই। তাহলে বিপশ্চিতের কি অবস্থা? সে যেন শুদ্ধজলের মধ্যে শুদ্ধ জল মিশে যায়। সন্ধ্যার আলো আকাশে মিলিয়ে যায়, থাকে শুধু আকাশ। এটাকে নির্বাণ বলা হতো। 'ব্রহ্ম পরিমর'। সমস্ত দেহশক্তি, ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের শক্তি একটা বৃহৎ শূন্যতায় লয় হয়ে যায়, থাকে শুধু এক অব্যক্ত জ্যোতি। এটাই তৃতীয় বরে চাওয়া। যখন সব যায় তখন কী থাকে? এটাই মহামরণের ভাবনা। পরমশূন্যতার ভাবনা। শিব, মহেশ্বর। তারই মাঝে জীবন রয়েছে। এই সম্যক্ দর্শন। যেখানে উঠছে তারই মাঝে লয় হয়ে যাচ্ছে। ঢেউ-এর মতো উঠছে, আবার ঢেউ-এর মতো সমুদ্রের মাঝে লয় হয়ে যাচ্ছে। 'এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় অত্রৈব সমবলীয়ন্তে'। থাকে শুধু মহাশূন্যতা। গীতাতে যা সঙ্কেত করা হয়েছে, বাইরের জগৎ থেকে যা কিছু আসে, যে কোনো ভাব আমরা গ্রহণ করি, সব আমার মাঝে যেন, সব জল যেমন সমুদ্রে লয় হয়ে যায়, তেমনি করে মিশে যাচ্ছে। 'আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ, তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি, ন কাম কামী।' এটা প্রশান্তির ভাবনা। জীবন আর কর্মে কোনো বিরোধ নেই। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে জীবনকে গ্রহণ করা। যম মৃত্যু, নচিকেতা জীবন।

প্রথম উপদেশ এই যে, তুমি যে শরীরকে আঁকড়ে রয়েছ সে মিথ্যা। আমি তা রচনা করেছি। আমিই তা ভেঙে দিতে পারি। এটাই দীক্ষার পর প্রথম জ্ঞান। বিদেহভাবনায় অভ্যস্ত হওয়া।

২০।। এখানে দ্বিতীয় স্তরের কথা। প্রথম বিদেহভাবনা, নিজের ভিতরে তাকে জানা। সে ভাবনা কিভাবে সিদ্ধ হয়, সেটা এই শ্লোকে বলা হচ্ছে।

আত্মা শরীরের মাঝে এবং বাইরে রয়েছে। বাইরে রয়েছে সেটা আমরা জানি না। বোধেও আনি না। তাকে বোধে আনতে হবে। আকাশের ভাবনা দিয়ে সেটা জানা যায়। যেমন আমার স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ, তেমনি কারণ দেহ। কারণদেহই আকাশ। এক সর্বব্যাপী দেহের মাঝে বুদ্‌বুদ্ রূপ দেহগুলি রয়েছে। মহা-বিদেহই কারণশরীর।

অকল্পিত বৃত্তি। শুধু অস্তিত্বের বৃত্তি ছাড়া কিছুই মানছি না। হৃদয়ে বা ভ্রূমধ্যে বা সর্বব্যাপী শূন্যে তার বোধ করা। আমার ভিতরে সে আলোর মত। দেহের পাত্রকে ভেদ করে বা তার ভিতর দিয়ে বা দেহের প্রতি রোমকূপ দিয়ে সে যেন বেরুচ্ছে। আকাশ রূপে যে আলো, তেজ, বায়ু অর্থাৎ মহাশক্তির স্পন্দন বাহিরে রয়েছে, তেমনি ভিতরে রয়েছে। এক সমুদ্র, বাইরে ভিতরে সব এক। এটাই অকল্পিত বৃত্তি। আর কোনো ভাবনা নেই। এটাই মহাবিদেহ বা কারণশরীর। তিনি যেমন কারণশরীর রূপে রয়েছেন তেমন আমার ভিতরে মৃণালদণ্ডের মতো সূক্ষ্ম তন্তুরূপে অণোরণীয়ান্ রূপে রয়েছেন। তখন নিজের মাঝে ডুবে যাই। আর বাইরের দেহবোধ সঙ্কুচিত হতে হতে একটা সূক্ষ্ম তন্তুর মতো রৈখিক সত্তার ভাবে তার অনুভব করি। একটা চুলকে যদি একশ ভাগ করা যায় তার মতো সূক্ষ্ম সে তন্তু। সে রৈখিক সত্তাকে অবলম্বন করে চারদিক থেকে সব সংহত হয়ে রয়েছে মিছরির Crystal এর মতো। যখন মিছরি দানা বাঁধে, একটা বিশেষ temperature এ উত্তাপে যখন saturation point reach করে, চরমে পৌঁছয়, তখন যদি একটা সুতো তার ভিতরে রাখা যায় তাহলে সে সুতোর আশেপাশে দানা বাঁধবে। এই রকম সূত্রাত্মা। এটা সৃষ্টির তার।

'স তপস্তেপে তপস্তপ্ত্বা ইদম্ অসৃজৎ।' 'ঋতম চ সত্যম্ চ... অজায়ত।' একটা শক্তি, যার মূলে চিন্ময় তাপ রয়েছে, তার ভিতরে একটা ভাবনার সূত্র পড়ে গেল, তাকে অবলম্বন করে দেহ দানা বাঁধল। বৈষ্ণবরা কমদগাছ দিয়ে এইরকম কল্পনা করেছেন। তার ফুলে বাইরে জ্যোতির ছটা, সব কিছু ঝুলছে একটা বোঁটা থেকে, এটাই সূত্রাত্মা। আমার চারিদিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, আমিই তার কেন্দ্রে। সাংখ্যেরা বহুপুরুষবাদী। তাঁরা বলেন প্রত্যেক পুরুষকে ভাবতে হয় যেন সেই কেন্দ্র আর তার আশেপাশে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরছে। মহাবিদেহের ভাবনা সবার পক্ষে এক। এটা **মহতো মহীয়ান্**-এর ভাবনা। যদি সূক্ষ্মতম মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত প্রসারিত মৃণালের মতো সূক্ষ্ম তন্তুকে অবলম্বন করে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রয়েছে এই কল্পনা করি, তাহলে দেহ এবং বিদেহের একটা সমন্বয় ঘটানো যায়। মহাবিদেহ সব সময় থাকছে। আর সূত্রের চারিদিকে যে দেহ গড়ে উঠেছে সে চলেযায়। সে শীর্ণ হয়, গলে যায়, তাই 'শরীর' (√শৃ)। আর দেহ < দিগ্ধ, কিনা saturate জারিত করা। যেমন কোনো বিষধর যখন কামড়ায় তখন যেখানে কামড়ায় তার আশে পাশে সব ফুলে যায়, তাকে দিগ্ধ হওয়া বলে। তেমনি দেহ যদি দিগ্ধ হয়, চিৎশক্তি যখন তাকে বেধ করে, তখন তার আশপাশ উচ্ছ্রিত হয়, ফুলে ওঠে আর সে বড় হতে হতে ব্রহ্মাণ্ডের মতো ফুলে উঠতে পারে। চেতনার বিস্ফারণ, expanding consciousness, receding nebula, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বৃহৎ হচ্ছে। ভিতরে সূত্রাত্মা expand করছে, বৃহৎ হচ্ছে, তখনই দেহের সৃষ্টি হয়। যখন বিশীর্ণ হয় তখন শূন্যতায় পর্যবসিত হচ্ছে। তখন সে শরীর। বিশুদ্ধ চৈতন্যকে অণুর আকারে এবং মহতের আকারে তাতেই দেখতে পাই। **তম্ অক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুপ্রসাদাৎ মহিমানমাত্মনঃ**। কীভাবে তাকে দেখব? প্রথম একবার আসে, আবার আচ্ছন্ন হয়। পানাপুকুরের জলের মতো। পানাগুলি জলকে ঢেকে রেখেছে, তাকে সরিয়ে জল নিই, কিন্তু আবার পানাগুলি জলকে ঢেকে দেয়। এটা মনের বিক্ষিপ্ত অবস্থা। বারবার অনুভব আসে, আবার চলে যায়। আসা যদি ঘন ঘন হয় আর তার মাঝে প্রশান্তির সময়টা যদি বাড়ে তখন শেষে একটা নিত্য শাশ্বত অবস্থা পাওয়া যায়। তখন ভিতরের শাশ্বত অবস্থাকে আবিষ্কার করে রয়েছি আর তার ভিতরে দেহপ্রাণমন যেন পানার মতো লীলা করছে।

জীবনে তাই দেখি। তিনি স্তব্ধ হয়ে রয়েছেন। তিনি এক। তিনি দ্যুলোকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বৃক্ষের মতো স্তব্ধ হয়ে। গভীর স্তব্ধতা, তার থেকে শক্তির বিকিরণ হচ্ছে। তখন তাকে চাঞ্চল্য বলা যায় না, বলা যায় স্ফুরত্তা spiritual dynamism। ভিতর থেকে তার বিকাশ। যদি বাইরের আঘাতে চিত্তসত্তা স্পন্দিত হয়, তখন একদিকে দেখা দেয় হর্ষশোক, আর একদিকে ক্রতু creative activity, ইচ্ছা, প্রচেষ্টা, গড়ে তুলবার আকাঙ্ক্ষা। অথচ মূলের সঙ্গে তার যোগ নেই। একদিকে passion উদগ্র কামনা, আর অন্যদিকে blind impulse অন্ধ আবেগ। এ দুটোকে বর্জন করতে হবে। তা হলে হর্ষশোকের দ্বন্দ্ব থাকবে না। বীতশোক হতে হবে। গীতায় একেই বলা হয়েছে, 'বীতরাগভয়ক্রোধঃ'। রাগ হচ্ছে passion আবেগ, ভয়, যা পেয়েছি তাকে হারাবার আশঙ্কা। সব passion আবেগ উদ্বেগ অন্তর্হিত হলে চিত্ত প্রশান্ত হবে। করব বলে কোনো সংকল্প আর থাকবে না। 'অক্রতু' হব। এ ভাব স্থির হলে তখন ক্রতু আবার জাগে। কিন্তু সে অন্যভাবে। ঋগ্‌বেদে তাকে কবিক্রতু বলা হয়েছে। চেতনা কবি হয়। সায়ণাচার্য বলেছেন—কবিঃ ক্রান্তদর্শী, বহুদূরের স্বপ্নকে সে দেখতে পায়। আর সে স্বপ্নের সার্থকতার জন্য শক্তিরও তার ভিতরে স্ফুরণ হয়। অগ্নিকে

কবিক্রতু বলা হয়েছে। ইন্দ্রকেও কবিক্রতু বলা হয়েছে। আমার ভিতরে যে দেবতা তিনিও কবিক্রতু। অক্রতু থেকে কবিক্রতু যখন হতে পারি তখন হর্ষশোকমোহের বদলে পেতে পারি প্রসাদ বা প্রসন্নতা।

ধাতুপ্রসাদ। এটা খুব important। ধাতু যা কিছু আমাকে ধরে রয়েছে। আমার দেহপ্রাণমন। সেই উপাদানকে অবলম্বন করে চৈতন্যের বিকাশ হয়েছে। দেহপ্রাণমন ছাড়া যে চৈতন্য সে লোকোত্তর। কিন্তু ইহলোকের যে চৈতন্য, being, substance, সে উপাদান ছাড়া থাকে না। সে উপাদানগুলি প্রসন্ন হবে। যেন প্রসন্নসলিলা গোদাবরী। প্রসন্ন, স্বচ্ছ। অর্থাৎ কোনো আবিলতা নেই। বাইরে যে আলো রয়েছে তাকে দেহ বাধা দিচ্ছে, কিন্তু দেহ যদি স্বচ্ছ হয়ে যায় তাহলে বাহির-ভিতর একাকার হয়ে যায়। এই স্বচ্ছ ভাব, সেটাই প্রসাদ। আবার তিনি না দিলে এসব হয় না। তাই তাঁর graceই করুণাই সে প্রসাদ।

বৌদ্ধেরা এই জিনিসকে খুব সুন্দর করে বলেছেন। বায়োলজি-র সঙ্গে এটা অনেক মিলে যায়। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি জাগে কী করে? আমাদের দেহ জড়, সে যেন একটা structure কাঠামো। কেউ যেন তাকে ঘসে ঘসে শুভ্র করছে। ক্রমশ সে স্বচ্ছ হচ্ছে। সে স্বচ্ছতা একটা মাত্রায় পৌঁছলে বাইরের আলো তার ভিতরে রূপ ধরে। যেমন, ভিতরের retina স্বচ্ছ বলে তার উপরে রূপের জ্ঞান হয়। যেমন চক্ষু স্বচ্ছ বলে সমস্তটা দেখা যায়। তেমন যদি সমস্ত দেহ এভাবে স্বচ্ছ হয়ে উঠত, তাহলে সমস্ত দেহ দিয়েও দেখা যেত। এরকম দেখা যায়।

তন্ত্রে ভূতশুদ্ধির সাধনা রয়েছে। আমাদের দেহ পঞ্চভূতাত্মক। প্রত্যেক ভূতের নিজস্ব গুণ, শাশ্বত গুণ রয়েছে। তাকে যদি আমরা শুদ্ধ করে ধরতে পারি তাহলে সমস্ত দেহ দিব্য বা divinised হবে। সমস্ত ধাতু যদি প্রসন্ন হয় তাহলে 'ন তত্র জরা, ন মৃত্যু র্ন ব্যাধিঃ'—সেখানে জরা মৃত্যু ব্যাধি কিছুই থাকে না। divinisation of body, দেহের দিব্যতাসম্পাদন এটা খুব প্রাচীন সাধনা। এটি নাথযোগীদের সাধনা ছিল। এক সময়ে ভারতবর্ষে খুব ছড়িয়ে পড়েছিল। দেহকে দিয়ে ব্রহ্মকে পাওয়া। Transformation of body, Conquest of death, decay and disease, দেহের রূপান্তর সাধন, জরা মৃত্যু ব্যাধিকে জয় করা।

পৃথিবীর গুণ স্থৈর্য। অপের গুণ বিগলিত হওয়া, plasticity। বৌদ্ধেরা সংসক্তি বলতেন। যেকোনো রূপ ধারণ করবার শক্তি। তেজের গুণ দীপ্তি, প্রকাশ। বায়ুর প্রণামিত্ব, স্বচ্ছন্দে সর্বত্র বয়ে যাওয়া। 'বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্' গীতায় বলা হয়েছে। আকাশ শূন্য।

সমস্ত দেহ যেন জমে গিয়েছে। অটল, অচল, সুমেরুবৎ snow peak তুষারমৌলির মতো। শিবের কল্পনা তাই থেকে হয়েছে। রজতগিরিনিভ। বৌদ্ধেরা স্তূপের কল্পনা করেছেন। একটা ant hill বল্মীকের মতো আমি থাকব। তার থেকে বাল্মীকি। এর ভিতরে প্রাণস্পন্দনের অনুভব হয়, সেটা যেন টলমল করছে। অপ্—প্রশান্ত দেহ, তার মধ্যে হৃদ্য সমুদ্র। এই অপের ভাব যখন আসে তখন বিশ্বরূপ হওয়া যায়। জল যেকোনো রূপ ধারণ করতে পারে। রূপম্ রূপম্ প্রতিরূপো বভূব। দেহসংস্কার তখন থাকে না। আমি বহুরূপেরই একটা রূপ। তারপর জলের মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে, এটাকে বাড়বাগ্নি, marine fire, সমুদ্রের অগ্নি বলা হতো। তখন সমস্ত রূপ একরূপে দেখা যায়। শরীর তখন তেজঃশরীর হয়। নিখিলব্যাপী জ্যোতির ভাব আসে। তারপর শক্তি, এটা বায়ুরূপ। আর

শেষে শূন্যতা, এটা আকাশ। শক্তি ও শূন্যতা, দুটোকে যুগনদ্ধভাবে অনুভব করা যায়। শক্তিই মহাপ্রাণ। মহাপ্রাণ বা মুখ্যপ্রাণকে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ইত্যাদিতে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর শূন্যতা হচ্ছে আকাশের অনুভব। এই অনুভবগুলি অনুলোমক্রমে আসতে পারে। আকাশ স্তম্ভিত হল। সেখানে বায়ু মহাপ্রাণরূপে স্পন্দিত হল। সে শক্তি জ্যোতিঃসত্তা রূপে ফুটে উঠল। জ্যোতিঃসত্তা বহু, বিশ্বরূপে ফুটে উঠল। তারপর একটা দেহে স্থির হল। এই স্থির হওয়াটাই দেহ বা বিগ্রহ বা মূর্তি। যেমন 'সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ' শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি। আকাশ তখন যেন জমাট বাঁধল। এটাই ধাতুপ্রসাদ। তন্ত্রে সহজ সাধনার জন্য formula বিধান দেওয়া হয়ে থাকে। দেহের ভাবনা থেকে শুরু করে তাকে ক্রমশ আকাশে মিলিয়ে দেওয়া, আবার আকাশ থেকে দেহে আসা। সমস্তই ধাতুপ্রসাদ। ভূতগুণ যখন যোগগুণে পরিবর্তিত হয়, তখন আত্মাকে অনুভব করি অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্ রূপে, সে আত্মকেন্দ্রকে ধরে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সংহত হয়ে রয়েছে। এই ব্রহ্মাণ্ড প্রসন্ন, চিন্ময়। মহাবিদেহ ব্রহ্ম।

স্থূলদেহের ভাবনাকে অতিক্রম করে মহাবিদেহকে লাভ করা, এটা দ্বিতীয় স্তর।

২১।। এই মহাবিদেহ জ্ঞান জাগ্রত ভূমিতেও রাখা যায়। জগতের গতি আর তার মূলে নিস্পন্দভাব, এই দুটোর মাঝে সব খেলা চলছে। আত্মা বসে আছেন, আবার তিনিই যেন চলছেন। আত্মা শুয়ে রয়েছেন আবার ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এটাই কালীরূপে তারারূপে বর্ণিত হয়েছে। শিব পদতলে শয়ান। কালী তারই স্ফুরত্তা, শিব থেকে স্পন্দিতা। তিনি কালরূপে জগৎময় স্পন্দিত হচ্ছেন। তার ফলে প্রত্যেক বস্তুর ধ্বংস হচ্ছে। এটা বৌদ্ধ ভাবনা। শয়ান চেতনা শিব নিস্পন্দ। অস্পন্দ তবুও স্পন্দিত। স্পন্দনে অন্তরের শক্তির স্ফুরণ হচ্ছে electric wave vibration বিদ্যুৎপ্রবাহের স্পন্দনের মতো। প্রত্যেক second-এ মুহূর্তে millions and millions of times লক্ষ লক্ষ বার করছে, vibrate স্পন্দিত হচ্ছে। আবার প্রত্যেক প্রলয়ের মধ্যে একটা স্থিতি আছে। যম প্রলয় অথচ স্থিতি। প্রলয়, গতি, স্থিতি। স্থিতি আভাস মাত্র। কিছুই স্থিত নয় শিবচেতনা ছাড়া। স্পন্দিত শক্তি থেকেও থাকে না। শঙ্করাচার্য মায়াকে তাই অনির্বচনীয় বলেছেন। মায়া সতী অথচ অসতী। তাতে থাকা মানে মৃত্যুমুখে থাকা। নিজের মনকে দেখে এ জিনিসটা বুঝতে পারা যায়। এই মুহূর্তে একটা বিচার উঠল আবার পরমুহূর্তে তা লয় হয়ে গেল। সাধনাতে আমরা চিত্তকে স্থির করতে চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না। আমাদের যেটা করা উচিত তা হল শিবচেতনাকে পাওয়া, এই যে চিত্তের মাঝে প্রতি মুহূর্তে লয় হচ্ছে সে-লয়ের সম্পর্কে সচেতন হওয়া। শিবেই লয় হয়ে যাচ্ছে। দুটো ভাবনার মাঝে ফাঁক থাকে, তার উপরে মনকে কেন্দ্রিত করা। শিবসূত্রে বলা হয়েছে 'সম্বন্ধে সাবধানতা'। Psychologically মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আমরা বলি একটা ভাবনা তার একটা অনুষঙ্গ association সংস্কার বা ছাপ রেখে যায়, তার থেকে অন্য ভাবনা ওঠে। কিন্তু যদি শেষ পর্যন্ত এভাবে বিশ্লেষণ করি তাহলে 'কেন ওঠে' এর উত্তর পাওয়া যায় না। শেষে একটা ফাঁকই রয়ে যায়। দুটো বৃত্তির মাঝখানে এই ফাঁকটুকু দেখে যাওয়া। তখন দেখব প্রত্যেক ভাব উঠছে আর নেমে যাচ্ছে। কোনো ভাব স্থির থাকছে না। একে অবলম্বন করেই বৌদ্ধদের ক্ষণভঙ্গবাদ এসেছে।

এই ভাবনাকে যুগপৎ বোঝানোর জন্য শিবের বুকে কালী। কালী স্থির নন। তিনি নেচে বেড়াচ্ছেন। এই এল, এই গেল ভাবে। ঝলকে ঝলকে, দমকে দমকে তাঁর নৃত্য।

এটাই হচ্ছে **শয়ানো যাতি সর্বতঃ**।

সেই **মদ**, সেই **অমদ**। একদিকে সে মদ, মত্ততা। শিবকে যখন 'ভাং' খাওয়ায় তখন তার ভিতরে মত্ততা আসে। বলরামকে দেখানো হয়েছে সে সব সময় ঘূর্ণিত। বলরাম—যোগবল+রাম, আনন্দ। যোগসিদ্ধি থেকে যে আনন্দ পেয়েছে। সেই বলরাম তাকে দেখানো হয়েছে সে যেন টলছে। শক্তি যখন আবির্ভূত হয় তখন সেইরকম টলে, কিন্তু ভিতরে অটল রয়েছে। মদ কথাটি অনেক জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। ইন্দ্রকে বলা হয়েছে, সোমপানজনিত মত্ততা থেকে তিনি সব কিছু করলেন। নিজের মাঝে তলিয়ে গিয়ে যখন আনন্দ পাই তখন আত্মারাম। ভাগবতে দুটিকে যুগপৎ সত্তা রূপে বলা হয়েছে—রাম ও কৃষ্ণ! কৃষ্ণ আত্মারাম, রাম বলরাম। রাম অগ্রজ, আগে জন্মেছে। সাধনায় আগে শক্তি আসে, তারপর সে সহজ হয়। প্রথম যে ফোটে, সে অগ্রজ। জগতের দিকে প্রথম জন্মায়। 'হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্তত অগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।' হিণ্যগর্ভ মহত্তত্ত্ব। তার শক্তির প্রথম স্ফুরণ, সে যেন টলছে, ক্রমশঃ এ টলা দ্রুত হচ্ছে। তারি form রূপ হলেন কালী। একটা particle-এ অণুকণায় যেমন তার vibration স্পন্দন immeasurable অপরিমেয়, কিন্তু তার মূলে স্থিরতা। যত পরিধির দিকে যাই, আনন্দ, মত্ততা স্পন্দন বাড়ে। পরিধির যেকোনো একটা বিন্দু যদি দেখি সেখানে বেগ বেশি। যে principle-এ যেভাবে আমরা চরখা চালাই। ভিতরে বিন্দুর বেগ কম। মাঝখানে যে point সেখানে বিন্দু যেন নিস্পন্দ। Speed গতিবেগ সেখানে zero শূন্য কিন্তু বাইরের দিকে বাড়তে বাড়তে speed infinity গতিবেগ অনন্ত হয়। শিব বিন্দু। বাইরে শক্তির আবর্তন, সেই কালী। কালী, শক্তির speed গতিবেগ আসে ভিতরের আত্মারামের মধ্য থেকে, আনন্দ থেকে, উল্লাস থেকে। তার একটু দোলা, তাকে অবলম্বন করেই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরছে। বলরাম অগ্রজ, তার থেকে সব দোলা। আর তার ভিতরে আত্মারাম, নিস্পন্দ, অমদ। এই তার স্বরূপ, আত্মার স্বরূপ।

আমি ছাড়া কে তাকে জানতে পারে? যম নচিকেতাকে যেন আহ্বান করছে, তুমি আমার মাঝে, মৃত্যুর মাঝে, মহাশূন্যের মাঝে ঝাঁপ দাও, লীন হয়ে যাও। ভিতরে মৃত্যু, শূন্যতার বিন্দু, সে ছাড়া কে তাকে জানবে?

২২।। এটি আগের মতো। **অশরীরং শরীরেষু** সেটা শীর্ণ হয় না। সেই অশরীরের ভিতরেই শরীরগুলি দেখা যাচ্ছে। যদি তাকে জানা যায়, তাহলে হর্ষশোকের পারে যেতে পারি। সেই অশরীরী **মহান্**, সেই **বিভু**, সেই আমাদের আত্মা।

২৩।। তাকে পাওয়া কঠিন। এমনি পাওয়া যায় না। **বহু শ্রুতি** অনেক পড়েছি শুনেছি। **মেধা** চিত্তের একাগ্রতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। **প্রবচন** বেদবিদ্যা গ্রহণ করে তার অনুশীলন, সেটা শিষ্যরূপে করতে পারি, আচার্যরূপেও করতে পারি। এগুলি দিয়ে তাকে পাওয়া যায় না, অথচ করতে হয়। তাকে ছাপিয়ে যেতে হয়। গীতাতে বলা হয়েছে—যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধি র্ব্যতিতরিষ্যতি। তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ (২/৫২)। প্রথমে মোহ চলে যাবে তখন উদাসীনতা আসবে, তখন শ্রুত এবং শ্রোতব্যের উপরে স্পৃহা চলে যাবে। তখন ফুল যেমন সূর্যের দিকে দল মেলে, তেমন করে তাঁর দিকে নীরব হয়ে থাকবে। এটিই তাঁর grace বা প্রসাদ।

চেষ্টা করতেই হয় কিন্তু পরে নিশ্চেষ্ট হতে হয়। শুধু অপেক্ষা—যেন তিনি আসছেন, পথ চেয়ে থাকা। তখনই সত্যকার পাওয়া হয়। তার আগের পাওয়া আসবে ও যাবে।

পাওয়া তখন স্থির হয়, যখন তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন। তখন আমার চেষ্টা নিস্পন্দ হয়ে যায় আর তিনি নিজেকে বিবৃত করেন। তিনি যাকে বরণ করেছেন তার কাছেই তিনি তাঁর তনুকে বিবৃত করবেন, স্বস্বরূপে প্রকটিত হবেন। তখনই হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় মিশে যায়। প্রথম আমি যেন খুঁজছি, এই ভাব আসে, তখন একটু আকুলি-বিকুলি থাকবে কিন্তু পরে ক্রমশ প্রশান্তি আসবে। পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ তখন হবে যখন সমস্ত চিত্ত 'সমনস্কঃ সদা-শুচিঃ' হবে আর যেন তার জন্য প্রতীক্ষা করছি। গীতগোবিন্দে একটি শ্লোক আছে—'পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্। রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্'—কৃষ্ণ যেন প্রতীক্ষা করছেন রাধার। উক্তিটি রাধার সম্পর্কে ধরলে ভাবটি সহজে ধরা যায়। প্রতি মুহূর্তে একটা প্রস্তুতির ভাব। রবীন্দ্রনাথের গান আছে—'তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি; সে যে আসে, আসে আসে—।' এটা শরণ ভাব। তিনি বরণ করেছেন এটা যদি আমি বুঝতে পারি তখন আর কোনো আড়াল দেখব না। তখন দুই এক হয়।

উপনিষদে যমের, মৃত্যুর রহস্য আছে অথচ প্রেমের রহস্যও এখানে দেখান হয়েছে। মহাশূন্যকে ভালবাসা দিয়ে পাওয়া, তার অর্থ নিজেকে রিক্ত করে দিয়ে পাওয়া। সাধনা থাকবে কিন্তু শেষে কোনো প্রযত্ন বা চেষ্টা থাকবে না। দুই এক হয়ে যাবে, থাকবে মহাশূন্য। তারপরে মহাশূন্যের ভিতরে তরঙ্গ ওঠে কিন্তু সেটা পরের কথা। মহাপ্রভুর এই ভাব।

২৪।। বাইরের উপকরণ দিয়ে মরণকে, শিবকে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলছেন—ওগো মরণ, হে মোর মরণ। মরণকে ভালবাসতে হয়। উমার তপস্যা মৃত্যুর জন্যই। বাহিরের সাধনা প্রবচন ইত্যাদির। অন্তরের সাধনা—'রচয়তি শয়নম্ সচকিতনয়নম্' নিজেকে যেন মার্জনা করছি, সাজাচ্ছি এটাই যথেষ্ট সাধনা। নিজেকে তৈরি করা। আগে ভাবের কথা, অশরীরী হতে হবে, বিরাট শূন্যের ভাবকে গ্রহণ করতে হবে। যদি এভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি নিজেকে প্রকাশিত করবেনই। কিন্তু যদি সে ভাব না থাকে তাহলে প্রবচন ইত্যাদি দিয়ে সাধনা করতে হয়, ভাবকে ফোটাতে হয়। বিবেকানন্দ যখন রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন 'পড়লে কি হবে?' তখন রামকৃষ্ণ বলেন—'ওরে পড়তে হয়। আমি পড়িনি, কিন্তু অনেক শুনেছি, এ সবেরই দরকার।'

আগের শ্লোকে positive বিধিরূপে সাধনাগুলি দেওয়া হয়েছিল, এই শ্লোগে negative নিষেধমুখে সাধনা দেওয়া হয়েছে। তাঁকে পাওয়া যায় প্রজ্ঞান ভাব যখন আসে, আলোর মতো যখন ভিতরে ফুটে ওঠে। এটা আলো দিয়ে আলোকে জানা।

আমাদের শাস্ত্রে প্রথমেই চরম তত্ত্বকে চোখের সামনে রেখে দেওয়া হতো। তখন একটা বিস্ময় ভাব জেগে উঠত। পরে আধারের এক এক অঙ্গ ধরে সাধনা করানো হতো।

দুশ্চরিত থেকে বিরত হতে হবে। Wrong movements ভ্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এমন কিছু করব না যাতে আড়াল উৎপন্ন হয়। **অশান্ত** ভাবকে দূর করতে হয়, ভিতরে ক্ষুধা-তৃষ্ণা থেকে যে চঞ্চলতা, অশান্তি আসে, তাকে দূর করতে হবে। দম আর শম—দম বাইরের ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, শম অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ। সমস্তের মূলে বাসনা রয়েছে। বাইরে ও অন্তরে যখন শান্ত হই তখন **সমাহিত** ভাব আসে। আর মনে হয় এই তিনি, এই যে তিনি। তখন একটা ব্যাকুলতা আসতে পারে, তাকেও ছাড়তে হবে। **ন অশান্ত-মানসঃ**—শঙ্কর এর সুন্দর ভাষ্য করেছেন। শান্তের পর অশান্ত-মানস কেন? তিনি বলছেন, শান্ত হলে, সমাহিত

হলে আমি এখনও তোমাকে পাইনি বলে একটা ব্যাকুলতা আসে, অস্বস্তিভাব থাকতে পারে, তাকে বর্জন করতে হবে। যেমনি বিষয়ের কামনা ছাড়ব তেমনি ভগবানকে লাভ করব সে কামনাও ছাড়তে হবে। তা না হলে আমি চাইছি এ কথাই বড় হয়ে ওঠে। ভগবানকে নিয়ে অশান্তি আসে। এটা দেখা যায়। গানের ভিতর আমরা অনেক এরকম দেখি। ভগবানকে নিয়ে মান-অভিমান করা—এটা অবিদ্যা। এটাই চরম অবিদ্যা। এটা যখন থাকে না তখন প্রজ্ঞান আসে, তখন সহজে তাঁকে দেখতে পাই। 'অস্তি ইত্যেব উপলব্ধব্যঃ'—তিনি আছেন, আমি আছি, তুমি আছ এইভাব আসে। প্রাপ্য-প্রাপ্তি ভাব আর থাকে না।

২৫।। এরকম ভাবে তাঁকে পাওয়া—তিনি কি, কোথায় রয়েছেন, কিভাবে রয়েছেন সেটা কে বলতে পারে— তিনি অনির্বচনীয়, এ রহস্য বলা যায় না। তখন যে তাকে জানে তার শুধু আশ্চর্যভাব থাকে।

এ বস্তু কী? **ব্রহ্ম** আর **ক্ষত্র** যার **ওদন** food খাদ্য, আর **মৃত্যু** যার **উপসেচন** চাটনী। চিত্তের বিস্তার, জ্ঞানের প্রসার, সেই ব্রহ্ম। আর ক্ষত্র হল তেজ, বাধা দূর করার জন্য যে উদ্যতভাব, যে শক্তি। তিনি যখন আসেন আমার এই ব্রহ্মভাব আর ক্ষত্রভাব দুইই তিনি খেয়ে ফেলেন। প্রথমে দুটো ভাব থাকে— চিত্তের প্রশান্তি, আর আমি তাঁর—এই ব্রহ্মভাব; আর যত বাধা আসে দূর করব এই ক্ষত্রভাব। কিন্তু যখন তিনি আসেন তখন কোথায় থাকে সেই ক্ষত্রভাব আর ব্রহ্মভাব? কিছুই থাকে না। তিনি আমাকে, আমার সাধনাকে, আমার সমস্তকে খাচ্ছেন, মাঝে মাঝে মৃত্যুর প্রক্ষেপ দিয়ে, চাটনি দিয়ে। সব গ্রাস করছেন আর চাটনি যেন খাবার স্বাদ বাড়ায় তেমনি মাঝে মাঝে দেখছি মৃত্যু, আর তাকে নিয়ে তাঁর অফুরন্ত উল্লাস।

সে কোথায়? সে কোথায়? এ ভাব আসে। সে নাই অথচ আছে। আর কোনো সাধনা নেই। সব তিনিময় হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে শুধু মৃত্যু—flash light বিদ্যুতের ঝলকের মতো চমকাচ্ছে।

এটাই বৈষ্ণবরা বিপ্রলম্ভের ভিতর দিয়ে বুঝিয়েছেন। চরম বিপ্রলম্ভ কৃষ্ণ যখন গোকুল ছেড়ে চলে গেলেন। আর কখনও আসবেন না। রাধা তখম সমাহিত—এটাই মহাপ্রভুর গম্ভীরার ভাব। তখন শ্রীকৃষ্ণ আসেন মৃত্যুর ভাবে। এটা মৃত্যুর সঙ্গে পরিণয়। দ্বিতীয় বল্লীতে সমস্ত তত্ত্বগুলিকে একটা depth charge দিয়ে মূলে নাড়া দিয়ে চরম ফল পর্যন্ত বলে দেওয়া হচ্ছে। তৃতীয় বল্লীতে এটাকে বিস্তৃত করে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় বল্লী চমৎকার। চেতনাকে shocks ঘা দেওয়া হচ্ছে vision দিয়ে, গভীর কথা দিয়ে।

প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় বল্লী সমাপ্ত

প্রথম অধ্যায়

তৃতীয় বল্লী

দ্বিতীয় বল্লীতে যে তত্ত্বগুলো mystic বা রাহস্যিকভাবে দেখানো হয়েছে, তৃতীয় বল্লীতে সেগুলো দার্শনিকদের ভাষায় বুদ্ধি দিয়ে বোঝানো হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের সঙ্গে উপনিষদ শেষ হচ্ছে। তারপরে আর একটি অধ্যায় পিছন থেকে লাগান মনে হয়। তাতে অনেক দার্শনিক তত্ত্ব রয়েছে।

বেদান্তের তিনটি প্রস্থান। শ্রুতি স্মৃতি ও ন্যায়। তত্ত্বকে যখন সাক্ষাৎ বা অপরোক্ষভাবে গ্রহণ করা বা দেওয়া হয় তখন শ্রুতি। তারপর যখন সেটাকে বুদ্ধির ভাবনা দিয়ে বলা হয় তখন স্মৃতি। আর যখন তর্ক দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয় তখন ন্যায়। উপনিষদগুলি শ্রুতি। গীতা পুরাণ ইত্যাদি স্মৃতি। আর ব্রহ্মসূত্র ন্যায়। শ্রুতি আর স্মৃতি প্রায় পাশাপাশি থাকতে পারে। এখানে দ্বিতীয় বল্লীর উপদেশ শ্রুতির ঢঙে আর তৃতীয় বল্লীর উপদেশ স্মৃতির ঢঙে। তৃতীয় বল্লীতে একটা plan বা scheme পরিকল্পনা রয়েছে। যেমন গীতাতে আছে। মূল ভাবনাকে নানা বিচার দিয়ে বিবৃত করা হয়। তর্কের ধারাকে অবলম্বন করে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়। সেদিক দিয়ে বেদান্তের ন্যায়প্রস্থান হল ব্রহ্মসূত্র।

১।। দুটি তত্ত্ব, **ঋতং পিবন্তৌ** আর **ছায়াতপৌ**। ছায়াতপ ব্রহ্মতত্ত্বকে বলা হয়েছে। সে আলো এবং অন্ধকার। আতপ=প্রকাশ, ইতিজ্ঞান, সূর্যের আলোতে যেমন সব ফুটে ওঠে। ইতির পেছনে নেতি, মহাশূন্য। যেমন দিনের পিছনে রাত্রি। বৈদিকরা বলতেন মিত্র আর বরুণ। ছায়ার বুৎপত্তি অদ্ভুত রকমের, peculiar। ছায়া বলতে আমরা বুঝি shadow shade বা darkness, প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছায়া বা অন্ধকার। আসলে এটা 'ছন্‌' ধাতু থেকে এসেছে। ঋগ্‌বেদে অনেক জায়গাতে উষা সম্পর্কে তাকে ব্যবহার করা হয়েছে। সেখানে ছনের অর্থ হচ্ছে অন্ধকারের ভিতর থেকে ফুটে ওঠা, আবির্ভাব। অন্ধকার থেকে যে আলো ফোটে তাকে ছায়া বলা হতো। মুখের মাঝে যে আভা ফোটে সে মুখচ্ছায়া। এমন একটা আলো যাকে বাইরের আলো দিয়ে দেখা যায় না, অথচ তার আলোতে সমস্ত আভা পায়। ছায়াই সে আলো। ঋগ্‌বেদে আছে 'যস্য ছায়া অমৃতং যস্য মৃত্যুঃ'। ব্রহ্মতত্ত্ব ছায়াতপের মতো। আচার্য আর শিষ্যকেও এর সঙ্গে তুলনা করতে পারি। যম ছায়া, নচিকেতা আতপ। যিনি দিচ্ছেন তিনি আশ্চর্য ভূমি থেকে দিচ্ছেন আর সেটা সংক্রামিত হচ্ছে অনুশিষ্টের মাঝে। তখন সে আতপের দ্যুতিতে প্রকাশিত হচ্ছে। এটা উপর থেকে নীচে আসা। নীচে থেকে উপর দিকে যেতে গেলে প্রথম সব আলোর ভূমি পার হয়ে যাওয়া আর সমস্ত আলো যেখানে শেষ হচ্ছে সেই অনালোক ভূমিতে উত্তীর্ণ হওয়া।

যোগে আছে সম্প্রজ্ঞাত যোগ আর অসম্প্রজ্ঞাত যোগ। সম্প্রজ্ঞাত যোগ হচ্ছে আলো

হয়ে ফুটে ওঠা। কিন্তু সেটা শেষ নয়। তারপরে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ, অন্ধকারে পৌছান। আলো সেখান থেকে আসছে। বৌদ্ধেরা বলতেন, সেখানে কিছু আছে কিনা বলা যায় না। এটাই অরূপাবচর ভূমির শেষ স্তর। পুরাণে সেটাকে রূপক দিয়ে বোঝানো হয়েছে। রাধা আতপ, কৃষ্ণ ছায়া। বিষ্ণুর বুকে কৌস্তুভ মণি। বিষ্ণুর বুক নীল—ছায়া। আর কৌস্তুভ মণি জীবসমষ্টি বা জীবঘন। সেটা আলো। বিরাট অন্ধকারের মধ্যে আমাদের চেতনা যেন জোনাকির মতো জ্বলছে। দুটোকেই জানতে হবে। হিরণ্ময় পুরুষ, তার সামনের দিকে শুক্লভা আর পিছনের দিক পরঃকৃষ্ণ। পরঃকৃষ্ণে থাকা অনুভূতির চরম। বাসনার পর্যবসান পরঃকৃষ্ণ। সে কালোর ভিতর থেকে আলো ফোটে, আবার সব আলো কালোতে মিশে যায়। এটা মৃত্যুকে ভালবাসা।

ছায়াতপের বিশেষণগুলো দেওয়া হচ্ছে—তিনি কি করে আমাদের মাঝে রয়েছেন। তা যারা জানে তারা ব্রহ্মবিদ্। তারা জেনেছে হয় **পঞ্চাগ্নি** হয়ে, না হয় **ত্রিণাচিকেত** হয়ে। তার লৌকিক অর্থ, তিনবার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করে বা পঞ্চাগ্নি—ঘরে যে পাঁচটা আগুন প্রতিষ্ঠিত করা হতো, তার সেবা করে। পঞ্চাগ্নি—(১) আবসথ্য অগ্নি, এটা সাধারণ আগুন। বাড়ির চুলোতে যে আগুন জ্বালাই তার ভিতরে আমাদের ভোজ্যগুলোকে এক এক করে আহুতি দিয়ে তাকে প্রসাদ রূপে খাওয়া। (২) সভ্য বা সভেয় অগ্নি, সভাতে যে আগুন জ্বালানো হতো। গ্রীকদের মাঝেও এটা প্রচলিত ছিল। বসবার জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে রাখা হতো। এ দুটো লৌকিক অগ্নি—স্মার্ত যজ্ঞ। তারপরে যে আগুন তা বিশেষ করে জ্বালানো হতো, যখন শ্রৌতযজ্ঞ করা হতো, অমৃতত্ব লাভের জন্য। তিনটি আগুন ছিল। ১। আহবনীয়, ২। দক্ষিণ, ৩। গার্হপত্য। যজ্ঞ করবার সময় এগুলো বিশেষ অনুষ্ঠান করে জ্বালানো হতো। গার্হপত্য অগ্নি মানুষের অগ্নি। গৃহপতির জন্য আধারের আগুনকে বাইরে প্রতিষ্ঠিত করা। দক্ষিণাগ্নি পিতৃপুরুষের অগ্নি। আর আহবনীয় অগ্নি দেবতাদের, বা দিব্য অগ্নি।

এগুলো অধ্যাত্ম-সাধনার তিনটি ভঙ্গির সাথে জড়িত আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির অতীত রয়েছে। মর্ত্যলোকের অতীতে পিতৃপুরুষেরা আছেন, তাঁদের ঋণ আমাদের উপরে রয়েছে। একটা ভাবনা আছে, পিতৃগণ তত্ত্বের জ্ঞান পেয়েছেন কিন্তু আধারে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। সেটা সিদ্ধ করবার ভার তারা তাঁদের বংশজদের উপরে দিয়ে গেছেন। সেটাই আমাদের পিতৃঋণ। তাঁরা উপর থেকে শক্তি দেন, পিতৃলোক থেকে তাঁরা আমাদের অধ্যাত্মচেতনার স্ফুরণে সাহায্য করেন। 'বিজা' বলা হতো তাকে যার আধারে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হতো। যার কুলে এমন 'বিজা' উৎপন্ন হয়, সে বংশের লয় হয়ে যায়। আমাদের চলতি কথা আছে যদি কারো বংশে কেউ সিদ্ধিলাভ করে তাহলে চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যায়। তখন করবার আর কিছু থাকে না।

পিতৃলোকের ঊর্ধ্বে দেবলোক। সেখানে আলো আছে। তিনটি লোককে উপলক্ষ্য করে তিনটি আগুন জ্বালানো হতো। মর্ত্যলোকের জন্য গার্হপত্য, পিতৃলোকের জন্য দক্ষিণাগ্নি, ও দেবলোকের জন্য আহবনীয় অগ্নি।

তাই পাঁচটি আগুনের যারা উপাসনা করে তারা **পঞ্চাগ্নি**। তিনটি আগুনের উপাসনা বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক সাধনা। আর দুটির একটি গৃহকে নিয়ে আর একটি সমাজকে নিয়ে। এটা ব্যবহারিক যজ্ঞ।

ভিতরের দিকে **ত্রিণাচিকেত**—তিনটি গ্রন্থি ভেদ করা। ভূলোক থেকে অন্তরিক্ষে, অন্তরিক্ষ থেকে দ্যুলোকে আর দ্যুলোক থেকে স্বর্লোকে পৌছান। জাগ্রৎ থেকে স্বপ্ন, স্বপ্ন থেকে সুষুপ্তি, আর সুষুপ্তি থেকে তুরীয় অবস্থায় যাওয়া। দেহ থেকে প্রাণে, প্রাণ থেকে মনে, মন থেকে বিজ্ঞানে। এই রকম যারা উর্ধ্বে যায় তারা দেখতে পায় একদিকে আলো, আর একদিকে অন্ধকার। ভূলোকে অগ্নি, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎ, দ্যুলোকে সূর্য, তার উর্ধ্বে চন্দ্র এবং নক্ষত্র তারকা আর তার ওপরে ছায়াতপ। এগুলো ছায়াতপের ধাপ।

সে ছায়াতপ সর্বব্যাপী। যেমনি এলোকে তেমনি **পরমে পরার্ধেও** রয়েছে। এটা অখণ্ডভাবে সত্যকে প্রকাশিত করে। **সুকৃতস্য লোকঃ**—এখানে লোক আমাদের চেতনার অনুভূত ভূমি, আমরা যেখানে normally সাধারণত রয়েছি। দেহ-প্রাণ-মনের চেতনা। এটাকে অপরার্ধ বা অবরার্ধ বলে। 'তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে' একটা গোলকের অপরার্ধে দেহ-প্রাণ-মন আর পরার্ধে সৎ-চিৎ-আনন্দ। বৈদিক ভাষায় অবরার্ধে ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ। আর পরার্ধে জনঃ তপঃ-সত্য। দুটোর মাঝে সেতু রূপে আছে মহঃ। অপরার্ধে যে লোক তার সার্থকতা সুকৃতিতে। জীবনের লক্ষ্যের সঙ্গে গাঁথা যে কাজ, সে হল যজ্ঞ। সুকৃতির অর্থ যজ্ঞ। যজ্ঞ হচ্ছে আত্মোৎসর্গ। নিজের ভিতরে হোমানল জ্বালানো। যার শিখা তাঁর দিকে উদ্যত হবে। তার ফলে ঋতের আবির্ভাব হবে। 'ঋতং চ সত্যং চ'—ঋতম্ ঋতচ্ছন্দ—dynamism, সক্রিয়তা যার ভিতরে order, discipline ছন্দ, নিয়মশৃঙ্খলাবিধি রয়েছে। যেমন সূর্যের উদয়াস্ত, পৃথিবীর সূর্যের চারিদিকে ঘোরা। এই থেকে পর্যায়ক্রমে ঋতুগুলি দেখা দিয়েছে। এই সবই ঋত। আমাদের চলাতে অনৃত রয়েছে। যেটা জীবনের মিথ্যা, সেটা অনৃত। যেটা সত্য সেটা ঋত। জীবনে যে ছন্দের আবির্ভাব সে ঋত। এ মর্ত্যচেতনায় সুকৃতের যে ঋত—উৎসর্গভাবনার ফলে যে ঋত বা পুণ্যের আবির্ভাব হয় তার একটা রস রয়েছে। সে রসকে সেই ছায়াতপ পান করছে। এটাই হল **ঋতং পিবন্তৌ**। অর্থাৎ নিজেকে উৎসর্গ করা হলে তার ফলে সুষমার আবির্ভাবকে অনুভব করি, আর চেতনা নন্দিত হয়। তখন সে আনন্দ সমর্পণ করি ছায়াতপকে, যিনি আলো আর অন্ধকার। তিনি এখানে এসে সেটি পান করেন। এটাই দেবতার সোমপান। আমরাই সোমপাত্র। অগ্নিকে বলা হতো—'দ্রবিণোদা পিপীষতি', তাকে তিনি পান করছেন। তরল আগুনের স্রোত আমাদের সমস্ত নাড়ীতে বইয়ে দিচ্ছেন। ছায়াতপ পিপাসিত, আমাদের উৎসর্গের ফলে জীবনের যে সুষমা, সৌম্যসুধার স্ফুরণ, তাকে পান করার জন্য তিনি ব্যগ্র। এটা লৌকিক জীবনের কথা হল। পরার্ধে লোকোত্তর জীবন। সচ্চিদানন্দ হচ্ছেন জনঃ-তপঃ-সত্য। সত্য, সৃষ্টির তাপ আর সৃজনের আনন্দ। যিনি তপঃ, তিনি তপশ্চিৎ। তপই পরে চিৎ হয়েছেন আর জনঃ আনন্দ। সৎ-চিৎ-আনন্দ, সৎ-তপঃ-জনঃ। আমার এই সুকৃত—ঋত যা দেবতারা পান করছেন তার ভিতরে রয়েছে তাঁরই সিসৃক্ষা, তারই তপো বীর্য, তাঁরই আনন্দ। কিন্তু সে যে রয়েছে গভীরে, গুহায় প্রবেশ করে।

২।। নাচিকেত অগ্নি আমাদের মধ্যে জ্বলে উঠুক এই দৃঢ় সংকল্প যেন সকলের মধ্যে জাগে। দ্বিতীয় আর তৃতীয় বরের প্রাপ্তির মধ্যেও কোনো বিরোধ নেই। যে নিগূঢ় তত্ত্ব নচিকেতা তৃতীয় বরে পেয়েছে, নাচিকেত অগ্নি জ্বালিয়েও যে তা পাওয়া যেতে পারে, সেটা এই দুটি শ্লোক থেকে বোঝা যায়। এই **নাচিকেত** অগ্নি কি? যারা যজ্ঞ করছে তারা তার ভিতর দিয়ে বিকাশ লাভ করছে। তারা এগিয়ে যাচ্ছে পরমতত্ত্বের পানে। শেষে সেতুর

মতো তার সঙ্গে যে যোগস্থাপন করে, সে এই নাচিকেত অগ্নি। যখন নাচিকেত অগ্নি জ্বালাই তখন লক্ষ্য হবে ছায়াতপ। ছায়াতপের ছায়া অক্ষর অর্থাৎ পর ব্রহ্ম আর আতপ ক্ষর অর্থাৎ অবর ব্রহ্ম। অবর ব্রহ্ম থেকে পর ব্রহ্মে উত্তীর্ণ হতে হয়। যা সাধন তাই সাধ্য।

তিতীর্ষতাম্ অভয়ম্ পারম্—যারা পার হয়ে যেতে চায়, অন্ধকার থেকে আলোকে যেতে চায়, তারা অভয় পায় এই নাচিকেত অগ্নি দিয়ে।

এখানে কর্মকাণ্ড বা ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে পরমতত্ত্বের যোগ স্থাপনা করা হচ্ছে। সাধনার দিক দিয়ে বলতে গেলে নিজেকে অধর অরণি করে আর প্রণবকে বা মন্ত্রকে ঊর্ধ্ব অরণি করে আগুন-জ্বালানো, তাই হল নাচিকেত অগ্নি। তাতে সমস্ত পুড়ে আগুন হয়ে যাবে। আগুনই তপস্যা, সেটা তাঁর স্পর্শেরই জ্বালা। বরেণ্য ভর্গ—সে 'ভাজা ভাজা' মতন করে দেয়। তিনি ছুঁয়ে রয়েছেন, আর সেই স্পর্শে দেহ-প্রাণ-মন যেন জ্বলছে।

৩-৪।। আগের দুটি শ্লোকে mysticism রহস্যভাবনার কথা বলা হয়েছে। তা যদি না বুঝি তাহলে বুদ্ধি দিয়ে বোঝানো যায়। এখন তাই দার্শনিক ভাবনা আরম্ভ হচ্ছে। বিশ্লেষণ করে তত্ত্বকে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিশ্লেষণ সাংখ্য ভাবনার অনুসরণে।

আমাদের ভিতরে রয়েছে ভোক্তা। জ্ঞান আছে কিন্তু তাকেও খাটাই ভোগের জন্য। জীবনের গতিকে রথচলার সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে। এই রথের উপমা আমাদের অনেক শাস্ত্রে দেখা যায়। রথ, ঘোড়া, লাগাম, সারথি, রথী আর ক্ষেত্র, এই দিয়ে প্রাকৃত জীবনকে বোঝানো হচ্ছে। **গোচর** হচ্ছে field—মাঠ, 'ক্ষেত্র', জীবনের বিচিত্র **বিষয়**গুলি যাদের ভোগ করছি। সেই দিকে ঘুরছে **ইন্দ্রিয়**, তারা **হয়** ঘোড়া। ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রিত করছে মন, সে **প্রগ্রহ** লাগাম। ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়ের কাছে নিয়ে যাচ্ছে শরীরকে। তাই শরীর হচ্ছে **রথ**। লাগাম ধরে রয়েছে **বুদ্ধি**, সে **সারথি**, নিয়ন্ত্রিত করছে মনকে। সে কার এষণায়—প্রেষণায় সে দিকে যাচ্ছে? 'কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ'? যার প্রেষণায় সে যাচ্ছে তিনি **আত্মা**। আত্মাই **রথী**। এই রথের উপমা অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। পুরীতে যেমন রথযাত্রা। রথের মধ্যে যে বামন রয়েছেন—'অঙ্গুষ্ঠ-মাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ'—সেই রথস্থ বামনকে দেখলে আর পুনর্জন্ম হয় না। বৈদিক সমস্ত দেবতাই রথী। দেবতাই রথী দেবতাই সারথি। আমাদের দেহ রথ, তিনি রথী। তিনি 'পুর এতা'—তিনি পথ দেখিয়ে চলেছেন। এখানে আমাদের আধারের উপাদানগুলিকে এক এক করে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেহ, ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন, বুদ্ধি আর আত্মা।

৫।। যে **অবিজ্ঞানী** তার দেহরথ বেচাল চলে। যেমন যে সারথির **অশ্ব** ঘোড়াগুলো **দুষ্ট** হয়, শাসন মানে না, তেমনি অবিজ্ঞানী মানুষের ইন্দ্রিয়গুলো বশের বাইরে চলে যায়। তার মন **অযুক্ত** হয়, তার ভিতরে বিজ্ঞানের অভাব থাকে।

সাধনাতে প্রথমেই দরকার ইন্দ্রিয়-সংযম। ইন্দ্রিয় আমাকে বিষয়ের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে যায়। তাকে প্রত্যাহার করে আমার ভিতরে গুটিয়ে নিতে হবে। বিষয় থেকে আনন্দ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে আত্মার দিকে ফিরিয়ে আনতে হবে। এইটাই যুক্ত মন বা মনোযোগ। অযুক্ত মন বাইরের দিকে নিয়ে যায়। আর একটি হচ্ছে বিজ্ঞান। এদুটি পরস্পর-সম্পৃক্ত। মনোযোগ—ঋগ্‌বেদে আছে 'মনোযুজা'—ইষ্টের ভাবনায় মনের সমস্ত ভাবনাকে যুক্ত করা। চিত্ত শূন্য না হতে পারে কিন্তু ইষ্টের ভিতরে বৃত্তিগুলিকে যুক্ত করতে পারি। যদি সে ইষ্ট 'আতপ' হয়, সমস্ত ভাবনায় আলো ফুটবে। আর যদি ছায়া হয় তাহলে প্রত্যেক

ভাবনার পিছনে অন্ধকার—শূন্য আসবে। ঋগ্‌বেদে যুক্ত বিজ্ঞানীকে কোথাও কোথাও ধীর বলা হয়েছে। মনের ঊর্ধ্বে বিজ্ঞানের স্থান। মন পায় বিষয়ের জ্ঞান কিন্তু তার জ্ঞান পরোক্ষ। অপরোক্ষ জ্ঞান বিজ্ঞান। আমাদের ভিতরের চেতনাকে পাঁচটি কোষে ভাগ করা হয়েছে। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় এবং তার ওপারে বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। মন থেকে বিজ্ঞানে উত্তীর্ণ হওয়া, এটা হচ্ছে প্রথম ধাপ। যাকে Intuition স্বজ্ঞা বা প্রাতিভসংবিত্ বলে, তাকে বিজ্ঞান বলতে পারি। শ্রদ্ধা বিজ্ঞানেরই একটি বৃত্তি। যখন শ্রদ্ধা জাগে ইষ্টের বোধ হয়। বোধে বোধ জাগে। এই বোধই বিজ্ঞান। এই বোধ আনতে পারি তারই যাকে আমরা খুব কাছে পাই। যেমন আমাদের দেহের বোধ। এই দেহবোধ দিয়ে যদি তাঁকে বোধ করি—তিনি যেন আমাকে আবিষ্ট করে রয়েছেন জ্বরের তাপের মতন, তাহলে সেটা হবে বিজ্ঞানের প্রথম ধাপ। আলোরূপে যখন এ বোধ বা বিজ্ঞান পাই তখন দেহবোধ সূক্ষ্ম হবে, উজ্জ্বল হবে। তাতে সে বিজ্ঞান স্ফূর্ত হবে। মন যে নানা বিষয়ে বিচরণ করছে তারা যেন পর্যবসিত হচ্ছে পরম তত্ত্বে। তার বোধ করা বিজ্ঞান। এই চিন্ময় বোধে ইন্দ্রিয়গুলো সংযুক্ত হয়। যার মধ্যে বিজ্ঞান ফোটেনি—প্রত্যক্ষ অনুভব যার হয়নি তার সত্যিকার অনুভব হয়নি। 'প্রতিবোধবিদিতং মতম্'—আমার প্রত্যেক বোধের মাঝে তিনি প্রতিবোধ রূপে আলোর ঝলকের মতন রয়েছেন। আমি আছি এ বোধও তিনিই। এই বোধের অধীন ইন্দ্রিয় মন ইত্যাদি। তাঁকে দর্শন করা, তাঁকে ভাবে আনা, তাঁরই স্মৃতি নিয়ে বিচরণ করা, তাঁর বোধ জাগানো, বিজ্ঞানবান্ হওয়া, আমার অন্তরতম বলি যাকে, সে যে তিনি, এই সম্বন্ধে সচেতন হওয়া—এটিই সাধনা।

৬।। অসাধকের কথা আগে বলা হয়েছে। এখানে সাধকের কথা বলা হচ্ছে। **বিজ্ঞানবান**, যে বোধ করেছে, তার মন **যুক্ত** হবে, আর তার ইন্দ্রিয় **সদশ্বের** মতন, ভালো ঘোড়া অর্থাৎ trained horse এর মতন বশে থাকবে।

৭।। **অশুচি**—অশৌচ হচ্ছে কোনো অনাত্ম বস্তুকে আত্মবস্তু বলে মনে করা। এটা করলে অশুচি হয়। জল নির্মল, কিন্তু যে জল নয় তার সঙ্গে যদি সে যুক্ত হয় তাহলে জল অশুচি হয়। আমাদের ভিতরটা স্বভাবত আকাশের মতন স্বচ্ছ। তাতে যদি একটা মেঘ আসে, তাহলে সে আকাশকে অশুচি করবে। আকাশ শুচি, কিন্তু মেঘ তার ভিতরে বিজাতীয় বা foreign তত্ত্ব। অনাত্ম বস্তুতে আত্মভাবের সংমিশ্রণ ঘটানোই অশুচিতা। অনাত্ম বস্তুকে যদি আত্মসাৎ করতে পারি, তাহলে তা শুচি হয়ে যাবে। অগ্নি শুক্রজ্যোতি—শুক্র থেকে শুক্ল হয়েছে। অগ্নিকে পাবক বলা হতো, এটা একটা প্রাচীন সংজ্ঞা। পাবক মানে যে সমস্ত বস্তুকে পবিত্র করে। আগুনে কাঠ দিলে কাঠ আগুন হয়ে যায়। আগুনের সঙ্গে কাঠের স্বভাবজাত বিরোধ আছে। কাঠ জড়, শীতল। কাঠ আগুনে পুড়ে আগুন হবে, তখন সে শুচি হবে। যদি সমস্ত কিছুকে অগ্নিসাৎ করি, তাহলে অশুচি বলে কিছু নেই। এটাই আত্মসংমিশ্রণ।

ভিতরে সব সময় সে আগুন জ্বলছে, তার স্পর্শে যা আসছে সেও আগুন হয়ে যাচ্ছে। এখন বিষয়কে গ্রহণ করছি ইন্দ্রিয় দিয়ে। আমাদের মাঝে আনন্দ গ্রহণ করবার যে উপায় বা করণ রয়েছে, সে যদি বিশুদ্ধ হয়, তাহলে বিষয়গুলো শুচি হয়ে যাবে। যেমন খাওয়া। এখানে অন্ন যেন আহুতি। আমার ভিতরে যে অগ্নি বৈশ্বানর রয়েছেন তাঁকে আহুতি দিচ্ছি। খাওয়ার যে আনন্দ সে আমার আনন্দ নয়, তাঁরই আনন্দ। প্রসাদ ভক্ষণের সময়

আর একটা ভাব জাগে, সাধারণ খাবারের সঙ্গে তার তুলনা করি না। আমি এমন কিছু খাচ্ছি, যাতে আমার ভিতরটা পুষ্ট হচ্ছে, নির্মল হচ্ছে। শুচিত্বের ভাবনা অগ্নি-ভাবনার সঙ্গে জড়িত আছে, তাই গীতাতে পঞ্চম অধ্যায়ে আন্তর হোমের কথা আছে। আমার সব কিছু তাতে আহুতি দিচ্ছি, হোম করছি।

যে **অমনস্ক**, যে **অবিজ্ঞানবান্**, তাদাত্ম্যের ভাব যার ভিতরে জাগেনি, যার ভিতরে সমস্ত অগ্নিসাৎ হয়নি, তার সত্তা মলিন। যদি বিজ্ঞানবান্ সমনস্ক আর শুচি হতে না পারি, তাহলে একটা চক্রের মাঝে আবর্তন করতে পারি। বারবার সংসারে আসি। ছায়াতপ লোককে পাই না।

৮।। উল্টো দিক দিয়ে দেখানো হচ্ছে। যে **বিজ্ঞানবান্** সে এরকম ভূমিতে পৌঁছচ্ছে, যেখান থেকে আর তাকে জন্মগ্রহণ করতে হবে না। জন্ম মানে আবার ফিরে আসা। যদি সঙ্কর্ষণের বাইরে চলে যেতে পারি, তাহলে আর ফিরে আসি না। কিন্তু যদি ঘুড়ির মতন থাকি তাহলে সুতোর সঙ্কর্ষণে আবার ফিরে আসতে হবে। মাধ্যাকর্ষণ যদি পার হয়ে যেতে পারি তাহলে আমি আর জগতে ফিরে আসি না। জগৎ আমার ভিতরে আসে।

সমনস্ক সব সময় তাঁকেই ভাবছি। **সদাশুচি** সমস্ত বিষয় তার মাঝে প্রত্যাহৃত হয়ে, চিদগ্নিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

৯।। একই কথা চলছে। বিজ্ঞানের ওপরে খুব জোর দেওয়া হচ্ছে। বুদ্ধি, তত্ত্ব, বিজ্ঞান তত্ত্ব এক। বুদ্ধি— বোধ, ভিতরে আগুন জ্বালানো। তার থেকে প্রবোধন—কাউকে জাগিয়ে তোলা, জ্বালিয়ে তোলা। এখানে বুদ্ধি হচ্ছে intuition প্রাতিভসংবিৎ, intelligence মগজী জ্ঞান নয়। রামকৃষ্ণ যাকে বলতেন বোধে বোধ হওয়া। সবচেয়ে নিবিড় বোধ হচ্ছে দেহবোধ। এই দেহবোধ তিনিই। এইভাবে তাঁকে পাওয়া। এই বোধ যখন জাগে তখন **মন প্রগহবান্** হয়, লাগাম টেনে ধরে। আমার মাঝে তখন আত্মরতি— অফুরন্ত উৎসাহ জাগে। এটা থেকে 'আত্মারাম'—তিনি রয়েছেন হৃদয়ে সত্তাকে জড়িয়ে, এই ভাব যখন আসে, তখন ইন্দ্রিয় অন্তর্মুখী হয়, বিষয়কে সমর্পণ করে আত্মাতে। **অধ্বনঃ** দীর্ঘপথের ওপারে আছে **বিষ্ণুর পরমপদ**। বিষ্ণু মাধ্যন্দিন সূর্য। বিষ্ণুর পরমপদ হেলে পড়ে না। ঊর্ধ্বদিকে চেতনা shoot করে, বিচ্ছুরিত হয়। চেতনাকে সূর্যোদয়ের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। এই রকম সাধক অনন্তকে পায়, স্বর্লোককে পায়।

১০।। আমাদের জীবনের উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। পরে সাংখ্যদর্শনের ধারা ধরে আরও সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে উপাদানগুলিকে ঠিক সাংখ্যের মতন দেখানো হয়নি, একটু তফাৎ আছে।

প্রথম—অর্থ Objective world, Material world, বিষয়ের জগৎ। তারপর ইন্দ্রিয় জগৎ, তারপর মনের জগৎ। অর্থ ইন্দ্রিয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তার তাৎপর্য এই—অর্থের জগৎ objective world হল আমাদের জীবনের ভিত্তি। তত্ত্ব হিসাবে এই objective world-কেই আগে রাখা উচিত ছিল, কিন্তু এখানে প্রথম ইন্দ্রিয় তারপরে অর্থ বলা হয়েছে। সাংখ্যে অনাত্ম জগতের সঙ্গে আত্মার বিবেক করা হয়েছে। তাদের ভিতর একটা বিরোধ দেখা যায়। আত্মা ও অনাত্মা দুইএর মাঝে অবিবেক আছে। অনাত্মা থেকে আত্মাকে বিবিক্ত করাই সাধনা। অনাত্ম জড়। আত্মা চিৎস্বরূপ। জড় ও চৈতন্যে তফাৎ করতে শিখতে হয় অথচ জড়ই জীবনের ভিত্তি। জড়ই মূল, তা থেকে ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ইত্যাদি দেখা দিয়েছে।

এই উপনিষদে objective world ও subjective world এর একটা সমন্বয় দেখা যায়।

আমাদের প্রাকৃত মনের আরম্ভ হয় **ইন্দ্রিয়** দিয়ে। এখানে প্রাণের কথা বলা হয়নি, সাংখ্যেও নেই। প্রাণের স্থান ইন্দ্রিয় নিয়েছে। সাংখ্যের ধারা বা scheme হচ্ছে পঞ্চমহাভূত—এটাই 'অর্থ'। এই পঞ্চমহাভূতগুলিকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে স্থূল ও সূক্ষ্ম। পঞ্চ স্থূল ভূত হচ্ছে, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ বা বায়ু, আর ব্যোম বা আকাশ। আর পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত হচ্ছে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ। স্থূলভূতের সঙ্গে চেতনার যোগ হয় যখন, তখন গুণের প্রকাশ হয়। তারাই সূক্ষ্ম ভূত। এগুলিকে তন্মাত্র বলা হয়েছে। তাদেরও ভূতের মধ্যে রাখা হয়েছে। এর অর্থ এইভাবে বোঝা যেতে পারে, আমরা কোনো একটি বিষয়কে ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ করি যখন, তখন বিষয় একদিকে যেমন বাইরে থাকে তেমনি আবার আমার ভিতরেও ফুটে ওঠে। যেমন তেজ—বাইরের তেজোময় বস্তু আমাদের ভিতরে রূপ হয়ে ফোটে। এটা জড়েরই একটা রূপান্তর। বাইরে পঞ্চমহাভূতের objective world, ভিতরে ঠিক তেমনই subjective world। 'তন্মাত্র' শব্দ সাধনার দিক দিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে। বাইরের সব ব্যামিশ্র ভাবে রয়েছে। যেমন একটা ফল যদি দেখি তার রূপ, রস, স্পর্শ ইত্যাদি মিশে রয়েছে। যখন তাকে ভিতরে গ্রহণ করি তখন কখনও রূপকে, কখনও রসকে বা গন্ধকে, কিংবা দুটি তিনটিকে মিশিয়ে গ্রহণ করতে পারি। এখন আমি যদি চাই শুধু রূপকে গ্রহণ করব তাহলে এটা হবে রূপের তন্মাত্র। এইরকম অভ্যাসের ফলে আসে সবিচার সমাপত্তি। আর তার পরে আসে universal রূপ বা রূপসামান্যকে গ্রহণ করবার ক্ষমতা। রূপ শুধু রূপই, তার সঙ্গে অন্যকিছুর মিশ্রণ নেই। সাধারণত আমরা দুটিকে এক সঙ্গে ভাবি, যেমন চিনির মিষ্টত্ব এবং রূপ। সাধনাতে তা না করে আমরা ভাবব শুধু তার মিষ্টত্বকে বা শুধু শুভ্রতাকে। তখন এই বোধ আসবে যে একটা বিশ্বব্যাপী রস বা শুভ্রতা রয়েছে, তারই একটি রূপ এই চিনিতে। এইরকম প্রত্যেক বস্তুতে তার তন্মাত্রকে অনুশীলন করলে তার সামান্য জ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছে যাব। আর তার ফলে কোনো একটি বিশেষ বস্তুর প্রতি আকর্ষণ কমবে।

জড় বিশ্ব রয়েছে, তারি মাঝে একটা গ্রাহ্যতা রয়েছে, একটা শক্তির potentiality রয়েছে, যার জন্য সে চৈতন্যের গ্রাহ্য হতে পারে। জড়ের সত্তা এবং তার গ্রাহ্যতা—দুটি মিলে তার অর্থ। একসময় জগৎ শুধুই অর্থময়। যখন তার মধ্যে চিন্ময়ের প্রবেশ হয় তখন তার মধ্যে গ্রাহ্যতা দেখা দেয়। যখন মানুষ ছিল না, চোখ ছিল না, দেখবার কেউ ছিল না, তখন রং-এর খেলা ছিল। কিন্তু যখন সে চৈতন্যের গ্রাহ্য হচ্ছে তখন তার একটি বিশিষ্ট রূপ দেখা দিচ্ছে। এই যে রং দেখা দিচ্ছে—সে হচ্ছে একটা বিদ্যুৎ স্পন্দন, তার শক্তির স্পন্দ—সেটা নিত্য, জড়। সেই শক্তির স্পন্দ যখন চোখের সামনে দেখি, তখনই গোলাপী রং বা অন্য রং-এর রূপ দেখা দেয়। একদিকে primary quality শক্তির স্পন্দ—সে যখন আমার চোখের সামনে ফুটল তখনই তার বিশেষ রূপ দেখা দিল। বলতে গেলে এটাই 'অর্থ'। চেতনার সংস্পর্শে না এলে অর্থ ঠিক অর্থ হয় না। থাকলেও গ্রাহ্য হয় না। Primary quality স্থূলভূত—secondary quality সূক্ষ্মভূত।

জড় আগে, চৈতন্য পরে দেখা দিয়েছে একথা মানলেও অসুবিধা কিছু নেই। অর্থের যে জগৎ,—তার মূলে জড়বস্তু আগে ছিল, তারপরে ইন্দ্রিয় দেখা দিয়েছে। যে পরে দেখা দেয় সে ঈশ্বর হয়ে যায়। জড়ই মৌল উপাদান। সেই জড়ের মাঝে চৈতন্যের উদ্ভব হল।

'ভূতেভ্যঃ ইন্দ্রিয়াণি'—matter থেকে life,—এটা চার্বাকের মত, Materialistদের মত। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরও এই মত। কিন্তু যখন ভূত থেকে ইন্দ্রিয় জাগল তখন সেই ইন্দ্রিয় ভূতকে শাসন করতে লাগল। এটাই চৈতন্যের বৈশিষ্ট্য। আমাদের জীবন যদি সত্য, তাহলে তাতে চৈতন্যের উন্মেষ হওয়াটাই জীবনের সবচেয়ে বড় তাৎপর্য। চৈতন্য উন্মেষিত হয়েছে, তাকে বিদ্ধ করেছে, এটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার। জড়ের উপর কর্তৃত্ব আনাই চৈতন্যের কাজ। জড় যদি বা চৈতন্য প্রকাশের আগেও ছিল, তা সত্ত্বেও চৈতন্য তাকে dominate নিয়ন্ত্রণ করে। জড় আগে ছিল, আর তাতেই চৈতন্যের উৎকর্ষ হয়েছে, Materialistরা এটাকে খুব বড় করে দেখেন। এঁরা বলেন, জড়ই যদি না থাকত, চৈতন্য আসত কোথায়? মাটি যদি না থাকত তাহলে ফুল কোথা থেকে আসত? তাই তাঁরা বলেন, চৈতন্যের সাধনা, ধর্মের সাধনা কাল্পনিক ও নিরর্থক। কিন্তু সেটা ভুল। আমরা সব সময় জীবনে values মূল্য বা তাৎপর্যকে খুঁজি। আমরা সবাই একদিকে idealist ভাববাদী, যেখানে বিশুদ্ধ জড় সেখানে ভাল মন্দের কথা ওঠে না। সমস্ত idealism ভাববাদের মূল হচ্ছে এই যে, জীবনে আমরা একটা উৎকর্ষ খুঁজছি। আমরা জড়বাদীই হই আর চৈতন্যবাদীই হই আমরা সব সময় জীবনে নতুন values মূল্য বা তাৎপর্য খুঁজি। জড় মূল কিন্তু তাকে অবলম্বন করে যে ভাব জাগে সে এই জড়েরই প্রশাস্তা হয়, আর এই ভাবের উন্মেষ ঘটানোই আমাদের কর্তব্য।

প্রথম বলা হয়েছে ইন্দ্রিয় থেকে জড় বড়, ফুলের চেয়ে মাটি বড়। উপনিষদ এটা স্বীকার করে নিচ্ছে কিন্তু তারপর ধারাটা বদলে যাচ্ছে, আর বলছে ইন্দ্রিয় আর অর্থ থেকে **মন** বড়। এখানে চিদ্-উন্মেষের কথা। মন থেকে **বুদ্ধি** বড়, বুদ্ধি থেকে **মহান্**। মহান্ থেকে **অব্যক্ত** আর অব্যক্ত থেকে **পুরুষ** বড়। এখানে জড়বাদ আর চিদ্‌বাদে একটা আশ্চর্য সমন্বয় করা হয়েছে। জড়বাদীর দেহ জড় কিন্তু সে শুধু জড় দেহ নিয়ে ব্যস্ত থাকে না—সেও এগিয়ে যেতে চায়, ইন্দ্রিয়গুলিকে strong শক্ত করতে চায়, মনের শক্তি বাড়াতে চায়, বুদ্ধিমান হতে চায়। জড়বাদীরা কিন্তু এখানে আটকে যায়। জড়কে ভিত্তি করে চেতনার উৎকর্ষ, কিন্তু সে-পর্যন্ত তারা যেতে চায় না। যারা চিন্ময়বাদী তারা আরও এগিয়ে যায়। তারা বলবে আমি মহান্, আমি অব্যক্ত, আমি পুরুষ।

প্রথম অর্থতত্ত্ব, তার মাঝে স্থূল আর সূক্ষ্ম। তারপরে ইন্দ্রিয় তত্ত্ব। সাংখ্যে একাদশ ইন্দ্রিয় বলা হয়েছে। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, তারপর মন। প্রথমে দেখা দেয় কর্মেন্দ্রিয়, এটা বাইরের জগতের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতের ব্যাপার। নিম্ন প্রাণীজগতে এটা ভাল করে দেখা যায়। এখানে বোধ খুব কম কিন্তু কর্মেন্দ্রিয় বেশ প্রবল আছে। প্রথমে প্রাণের একটা ক্ষোভ জগতের ওপর দেখা দেয়, তার থেকে ভিতরের ইন্দ্রিয়গুলি জাগে। প্রথম খাদ্যবস্তু ইত্যাদি শুধু ছিল, এর মাঝে যদি রূপ গন্ধ দেখা দেয় তাহলে আর একটা জগৎ দেখা দেবে যেটা ভাবের জগতের প্রান্তভাগে। এটা অন্তরিন্দ্রিয়ের জগৎ। এ সমস্তকে ভাবের ব্যাপার করবার জন্য দেখা দিল মন। মানুষের ভিতরে তার সবচেয়ে বেশি উৎকর্ষ ঘটেছে। বাইরে যা ঘটে তার পুনরাবৃত্তি করে তার সম্ভোগ সে ভিতরে ভিতরে করতে পারে। মনের পরে বুদ্ধি। মন অনেক পশুরও রয়েছে কিন্তু মন একটা বস্তুকে গ্রহণ করলে তার বিশেষ রূপকেই ধরতে পারে। তার দেখা বিচ্ছিন্ন করে টুকরো টুকরো করে দেখা। বস্তুকে সে সমগ্রভাবে দেখতে পারে না। কোনো judgement সে pass করতে পারে না,

কোনো বিষয়ে রায় দিতে পারে না। বুদ্ধি সমগ্রভাবে গ্রহণ করতে পারে। আর একটা ব্যাপার হয়—রূপ-আদি বোধের তন্ময়তা। এটা বুদ্ধিরই, বোধেরই ব্যাপার। মন সামগ্রীগুলি এনে দেয়। এই মনের আহরণের বিষয় বুদ্ধির উপাদান হয়, সেটা থেকে বুদ্ধি একটা higher ঊর্ধ্বতর জগৎ আবিষ্কার করে। এটা ব্যক্তির নিজস্ব জগৎ। স্মৃতি থেকে যে ভাব জাগে, তার থেকে একটা তন্ময়তা এসে গেলে তা থেকে আর একটা উৎকর্ষ হবে। এই যে আমার সৌন্দর্যবোধ, সেটা একটা অসীম সৌন্দর্যেরই প্রতিবিম্ব মাত্র। এটা একটা universal সামান্য বা সার্বভৌম জ্ঞান। এটা জাগলে আমি দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক কিংবা কবি হতে পারি। এখান থেকে অধ্যাত্মচেতনার আরম্ভ।

সব দিকে বৃহৎকেই দেখছি। যা কিছু আমার সামনে আসছে তাকে বৃহৎ করেই দেখছি। সেটা চিত্তের উৎকর্ষ, একটা উচ্চ অবস্থা। এটাকেই মহান্ বলা হয়েছে। সাংখ্যে এটাকে মহত্তত্ত্ব বলা হয়েছে। সাংখ্যে মনের পর অহং-তত্ত্বকে স্থান দেওয়া হয়েছে, তার পরে মহৎ। কিন্তু এখানে মনের পর বুদ্ধি, তার পরে মহান্। ব্যষ্টি-মন উৎকৃষ্ট হচ্ছে বুদ্ধিতে, তার চেয়ে উৎকৃষ্ট মহান। ভাবের ভিতরে মহাভাব, তখন চেতনার প্রসার ঘটে। ফুলের মাঝে যদি অসীমের সৌন্দর্য দেখি, তাহলে মহান্ তত্ত্বকে পেলাম। রামকৃষ্ণ যখন একটি মেয়েকে দেখলেন, তার ভিতরে তিনি জগন্মাতাকে দেখলেন। সেটাই মহান্ ভাব। বুদ্ধি দিয়ে আমরা সব করতে পারি কিন্তু তার ভিতরে অধ্যাত্ম ভাব আনতে পারে ওই মহৎ।

সাংখ্যের দৃষ্টি ঠিক এ নয়। উপনিষদের দৃষ্টি synthetic সমন্বয়ী, সংশ্লেষণী, সাংখ্য analytic বিশ্লেষণী। তাই জড় এবং চৈতন্যকে তাঁরা আলাদা রেখেছেন। কিন্তু এখানে জড় এবং চৈতন্যকে মিশিয়ে দেখা হচ্ছে। চৈতন্যের উৎকর্ষের দিক থেকে তাই মহান্ হচ্ছে এই আত্মা। সাংখ্যরা মহৎকেও জড় বলেছেন। এখানে বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকদের সঙ্গে অধ্যাত্মপুরুষের difference পার্থক্য আসে। সৌন্দর্য জগতে রয়েছে কিন্তু সেটা একটা সর্বব্যাপী সৌন্দর্য থেকে এসেছে, সেটা বলতে পারি এই মহৎ-ই।

এই মহৎ যার একদেশ, সে হল অব্যক্ত। সৌন্দর্যের রূপের যে অভিব্যক্তি সেটা পরিপূর্ণ অভিব্যক্তির একটা রূপ মাত্র। সে শুধু সৌন্দর্যেরই অভিব্যক্তি। তা মহানের অভিব্যক্তি হতে পারে, কিন্তু যে কোনো বস্তুকে যদি আমরা একদিক দিয়ে দেখি, তাহলে তার পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। ভগবানকে যদি আমি একদিক দিয়ে দেখি তাহলে তার পূর্ণজ্ঞান হয় না। মহত্তত্ত্ব হচ্ছে ইতিভাবনার উৎকর্ষ। কিন্তু তাতে সব বলা হয়নি। তার পিছনে একটা কিছু রয়েছে যাকে আমরা আভাসে জানি কিন্তু ব্যক্ত করতে পারি না। এই আভাস-তত্ত্ব অব্যক্ত।

সাংখ্যেরা বলেছেন প্রকৃতি আর বলেছেন এটা জড়। কিন্তু এখানে সে জড় নয়, সে অব্যক্ত আত্মা, অব্যক্ত পুরুষ। যে manifest ব্যক্ত বা প্রকট সে **মহান**, যে unmanifest অপ্রকট সে **অব্যক্ত**। যদি প্রকাশ রূপে দেখি, প্রকাশ হচ্ছে মহান্, আর ছায়াতপ রূপে তার পিছনে রয়েছে অব্যক্ত। সাংখ্যেরা বলেন প্রকৃতি থেকে মহৎ। এখানে বলা হয়েছে অব্যক্ত থেকে মহান্। মহাকাশের যে শূন্যতা তাতে ফুটে উঠবে সূর্য, বরুণের বুকে মিত্র। কিছুই নেই, তা থেকে ফুটে উঠবে পূর্ণতা।

তার উপরে আর একটি তত্ত্ব রয়েছে সে হচ্ছে **পুরুষ**, যিনি মহান্ এবং অব্যক্ত দুটোকেই এক সঙ্গে ধারণ করে আছেন, তার উপরে কিছু নেই। **সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ**।

সাংখ্যে বিবেকদৃষ্টি বলা হয়েছে। পুরুষই একমাত্র চিৎ। তার পাশে প্রকৃতি জড়। পুরুষের গ্রাহ্য বলে প্রকৃতি অচেতন। এই প্রকৃতি থেকে মহৎ ইত্যাদির সৃষ্টি।

অর্থ থেকে আরম্ভ করব কিন্তু যে পর্যন্ত অব্যক্তের রহস্য না জানব, সে পর্যন্ত শেষ নাই। ফুল বস্তু, তারপর তার রূপ, তাকে ইন্দ্রিয় করছে মনোগ্রাহ্য। তখন বস্তু-সত্তা বুদ্ধির কাছে ভাবরূপে দাঁড়ায়, মহত্ তাকে অসীম মহাভাব পর্যন্ত নিয়ে যায়; তার পরে অব্যক্ত; তারও পরে পুরুষ। অন্তের মাঝে অনন্ত রয়েছে। এটাই উপনিষদের দৃষ্টি।

১২।। এই যে পুরুষ **গূঢ়-আত্মা সর্বেষু ভূতেষু ন প্রকাশতে**। একদিক দিয়ে ভূত আদিম বটে, কিন্তু প্রত্যেক ভূতে নিগূঢ় রয়েছে পুরুষ। কিন্তু 'ন প্রকাশতে'— প্রকাশ পায় না। যা জড়ের মাঝে ফুটেছে সে তার ভিতরেই নিহিত রয়েছে। একটা ধূলিকণার মাঝেও পুরুষ বা চিৎশক্তি নিহিত রয়েছে।

বৌদ্ধরা বলেছিলেন, জগতে যা কিছু আছে, সব সম্বুদ্ধ হয়ে উঠবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তা হচ্ছে না ততক্ষণ পর্যন্ত যিনি সম্যক্ সম্বুদ্ধ তিনি নির্বাণ পেয়েও তাকে গ্রহণ করবেন না। **অগ্র্যায়া বুদ্ধ্যা** বুদ্ধি দিয়েও তাকে জানা যায়। বুদ্ধির একটা গতি জড়ের দিকে। যে বুদ্ধিমান, সে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক বা কবি সব কিছু হতে পারে। কিন্তু সে আধ্যাত্মিক নাও হতে পারে। 'অগ্র্যায়া'—তীক্ষ্ণ, সে সামনের দিকে যাচ্ছে। স্থূলভাবে দেখা তীক্ষ্ণবুদ্ধির লক্ষণ নয়। কিন্তু বুদ্ধি যদি সূক্ষ্ম হয়, সে যদি বিষয়ের মাঝে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যেতে পারে, তাহলে সে আবিষ্কার করবে সেই নিহিত তত্ত্বকে, যে মহৎ, যে গূঢ়, যে আত্মা।

কোনো একটা বস্তুকে ভাবরূপে গ্রহণ করলাম, তাকে যদি কোনো লৌকিক ব্যাপারে প্রযোজিত না করি আর যদি সে ভাবকে ভাবরূপে দেখে তাতে বুদ্ধিকে লীন করি, তাহলে তার থেকে মহান্‌কে পাব। সেখান থেকে অব্যক্তকে পাব, অব্যক্ত থেকে পুরুষকে পাব।

বিষয়মুখী বুদ্ধি গুণময়ী হয়। সে ভাব নিয়ে থাকে, কিন্তু অগ্র্যা নয়। কিন্তু অগ্র্যা যে বুদ্ধি, তার ভাব থেকে ফোটে মহিমা, ফোটে রহস্য।

পতঞ্জলি এটা থেকে যোগবিজ্ঞান রচনা করেছেন। যে বুদ্ধির অনুপ্রবেশ সিদ্ধ করেছে, বুদ্ধিকে ভাবে লয় করতে শিখেছে, তার ভিতর দিয়ে মহিমা এবং রহস্য ফোটে, পুরুষও ফোটে। এভাবে পুরুষের সাক্ষাৎকার করা যায় নিজের মাঝে এবং পরের মাঝে। যখন নিজের মাঝে সাক্ষাৎকার করি তখন গুরু-শক্তির আবির্ভাব হয়, আর তখন যেমনি স্বদেহে তেমনি পরদেহেও তাকে সাক্ষাৎ করতে পারি। এ ভাবে আত্মাকে সমস্ত ভূতে নিগূঢ় রূপে দর্শন করা যেতে পারে। তখন যে দর্শন আসে সে হয় স্বচ্ছ এবং অপরোক্ষ। এটাই সর্বভূতে আত্মদর্শন সব সময় ভাবে থাকা। বুদ্ধিকে তাতে নিশ্চল করা।

১৩।। **প্রাজ্ঞ** যিনি প্রজ্ঞার সাধক। তিনি বাক্‌কে মনে নিয়ত করবেন। মনকে জ্ঞানাত্মায় আর জ্ঞানাত্মাকে মহতে আর মহৎকে শান্ত আত্মাতে নিয়ত করবেন। নিয়ত করা মানে লীন করা।

দুটো জগৎ, একটা বাকের জগৎ আরেকটা মনের জগৎ। এখানে সাধনার সূত্র সূক্ষ্ম করে বলা হচ্ছে। বাকের জগৎ দু-প্রকারের। একটা বৈখরী জগৎ, মনকে বাইরের দিকে বিক্ষেপ করছে। এটাকে নিরুদ্ধ করা যায়। কিন্তু বাকের অন্তর্জগৎ রয়েছে। নিজের ভিতরে দেখি, যখন কোনো একটা কথা ভাবি, তখন যেন বাক্ দিয়েই ভাবি। যখন তাড়াতাড়ি ভাবি, তখন বাক্ কমতে আরম্ভ করে। ভাবনা যখন দ্রুত হয় তখন flash-এর মতন এক

ঝলকে সব points গুলো বিষয়গুলো ছুঁয়ে যাচ্ছে। এটা সূক্ষ্মতম বাকের ক্রিয়া। তার পরে আরম্ভ হয় বোধের ক্রিয়া। বাকের অন্তর্জগৎ, ভিতরে যে বাক ফুটতে থাকে তাকেও যদি প্রশাসন করি তখন বোধ ফোটে। যখন বোধ ফোটে তখন বক্তব্যের মূলে কি, তার সুস্পষ্ট অনুভব হয়। এখানে মন থাকে কিন্তু সে শুধু উপলক্ষ্যের মতন। মন আর বুদ্ধি দুটি আলাদা জিনিস। যদি কিছু বিশেষকে ভাব রূপে গ্রহণ করি তখন বাক্ থাকে না। যখন আমরা একটা গাছকে দেখি তখন দেখার জন্য বাকের দরকার পড়ছে না। একটা সংস্কার অবশ্য আছে যেটাকে সংজ্ঞা-বিশেষ বলে, সে মনের মাঝে একটা আকৃতি এনে দেয়। কিন্তু যদি vacant mind শূন্য মন দিয়ে দেখি, তখন ভাষার কোনো দরকার নেই। কিন্তু যখন অপরকে তা দেখাতে চাই, তখন বাকের দরকার পড়ে। প্রত্যক্ষ দর্শনে বাক্ থাকে না। শুধু সংস্কার বশে আমরা বাক্ জুড়ে দিই। কিন্তু তার কোনো দরকার হয় না। মনের সব ভাবকে যদি প্রত্যক্ষ করতে পারি তাহলে বাকের দরকার পড়ে না।

পূজা বা অর্চনাতে আমরা এই জিনিস দেখতে পারি। শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহকে আমরা যদি বাহ্য চক্ষু দিয়ে দেখি তখন তার রূপ বর্ণনা করি বাক্ দিয়ে। কিন্তু যখন ভাবচক্ষুতে তাকে দেখি তখন আর বাকের কোনো দরকার নেই। ভাবকে অবলম্বন করে এভাবে দেখা অর্থাৎ বাক্‌কে মনের মাঝে নিয়ত করা সে হচ্ছে বুদ্ধিতে তলিয়ে যাওয়া। শুদ্ধভাবে অনুভব হবে, স্পর্শে যেরকম সত্তায় সত্তার বোধ পাই তেমনি। অপরোক্ষ বোধে ভাষার দরকার হয় না, প্রত্যক্ষবৎ ভাবকে অনুভব করতে পারি, তখন কোনো বাকের ক্রিয়া থাকবে না। এরকম অভ্যাস করা সেটাই হচ্ছে higher mind থেকে illumined mindএ ওঠা; illumined mind-থেকে intuitive mind-এ ওঠা ইত্যাদি।

মন আর বুদ্ধি বিষয়কে গ্রহণ করছে। যদি গ্রাহ্য ভাবকে ধরে রাখি, তখন এই বিষয় বিষয়ীর সঙ্গে এক হয়ে যাবে। দৃশ্য ও দ্রষ্টা এক হয়ে যাবে। তখন মন এবং বুদ্ধিকে জ্ঞানাত্মাতে নিয়ে যেতে হবে। মনের ক্রিয়াকে যখন ভাবে লয় করলাম তখন একটা আমি-বোধ জাগে, সেটাই আমার pure self জ্ঞানাত্মা। এই আমিকে on-looker self, সাক্ষী আত্মাও বলে। এটা আত্মদর্শনের প্রথম ধাপ। তারপর করবার কিছু নেই, শুধু ধৃতি। শুধু ধরে রাখা। তারপরে সব এমনি জাগে। আকাশে নক্ষত্রের মতন আলো ফুটবে, সেটা মহান্ আত্মাতে পরিণত হবে। এই 'আতপের' পরে দেখা দেবে যে 'ছায়া' সেইটাই শান্ত আত্মা।

বিগ্রহ বা রূপের দিকেও এই ভাবের সাধনা হয়। প্রথম বাকের ব্যাপার, তাঁর স্তুতি ইত্যাদি। তারপর ভাব আসে, বাক্ বুদ্ধ হয়ে যায়। তখন ইষ্টের মূর্তি ভাবরূপে মনে আসবে। তারপর তার চিন্ময় রূপ চিৎক্ষেত্রে দেখব। সেখানে যে তন্ময়তা আসে সেটা কিন্তু বুদ্ধির দর্শন। তারপরে সে রূপ গাঢ়, ঘনীভূত হয়। তখন যেমন, হাতে যদি একটা সূচ ফুটিয়ে দেওয়া যায় সেখানে একটা তীব্র বোধ অনুভব করি, তেমনি ভাবের সত্তা তীক্ষ্ণ হয়ে আমাকে বিদ্ধ করে রইল, এটা হল জ্ঞানাত্মা। তারপরে বিশ্বময় সব জায়গায় তাকে যখন অনুভব করি, তখন সে হবে মহান্ আত্মার দর্শন।

আমরা থেকে যাই বুদ্ধিব দর্শনে। বস্তুরূপেই তাকে দেখতে চাই। কিন্তু যখন সূচের মতন বিদ্ধ করে তিনি আমার হৃদয়ে আসেন তখন আর বস্তুর মোহ থাকে না, অরূপের ধারা ফুটে ওঠে। যে সাধক এই অবস্থায় পৌঁছেছেন তিনি বলতে পারেন, তিনি যেমন সাকার তেমনি নিরাকার, যেমনি সগুণ তেমনি নির্গুণ, যেমন রূপ তেমনি অরূপ।

সমস্তকে প্রলয়ের দিকে নিয়ে যেতে হবে। উপনিষদের আত্মদর্শনের অনুকূল ভাব এটাই।

১৪।। অধ্যায়ের শেষে আদি এবং অন্ত দুই-এর কথা সংক্ষিপ্তভাবে, summary-র মত দেওয়া আছে। শান্ত আত্মায় পৌঁছনই প্রাপ্তির চরম। এটাই নচিকেতার তৃতীয় প্রশ্ন ঃ 'প্রেতে বিচিকিৎসা'। তার উত্তর, মহান্ আত্মাকে শান্ত আত্মাতে লয় করে দিতে হবে। সেই প্রেত্য-ভাবে transcendence-এ একদিকে অস্তিত্ব নাই, আর একদিকে অস্তিত্ব রয়েছে বলা যেতে পারে। যে বিদ্যা দেবার ছিল সেটা শেষ হয়ে গেল। এখন দুটি শ্লোকে সমস্ত প্রসঙ্গ short সংক্ষিপ্ত করে দেওয়া হচ্ছে আর তার পরের দুটিতে ফলশ্রুতি দেওয়া হবে। প্রথম শ্লোকে সমস্ত সাধকদের প্রতি অনুশাসন এবং উৎসাহের বাণী বলা হচ্ছে। নচিকেতার অভীপ্সার পরিচয় আমরা পেয়েছি। তার মত অভীপ্সা সবার ভিতরে প্রবর্তিত করা হচ্ছে। সাধনার আদি এবং অন্ত, সমস্ত অভিযানের ছবি আমাদের সামনে দাঁড় করানো হচ্ছে। পরের শ্লোকে অভীপ্সার ফলে কী পাব তা দেওয়া হবে।

প্রথম উত্থান তারপর জাগরণ। তৃতীয় বরপ্রাপ্তি চতুর্থ নিবোধন।

উত্থান—**উত্তিষ্ঠত**। এখানে একটা ব্যাকরণের প্রশ্ন আছে। এখানে ধাতু পরস্মৈপদী, বহুবচনে তার ব্যবহার। তার অর্থ ওঠা। যখন আত্মনেপদে তার ব্যবহার হয় তখন বোঝায় প্রচেষ্টা। এই পরস্মৈপদী অর্থে উত্তিষ্ঠ শব্দ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে রোহিতের গল্পে ব্যবহার করা হয়েছে। রোহিত এক রাজপুত্র ছিল, তাকে ইন্দ্র উৎসাহ দিয়েছিলেন 'চরৈব' তুমি চলতে থাক। তাতে বলা হয়েছে তুমি যদি শুয়ে থাক, তোমার ভাগ্য শুয়ে থাকবে। যদি তুমি উঠে পড়, তোমার ভাগ্যও উঠে পড়বে। আর যদি তুমি চলতে থাক, তোমার ভাগ্য চলতে থাকবে, তাই 'চরৈব'। সেই ভাবের সঙ্গে এখানে সাদৃশ্য রয়েছে। মানুষ শুয়ে থাকার মত আছে, অপরা প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, গতানুগতিক ভাবে তৃপ্তি অনুভব করছে। এটা অসাধকের লক্ষণ। এ তামসিকতা বর্জন করতে হবে, এটাই উত্থান। তার পরিণামে আসবে জাগরণ। এটাকে অন্যত্র দ্বিজত্ব বলা হয়েছে। আমরা তখন অন্য জন্ম লাভ করি। এতদিন পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন ছিল। তাতে ওপারের আলো পড়ল, তখন আমাদের দৃষ্টি জাগল। উষাকালে আগুন জ্বালার মতো। আগুনের একটা নাম ছিল উষর্বুধ্। পতঞ্জলিতে তাকে 'প্রাতিভসংবিৎ' বলা হয়েছে। যে জ্ঞান আমরা বুদ্ধি দিয়ে পাই না, লোকোত্তরের আবেশে যা আমার মধ্যে প্রতিভাত হয় flashed হয় তাকেই প্রাতিভসংবিৎ বলা হয়েছে। জীবন তমসাচ্ছন্ন, সেই অন্ধকারের মাঝে আলো ফুটে ওঠে। এটা শ্রদ্ধার অরুণোদয়, এটাই উষা। তখন আমাদের কর্তব্য আগুন জ্বালান, অগ্নির উদ্বোধন। √বুধ্-এর অর্থ জাগরণ, প্রবুদ্ধ মানে জাগ্রত। মাথার ওপরে উষার অস্ফুট আলো পড়ছে, সে লোকোত্তর চেতনার আভাস নিয়ে এসেছে। তার ছোঁয়ায় নিজেকে মন্থন করে আগুন জ্বালাতে হয় চেতনাতে। অগ্নিচয়ন করতে হয়। ওপারের আভাস যখন পেলাম তাকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করার জন্য দিশারী খুঁজতে হয়। সে দিশারীকে এখানে **বর** বলা হয়েছে। আগে বলা হয়েছে—'ন অবরেণ প্রোক্তঃ' যদি সে দিশারী 'অবর' হয়, তাহলে জ্ঞান ক্রিয়াশীল হয় না। এমন দিশারী পেতে হবে যিনি বর। সেই দিশারীই যম। এখানে বর শব্দ বহুবচনে ব্যবহার করা হয়েছে—**প্রাপ্য বরান্**। বহুবচনে বোঝানো হচ্ছে যে ব্রহ্মবিদ্যা 'ঋষিসংঘ-জুষ্টা', অনেকের কাছে এ বিদ্যা রয়েছে। উপনিষদে আমরা দেখি ঋষিরা শুধু

একজনের কাছেই জ্ঞান পেতেন তা নয়। যেখানেই উপযুক্ত লোক পেয়েছেন, সেখানেই সমিৎপাণি হয়ে গেছেন। তন্ত্রেও এর support সমর্থন আমরা পাই। মধুলুব্ধ ভ্রমর যেমন এক পুষ্প থেকে অন্য পুষ্পে যায় তেমনি জ্ঞানলুব্ধ শিষ্য এক গুরু থেকে অন্য গুরুর কাছে যাবে।

ভাগবতে এইভাব অবধূতের উপাখ্যানে পাই। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে—তুমি এ জ্ঞান কোথা থেকে পেলে, কে তোমার গুরু? সবাই আমার গুরু, তিনি বললেন। পঞ্চভূত থেকে আরম্ভ করে পশুপক্ষী মনুষ্য পর্যন্ত সবাইকার কথা বর্ণনা করে বলেছেন—এদের সকলের কাছেই কিছু না কিছু জ্ঞান লাভ করেছি। বাউলরাও বলেন—গুরু বলে কারে খোঁজ করবি ওরে মন। গুরু যে তোর জপের মালা, গুরু যে তোর ভাতের থালা, গুরু যে তোর চোখের বালি যখন জ্বলবে দুনয়ন—সবাই গুরু। প্রথম নিজের ভিতরে তাঁকে দেখতে হবে, তারপরে অন্য মানুষে, কিন্তু কোথাও নিজেকে বেঁধে রাখতে নেই।

তুমি ওঠ, জাগ, শ্রেষ্ঠ লোককে পেয়ে সে পরম তত্ত্বকে তোমার ভিতরে জাগাও।

এপথে চলতে গেলে অনেক বাধা। যাঁরা কবি, ক্রান্তদর্শী, পরম তত্ত্বের চেতনা যাঁদের ভিতরে রয়েছে, তাঁরা বলেন—ক্ষুরের ধারা যেমনি সূক্ষ্ম, তেমনি এপথ অত্যন্ত সূক্ষ্ম, এ পথে চলা অত্যন্ত কঠিন। পথ দুর্গম। শান দেওয়া ক্ষুরের ধারার সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়েছে। এ তত্ত্ব অণুপ্রমাণ,—অণুবৎ সূক্ষ্ম, দুর্দর্শ, গূঢ় গুহা-প্রবিষ্ট। 'অগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা' তাকে পাওয়া যায়। এই অগ্র্যা বুদ্ধিকে বেদে বলা হয়েছে তনু-মানস, মনকে সূক্ষ্ম করে তাঁর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া atomisation of mind। মন তনূকৃত হয়, চিন্তার ধারা সূক্ষ্ম হয়ে যায়—তার মাঝে নিজেকে ধরে রাখা কঠিন, তাই তা থেকে স্খলন হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু এ জেনেও অগ্রসর হতে হবে। গীতায় বলা হয়েছে—

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো
যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা ৬।২৩

দৃঢ় নিশ্চয় করে সাধনা করতে হবে, মন-মরা ভাব আসতে দিতে নেই। এই দুর্গম পথে চলতে চলতে যেখানে পৌঁছব, তার বর্ণনা পরের শ্লোকে রয়েছে।

১৫।। প্রথমে নেতিবাদের কথা বলা হচ্ছে। ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ ইত্যাদি গ্রহণ করি। এটা নিয়ে যদি ভেতরে তলিয়ে যাই, তাহলে শূন্যতাকে পাই। কিন্তু এ শূন্যতাকে এই নিবৃত্তিকে আমরা ধরে রাখতে পারি না, আবার বিষয়-সংযোগে প্রবৃত্ত হই। এই আসা-যাওয়া চলতে থাকে, তাই চিত্তের চঞ্চলতা জন্মায়। বারবার একই বিষয়ে ফিরে আসি অথবা এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে চিত্ত যেতে থাকে। চিত্ত যখন এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে যায়, তার মাঝে একটা ফাঁকা, একটা শূন্যতা আছে। কিন্তু আমরা চিত্তকে সেখানে ধরে রাখতে পারি না। যদি পারি, তাহলে বিষয় আমাদের মধ্যে লয় হয়। গীতাতে বলা হয়েছে—

শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি (৪।২৬)

শব্দাদি বিষয়কে আত্মাতে হোম করে, সেরকম যোগীও আছে।

ইন্দ্রিয় যদি বহির্মুখ হয়, সে অর্থকে আবিষ্কার করে বাইরে। আর যদি অন্তর্মুখ হয় তাহলে সে শূন্যতাকে পায়। সবার মূলে শূন্য—যেখানে শব্দ স্পর্শ কিছু নেই। এই শূন্যকেই

বলা হয়েছে মহতের ওপারে **মহতঃ পরম্**।

আমরা তিনটি জিনিস পাচ্ছি। একটা বাইরের শব্দস্পর্শের জগৎ, তার ভিতরে শূন্যতা, দুটির মাঝে মহৎ তত্ত্ব, পূর্ণতার ছবি। পরিপূর্ণতা আসে সিদ্ধিরূপে, ঋদ্ধিরূপে। বাইরে থেকে যখন চিত্তকে আকর্ষণ করে শূন্যতায় নিয়ে যাই তখন তার সূক্ষ্মতর বা শক্তিমান্ রূপ ভিতরে আমার সামনে আসে। চিত্তকে যখন নিগ্রহ করি তখন শক্তি বাড়ে। কোনো একটা বৃত্তিকে নিগ্রহ করলে তা থেকে শক্তি প্রকাশিত হয়—এটা একটা সাধারণ psychological law, মনোবিজ্ঞানের বিধান। প্রথম বহির্মুখী বিচরণ তারপর অন্তর্মুখী সঙ্কর্ষণ ও তার জন্য শক্তির বিকাশ—বিভূতি।

যারা যোগের বিরোধ করে তারা মনে করে বাইরের জগৎ ছেড়ে যদি অন্তরে যাই তাহলে কিছুই পাই না—এটা একটা escapism পলায়নপরায়ণতা মাত্র। কিন্তু এটা ভুল। প্রাকৃত চেতনা থেকে চিত্ত সংহৃত হলে সে স্বর্গলোক পায়। বাইরের জগতে যা পেয়েছিলাম তার থেকেও সূক্ষ্মতর, উজ্জ্বলতর সম্ভোগ সেখানে আছে—যেখানে জরা নেই, মৃত্যু নেই। আমরা দেখেছি নচিকেতা তাতেও সন্তুষ্ট হয়নি, সে তারও ওপারে যেতে চেয়েছে—শান্তিতে, শূন্যতায় যেতে চেয়েছে। এই বিভূতির জগৎই মহৎ। অন্যত্র বলা হয়েছে জ্ঞানাত্মা থেকে মহানাত্মাতে যেতে হবে আর সেখান থেকে শান্তাত্মাতে পৌঁছাতে হবে। শব্দ স্পর্শ থেকে উজিয়ে গেলে তারই দিব্যরূপকে পাব। মহৎ ইতিভাবনার চরম। কিন্তু সেটা থেকে ধ্রুবকে পেতে হলে শূন্যতাকে পেতে হবে। কী করে? **নিচায্য** যেমনি সূর্যরশ্মিগুলি সংহত হয়ে এলে আগুন জ্বলে, তেমনি যে সমস্ত বৃত্তি বাইরে রয়েছে তাকে যদি সংহত করি, ভিতরে গুটিয়ে আনি, তাহলে আমাদের ভিতরেও আগুন জ্বলবে। নিচায্যের সামান্য অর্থ দর্শন, কিন্তু তার বিশেষ অর্থ প্রত্যাহার। হৃদয় থেকে সব কিছুকে আকর্ষণ করে ভ্রূমধ্যে একাগ্র concentrate করে সেখান থেকে উপরের দিকে নিয়ে যেতে হবে। নীচে থেকে gather করে গুটিয়ে এনে এক জায়গায় সংহত করা, সেটা নিচায্য। সেটা থেকে সূর্যলোকে বা সূর্যদ্বার ভেদ করে, মহৎ তত্ত্বে বা শান্ততত্ত্বে নিয়ে যাওয়া। তখন **মৃত্যুমুখ** থেকে **প্রমুক্ত** হই।

মৃত্যু হচ্ছে আবৃত্তি। একটা জিনিসে ঘুরপাক খাচ্ছি, চক্রের মত চিত্তের গতি, সেই মৃত্যু। মৃত্যুর দুটো শক্তি রয়েছে। একটা মর্ত্য শক্তি, যে সবাইকে আবর্তিত করছে। আর একটা মরশক্তি বা মরুৎশক্তি, যে আমাদের আবর্তনের ওপারে নিয়ে যায়। মৃত্যুর lower দিক আবর্তন। সেখান থেকে যে-মৃত্যু জ্যোতিঃস্বরূপ, শূন্যস্বরূপ তাকে খুঁজতে হবে। জ্যোতিঃস্বরূপে পৌঁছান, সেটা হচ্ছে বেদান্তীদের সৎব্রহ্মের বোধ। তারও উজানে শূন্যতা, এটা বৌদ্ধদের বিনাশ। এই দুটিকেই এক করে নিতে হবে। যেমন ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে সম্ভূতিঞ্চ বিনাশং চ... ১৪।

লৌকিকভূমি, পূর্ণতা আর শূন্যতা এইভাবে উজিয়ে যেতে হবে। সেখান থেকে উল্টো দিকে আবার শূন্যতা, পূর্ণতা আর ব্যবহারিক ভূমি—এইভাবে ফিরে আসতে হয়। শেষ পর্যন্ত উঠেও আবার ফিরে আসতে হবে, সেটা নচিকেতা প্রথম বরেই চেয়ে নিয়েছে। সেই শূন্যতাময় পূর্ণতা নিয়ে আবার জগতে ফিরে আসতে হবে, এটাই কঠোপনিষদে বলা হয়েছে।

জগৎ থেকে একবার উজিয়ে যাব, একটা বিশাল বিরাটের জ্যোতিশ্চেতনায়। তারপর উজিয়ে যাব অন্ধকারে। তারপর সেই অন্ধকার আর জ্যোতিঃকে নিয়ে ফিরে আসব

এই জগতে। এটা কিন্তু আবর্তন নয়, 'বিসৃষ্টি'। এই সৃষ্টির উজানে চলে যাওয়াকে বলা হয়েছে 'অতিসৃষ্টি'। সেখান থেকে যদি সৃষ্টি হয়ও, সেটা হবে অমৃতের প্রাণরূপে নির্ঝরণ। তখন কোন শোক, দুঃখ থাকবে না, মৃত্যু পরিবর্তিত হবে এই অসীম প্রাণের লীলারূপে। সেই প্রাণের ভিতরে রয়েছে বলে তারা মরে না। তাহলে তাদের কী হয়? তারা সবকিছুর সঙ্গে মিলে যায়। এ উপনিষদের অন্যত্র বলা হয়েছে তারা জলের সঙ্গে জল মিলে যাবার মতো একাকার হয়ে যায়। এটাই হচ্ছে মর্ত্য চেতনার সঙ্গে অমর্ত্য চেতনা মিলে যাওয়া।

কয়েকটি বিশেষণ দিয়ে সে পরমতত্ত্ব কিরকম সেটা বুঝান হয়েছে। সে তত্ত্ব **অব্যয়, অনাদি, অনন্ত, নিত্য**। তার vastness, বিরাটত্বের নির্দেশ করা হয়েছে। সে beyond time and space দেশকালাতীত। তাই সে অনাদি এবং অনন্ত। সে নিত্য, গুহাতিত এবং ধ্রুব। এটাই কঠোপনিষদের সম্পূর্ণ তাৎপর্য।

১৬।। এই **নাচিকেত উপাখ্যান মৃত্যুপ্রোক্ত**—মৃত্যু গুরু, নচিকেতা শিষ্য। যে শোনে সে **মেধাবী**। এখন সমাধি বলে যা আমরা বুঝি তাকে ঋগ্‌বেদে মনঃধা—মনস্‌-ধা বা মনস্‌-ধা>মেধা বলা হতো। মেধা হচ্ছে মনকে একটা কিছুতে তলিয়ে দেওয়া। সমাধিস্থ পুরুষকে বলা হতো মন্‌ধাতা, তা থেকেই দেবতাকে মান্ধাতা বলা হয়েছে। যার ভিতরে সূক্ষ্ম বুদ্ধি, অগ্র্যা বুদ্ধি রয়েছে সে মেধাবী। এটা সাধকের requisite প্রয়োজনীয় যোগ্যতা। সে মেধাবী। যে এ উপাখ্যান বলে বা শোনে সে মহান্‌, ব্রহ্মলোককে পায়—'ধাতু-প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ।' চেতনা বা প্রাণ যেন ছোড়া পেল, বদ্ধ প্রাঙ্গণ থেকে যেন উন্মুক্ত প্রান্তরে এল, এমনি করে মুক্তির অনুভব হয়।

১৭।। এই উপনিষদকে **পরমগুহ্য** বলা হয়েছে। এখানে জীবন-মৃত্যুর রহস্য বলা হয়েছে বলে গুহ্য। **'ব্রহ্মসংসদি'**—যেখানে ব্রহ্মজিজ্ঞাসুরা এবং ব্রহ্মবিদেরা রয়েছেন, 'ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি', তাঁদের সংসদ—assembly সেখানে এই উপনিষদ শোনানো হবে। আর শোনানো হবে **শ্রাদ্ধকালে**। শ্রাদ্ধের সময় এই উপনিষদ ও মহাভারতের বিরাটপর্ব পড়া হয়। বিরাটপর্বে বিরাটের ভাবনা ও এখানে মৃত্যুর রহস্য আছে বলে পড়া হয়। তিব্বতে বার্দো থোডোল Bar-do tho-dol বলে একটা বিধি আছে। যখন কেউ মুমূর্ষু হয় তখন লামারা তাকে পরলোকের রাস্তা দেখিয়ে দেয়। তার কাছে বসে উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করা হয় আর তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়—এখন তুমি এই ভূমিতে পৌছালে কিন্তু সেখানেও আবদ্ধ থেক না; আরো এগিয়ে যাও। এই রকম করে পরপর ভূমির বর্ণনা করা হয়। সেখানেও হয়তো আমাদের এই জিনিষটাই অনুষ্ঠানরূপে রয়েছে। তার পিছনে এই ভাবনা রয়েছে যে মৃত্যুর সময়ে একটা আচ্ছন্নতা আসে, তার কবলিত হয়ে আত্মা তার বশে চলে যেতে পারে। সেজন্য ওসব মন্ত্র বলা হতো। আমাদের দেশেও এসব পাঠ করার রীতি আছে। যিনি শ্রাদ্ধ করছেন তিনি জীবকে শূন্যে লীন করে দেবার প্রযত্ন করছেন। সাধারণ চেতনা মৃত্যুর সময়ে ঝিমিয়ে পড়ে। সে যদি অন্য কোনো নাড়ী ধরে বেরিয়ে যায়, তাহলে আবার তাকে ফিরে আসতে হয়, কিন্তু যদি সুষুম্না নাড়ীর পথ অবলম্বন করে যায় তাহলে বিরাটে বা শূন্যে মিলে যায়। মৃত্যুর সময়ে যোগীর সমস্ত চেতনা হৃদয়ে সংহত হয় আর সেখান থেকে torch light এর মত, প্রদ্যোতের মত উপরে shoot করে উজিয়ে যায়। তার চেতনা তখন অনন্তে মিলে যায়।

প্রেতকে সে পথ চিনিয়ে দেওয়া, তাকে সে ভাবে উদ্বুদ্ধ করা, তার জন্যই শ্রাদ্ধের সময় এটা পড়া দরকার।

আমাদের দেশে চতুর্থদিনে পিণ্ডদানের ব্যবস্থা আছে। তারও এই আখ্যায়িকার সঙ্গে মিল আছে। নচিকেতা তিনরাত্রি যমের বাড়িতে না খেয়ে ছিল। আধ্যাত্মিকভাবে তার অর্থ সে পরপর তিনটে গ্রন্থি বা শূন্যতা পার হয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের কাছে এটা শুধু আচ্ছন্নতা। তাঁরা বলেন তিনদিন পর্যন্ত জীব শুধু একটা আচ্ছন্ন দশায় থাকে। শ্রাদ্ধকর্তাকে এ সময় সংযত বা জাগ্রত অবস্থায় থাকতে হয়। চতুর্থদিনে যমের সঙ্গে নচিকেতার সাক্ষাৎ হল। মৃত্যুর রহস্য সে জানতে পারল। সে একটা সূক্ষ্ম দেহ পেল। এই তিনটে দিন সে সমস্ত ভূতের সঙ্গে একাকার ছিল। এখন জীব নতুন সূক্ষ্ম দেহ পাবে, তার জন্য চতুর্থদিনে পিণ্ড দেওয়া হয়। এটাকে পূরক পিণ্ড বলা হয়। অন্ন থেকে দেহ তৈরি হয়। তাই সূক্ষ্ম দেহ তৈরি করার জন্য সেটা দেওয়া হয়। এই সূক্ষ্ম দেহ সে এমনিতেই naturally পায়। কিন্তু যদি না পায় এই ভেবে তাকে সাহায্য করার জন্য এখান থেকে পিণ্ড দেওয়া হয়। এই জীবকে guide করার জন্য দিনের পর দিন শ্রাদ্ধকালে লামাদের বার্দো থোডোলের মত পিতৃযান, দেবযান ইত্যাদির কথা বলা হয়। তিব্বতে যেটা মুমূর্ষুকে বলা হয় আমাদের এখানে সেটা শ্রাদ্ধের সময় বলা হয়। এ জন্য এ উপনিষদের সঙ্গে শ্রাদ্ধের সম্পর্ক আছে।

প্রয়তঃ যদি past participle হয় তখন তার অর্থ হবে যে প্রয়াণ করেছে তার, তখন এটি ষষ্ঠীবিভক্তিযুক্ত পদ হবে। কিন্তু যদি প্রথমাবিভক্তিযুক্ত পদ বলে ধরা হয় তখন বুঝতে হবে, যে শোনাবে, সে—'প্রযতঃ'। তার অর্থ, সে সংযত হবে। যে শ্রাদ্ধকর্তা সে অথবা যে এগিয়ে চলেছে সে—দুই অর্থে এ শব্দের প্রয়োগ হতে পারে। মৃত্যুকে প্রয়াণ বলা হয়। প্র অর্থাৎ সামনের দিকে এগিয়ে চলা—এটাই আদর্শ। হয়তো সংসারে ফিরে আসব, অথবা প্রয়াণ করে সাম্পরায় যান পর্যন্ত চলে যাব। ঋগ্‌বেদে এ সাম্পরায় গতিকে নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে। আবর্তগতিকে নিয়ে বেশি বলা হয়নি। পশ্চিমের পণ্ডিতেরা বলেন ঋগ্‌বেদে পুনর্জন্মের কথা নেই। পুনর্জন্মের কথা ঋগ্‌বেদে নেই সেটা ঠিক, তার কারণ হচ্ছে বৈদিক ঋষিরা নিজেদের সাধারণ লোক থেকে স্বতন্ত্র মনে করতেন। প্রাকৃত লোকের মতো তাঁদের আবৃত্তি বা আবর্তন হয় না, তাঁদের হয় উৎক্রান্তি বা সমবনয়ন।

আবর্তন বা আবর্তগতি— বার বার আসছে। তারপর দেবযানের পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে, সেটা 'প্রয়াণ'। 'প্রয়ন্' তারই ষষ্ঠী 'প্রয়তঃ'। মৃত্যুর পর সূর্যের সঙ্গে মিশে গেলে হয় উৎক্রান্তি বা উৎক্রমণ। আর যদি তার উর্ধ্বে শূন্যে মিলে যায়, তাহলে সেটা হল সমবনয়ন।

বেদে তাই উৎক্রান্তির কথাই বেশি আছে। যে মরল সে এগিয়ে চলেছে, সে 'প্রয়ন্'। তার মৃত্যুর সময় যদি এ উপনিষদ শোনান হয় তাহলে সে অনন্তকে পাবে। যে শোনাচ্ছে ও যে শুনছে দুজনেই **অনন্ত** হয়ে যাবে। যে শোনাবে সে অনন্তভাবসম্পন্ন হয়ে শোনাবে। লামারা এ সম্বন্ধে খুব conscious সচেতন, আমরা কিন্তু এখন এত সচেতন নই। মৃত্যুকে ভয় করবার কিছু নেই, শুধু অবরুদ্ধ চেতনা মুক্তি পাবে, অনন্তের মাঝে মিলে যাবে, মৃত্যুতে হবে শাপমুক্তি। এটাই ফলশ্রুতি। ফলশ্রুতির সঙ্গে গ্রন্থ শেষ হয়। মনে হয় কঠোপনিষদের প্রাচীন অংশ এই পর্যন্ত ছিল। তারপর যাঁরা এই ধারা অবলম্বন করে চলেছেন তাঁরা এটিকে বিস্তৃত করে তিনটি বল্লীর আর একটি অধ্যায় যোজনা করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে সব কথাগুলি Intuition এর plane থেকে বোধির ভূমি থেকে বোঝানো হয়েছে। এই উপদেশ বুদ্ধি দিয়ে সহজে ধরা যায় না। তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই তত্ত্বকে বুদ্ধি দিয়ে ধরা যায় এমন ভাবে বলা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় তৃতীয় বল্লী সমাপ্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম বল্লী

১।। আগে (১/২/১-২) শ্রেয়ঃ আর প্রেয়ের কথা বলা হয়েছে। যারা প্রেয়কে বরণ করে, যোগক্ষেমকে আঁকড়ে রাখে, তারা হীন, আর যারা শ্রেয়কে বরণ করে তারা ধীর, তারা সাধু। এটা সাধক ও অসাধকের মধ্যে প্রভেদ। সে প্রভেদকে সেখানে জীবনদর্শনের দিক দেখানো হয়েছে, তাকেই এখন psychologically মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে দেখানো হচ্ছে।

প্রথম স্বভাবস্থিতি—জগতে যা ঘটে, তার কথা বলা হচ্ছে। প্রত্যেক শব্দের পারিভাষিক অর্থ রয়েছে। **পরাঞ্চি** এবং **প্রত্যক্**—অঞ্চ্ ধাতুর প্রয়োগ আছে। পরাক্— that which moves away, বহির্মুখী বৃত্তি (পরাঙ্মুখ), যে object বা বিষয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে। তার উল্টো প্রত্যক্— not away but towards, বাহির দিকে নয়, ভিতর দিকে দেখছি। বিষয় পরাক্, বোধ প্রত্যক্। বোধের সঙ্গে বিষয়ের যোগ হয়েছে ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে। ইন্দ্রিয়কে বলা হয় '**খ**'—অর্থ হচ্ছে বিবর, গর্ত বা ছিদ্র—hole। √খন্ ধাতু থেকে হয়েছে। এই ধাতু থেকেই দুঃখ এবং সুখ শব্দ দুটি হয়েছে। যেগুলি আমার ছিদ্রের, ইন্দ্রিয়ের অনুকূল, তা সুখ। যেগুলি প্রতিকূল তা দুঃখ। এই উপমা গাড়ির চাকার সঙ্গে জড়িত আছে। চাকার নাভির মাঝ থেকে অর পরানো থাকে। যে ছিদ্রে সেগুলি পরানো থাকে, তা যদি তৈলাক্ত থাকে তাহলে চাকাগুলি ভালো করে ঘোরে। এভাবে ঘোরাকে বলা হতো সুখ। তৈলাক্ত না থাকলে চাকাগুলি ভালো করে ঘুরত না। তখন চাকার গতিকে বলা হত দুঃখ। '**খ**' শব্দের আর একটা পারিভাষিক অর্থ আছে—শূন্য। ব্রহ্মমীমাংসা করতে গিয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে ব্রহ্ম 'কং' ব্রহ্ম 'খং'। দেহের ছিদ্রগুলিকে খ বলা হতো। কখনো কখনো তাদের দ্বার বলা হতো—নবদ্বার পুরী। এই ছিদ্রগুলি দ্বারগুলি বাহিরের দিকে খোলা।

ব্যতৃণৎ √তৃদ্ to bore a hole। বেধযন্ত্র দিয়ে একটা ছিদ্র করা। এ ছিদ্র কে করল?—স্বয়ম্ভূ নিজে। এটা দিয়ে আমাদের আধার আর তার শক্তিগুলি কীভাবে কাজ করে তার একটা ছবি দেখানো হচ্ছে। আত্মা থেকে সবকিছু হয়েছে, বীজের মধ্যে যেমন ফুল থাকে।

স্বয়ম্ভু একটি চিৎকণ বা চিদ্‌বিন্দু। বেদে একে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বা অগ্নিশিশু বলা হয়েছে। সে আসে দ্যুলোক থেকে, সূর্যলোক থেকে একটা সূর্যরশ্মি ধরে, আর এসে উপস্থিত হয় ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে আমাদের হৃদয়ে। ঐতরেয় উপনিষদে এর বিস্তৃত বর্ণনা আছে। প্রথমে আধার সৃষ্টি হয়। কিন্তু যতক্ষণ চিৎশক্তি তার মধ্যে প্রবেশ না করে ততক্ষণ

সে নিষ্প্রাণ থাকে। আধার তৈরি করা প্রকৃতির কাজ। সে নিষ্প্রাণ। সে একটা শক্তির অপেক্ষা রাখে। সে শক্তি এসে তাকে বিদ্ধ করে, তখন তার নিজের গড়বার ক্রিয়া আরম্ভ হয়। তারপরে সে বাড়তে থাকে। চৈতন্য আসে সূর্যালোক থেকে—এটা একটা কল্পনা। কিন্তু অধ্যাত্মসাধনায় এ কল্পনা খুব সাহায্য করে। সূর্যালোক থেকে একটা রশ্মি তীরের মতো এসে ব্রহ্মরন্ধ্র বিঁধে তাকে পেরিয়ে হৃদয়ে চিদ্‌বিন্দুরূপে স্থাপিত হয়, সেই জীব। তাকে চিৎকণও বলা হয়, বা গৃহপতি অগ্নি। শরীররূপী ঘর বা গৃহ তার ভিতরে সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রবেশ করে। প্রথম সে শক্তি এসে যেন অন্ধকারে পড়ে যায়। তারপর চিৎশক্তি অন্ধকারের আবরণকে বিদীর্ণ করে বের হবার চেষ্টা করে। Biologyতে বলে বাহির থেকে আঘাত আসে—stimulus। তাকে ভিতর থেকে কিছু একটা সাড়া দেয়, respond করে। আর একটা মত হল, দেহের ভিতর থেকে একটা ইচ্ছা জাগ্রত হয় তখন বাহিরের সৃষ্টি শুরু হয়।

যদি চিৎশক্তি প্রবেশ না করে, আধার নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যেমন আমের গাছে অনেক মুকুল ধরে, অনেক ঝরে যায়, আর কিছু থেকে আম তৈরি হয়। তেমনি চৈতন্যের আবসথ বা আবাস। তিনি এসে এই আধারকে ছিদ্র করেন। এই ছিদ্রগুলিই ইন্দ্রিয়। তারা যখন বাহিরের দিকে দেখে, তখন বাহিরের জগতের জ্ঞান হয়।

এই ভিতরের চৈতন্য আধারের ভিতর ছিদ্র করে বাহিরের জগতকে জানবার চেষ্টা করছে। বাহিরে সে কাকে দেখবে? উপনিষদ বলে সে নিজেকেই দেখবে। ঐতরেয় উপনিষদে বলা হয়েছে বাহিরের যে 'ইদম্' সেই ভিতরে আত্মা। আত্মৈব ইদমগ্র আসীৎ। এই আত্মা আগেই ছিল। সেই আত্মার ভিতরেই সমস্ত জগৎ রয়েছে। আত্মা থেকে জগৎকে project করে তাকে আবার ভিতরে গুটিয়ে আনা, এটাই বিদ্যা। বৌদ্ধদর্শনে এটাকে বিস্তার করা হয়েছে। যা আমি দেখি সে আমারই অনুকূল হবে। যে প্রতিকূল তাকে ছেড়ে অনুকূলকে আমরা বেছে নিই। বেছে নিয়ে নিজের ভিতরে গ্রহণ করি। এটাই আহার। এই আহার দিয়েই আত্মপুষ্টি হয়। চেতনার একদিকে সঙ্কোচ, আর একদিকে সম্প্রসারণ। যা আমার expansionকে সমৃদ্ধ করে সেটাই আত্মপুষ্টি।

স্বয়ম্ভু প্রথম আধারে সন্নিবিষ্ট হলেন। ইন্দ্রিয়পথে তিনি নিজেকে বার করে দিলেন, তখন তিনি বাইরের দিকটাই দেখে বহির্মুখ হলেন। যখন বহির্মুখ হন তখন বাহিরের জগৎ দেখেন কিন্তু ভিতরের দিকে আত্মাকে— নিজেকে দেখতে পারেন না। Psychologically বলতে গেলে আমাদের objective জ্ঞান আগে হয়, আর subjective জ্ঞান পরে হয়। এইখানে সাধক অসাধকের তফাৎ।

Self-consciousness—আত্মসচেতন হওয়াকেই সাধনা হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। বৌদ্ধেরা একে সম্যগ্ দৃষ্টি বলেছেন। বেদান্তীদের একটি ধারা একে সাক্ষিচৈতন্যের সাধনার আরম্ভ হিসেবে ধরেছেন। উপনিষদে একে সমনস্কতা বলা হয়েছে। সোজা কথায় বলতে গেলে এটাই 'হুঁসে থাকা'। সবই তার সামনে ঘটছে, কিন্তু ভিতরে সেই বস্তু বা চৈতন্য রয়েছে, সে যেন সব দেখে যাচ্ছে। আমরা যখন প্রকৃতির অধীন হই, তখন অবশ হয়ে কাজ করি। কিন্তু তাতেও নিজেকে হুঁসে রাখা—এইখানে সচেতনতার আরম্ভ। যদি যা কিছু আসছে বা হচ্ছে তার সম্বন্ধে কিছু বিচার না করে শুধু দেখে যাই, তাহলে ভিতরটা প্রশান্ত হয়ে যায়, স্থির ও স্তব্ধ হয়। তখন সেটাই ইন্দ্রিয়গুলিকে শাসন করে।

এযুগে এই সাধনার উপরে খুব জোর দিয়েছেন কৃষ্ণমূর্তি। তিনি awareness এর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন সব সময় aware থাকবে। নিশ্চল সচেতন হবে। ভালোমন্দের কোনো কথাই উঠছে না। যদি এইভাবে আত্মসচেতন হতে পারি, তাহলে সাধনার পথ সংক্ষিপ্ত হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে অক্ষরের প্রশাসন। অক্ষরই অন্তর্যামী। এই অক্ষরের প্রশাসনেই সমস্ত চলছে। তিনিই সবকিছুকে নিয়ন্ত্রিত করছেন সবার ভিতর থেকে। আমাদের ভিতরে যে চিদ্‌বিন্দু সে নির্বিকার, অচল, স্থির, কূটস্থ। তাকে জানাই নিজেকে জানা। এটাই বিচারের পথ।

ভিতরে একজন রয়েছেন কূটস্থ চিদ্‌বিন্দু। বাহিরের কোনো কিছুকে বিচার করছেন না, আছেন শুধু একা, অচল, অটল তাঁর ধ্রুবসত্তার ভাব নিয়ে। এই সম্পর্কে প্রথম সচেতন হয়ে সংযমের পথ ধরে চললে সংযম সহজ নয়। আরো সহজ হয়, যদি সমস্ত কিছুকে এই অন্তর্যামীর কাছে টেনে আনি, তাঁর কাছে সব নিবেদন করি। যদি দেখা যায়, নাভি থেকে শলাগুলি বেরিয়ে রয়েছে, তাহলে সেটা বহির্মুখী দৃষ্টি। কিন্তু শলাগুলিকে নাভিতে ফিরিয়ে আনা হয় যদি, তাহলে সেটা হবে অর্পণ। তিনি আমারই ভিতরে রয়েছেন, তাঁকেই সব সমর্পিত করছি, এটাই অর্পিত বা অর্পণ। সংযমের ধারা হবে প্রথম নিজের মাঝে কূটস্থ সত্তার অনুভব। সেটা স্থির হলে একটা সঙ্কল্প আসে—যে বাহিরে গিয়েছে তাকে ভিতরে নিয়ে আসব, তাঁকে লয় করব। প্রথম প্রথম এটা সম্ভব হয় না। দুষ্ট অশ্বের মতো ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়ের দিকে ছুটে যাবে। কিন্তু বুদ্ধি যদি সারথী হয়, বিজ্ঞানবান হয়, তাহলে ঘোড়াকে টেনে তাদের নিজের মাঝে লয় করে দেবে। পতঞ্জলি বলেছেন সমস্ত ইন্দ্রিয়কে কারণে লয় করা—এটাই প্রত্যাহার। ইন্দ্রিয় যাকে বাহিরে খুঁজছে তা ভিতরেই আছে। মূল চিত্তসত্ত্ব বাহিরে নেই, ভিতরে। বিষয় তাকে উদ্বুদ্ধ করে। তারপর যদি চিত্তকে বিষয়ের মাঝেই নিহিত রাখি তাহলে চিত্ত পরাঙ্‌মুখ হয়। এটা অবিদ্যা। যে সুখ আমি চাই, সে বিষয়ের সংস্পর্শে নাই, সে বাহিরে নাই, আছে ভিতরে, ভাবের দিকে। যাকে মনে করছি আমার সুখ, তা আমার নয়, তাঁর সুখ। তিনি প্রসন্ন হচ্ছেন, তাঁরই ভালবাসা। এটাকেই বলে পরাক্‌ বৃত্তিকে প্রত্যক্‌ বৃত্তি করা। এটাই প্রত্যাহার বা সংযম। যদি সবকিছু ভিতরে নিয়ে যাই এবং তাঁকেই সব সমর্পণ করি, তাহলে সে হবে আহারশুদ্ধি। আর আমার জন্যই যদি ভোগ করি তাহলে তা হলে অবিশুদ্ধ আহার। যদি মনে করি সব তাঁকেই দিচ্ছি, আমার আনন্দে তাঁরই আনন্দ, এটা হবে অর্পণ—বাহিরের অরগুলিকে কেন্দ্রে বা নাভিতে সংযত করা।

আমার মাঝে স্বয়ম্ভূ রয়েছেন। তিনি আধারের ভিতর থেকে স্ফূরিত হতে চান, এ থেকেই ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়। তাদের দৃষ্টি স্বভাবতঃ বাহিরের দিকে প্রসারিত হয়, **পরাক্‌ পশ্যতি নান্তরাত্মন্**—তারা ভিতরে দেখেনা। কিন্তু **কশ্চিদ্ ধীরঃ প্রত্যগাত্মনম্ ঐক্ষৎ** কোনো এক ধীর ব্যক্তি আত্মাকে প্রত্যক্ষ দেখছেন। **ধীর** শব্দ সংহিতাতে পাওয়া যায়, তারপরে তার ব্যবহার সর্বত্র দেখা যাচ্ছে। সাধককে **ধীর** বলা হয়। তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে—বীর, শূর, ধীর। একই প্রত্যয় 'র' সবার সঙ্গে রয়েছে আর ধাতু হচ্ছে √বী, √শূ, √ধী। অগ্নিশক্তিকে বীর বলা হয়েছে, ইন্দ্রশক্তিকে শূর আর আদিত্যশক্তিকে ধীর। অগ্নির স্থান পৃথিবী এবং দেহ। ইন্দ্রের স্থান অন্তরিক্ষ এবং দ্যুলোকের সন্ধিতে, শুদ্ধপ্রাণ এবং মনশ্চেতনার উপান্তে—ভ্রূমধ্যে। আদিত্যের স্থান আকাশে, মূর্ধন্য চেতনায়, brain-এ।

প্রথম আগুন জ্বালানো হয়। এটা বীরকর্ম—মন্থন করে আগুন জ্বালানো। √বী ধাতুর দুটি অর্থ to move—চলা, to enjoy—ভোগ করা। কাঠ নিশ্চল, জড়। যখন তাতে অগ্নি সঞ্চারিত হল, তখন কাঠের অণুপরমাণু স্পন্দিত হল। সেই স্পন্দনে আনন্দ হল। তারপর আসে বিস্ফারণ। √শূ ধাতুর অর্থ হচ্ছে ফুলে ওঠা, ফেঁপে ওঠা। Science বলে heat expands, যখন অগ্নিসঞ্চার হয়, heat সঞ্চার হয় তখন heart expands একটা ব্যাপ্তির বিস্তৃতির অনুভব হয়, প্রত্যপ্ত শরীর যেন ছড়িয়ে পড়ছে। তারপর যে জাগে সে ধী, বুদ্ধি, বিজ্ঞানের আলো। অগ্নির তাপ **বীর্য**—সে হচ্ছে তপস্যা। ইন্দ্রের শৌর্য—সে হচ্ছে শক্তি—ওজঃশক্তি, বজ্রশক্তি। আর যে reveal বা প্রকাশ করে, বিজ্ঞানের আলো, সে হল ধী। তখন সমস্ত বৃত্তিগুলি একাগ্র হয়, একটা stream এর মতো চেতনার ধারা দেখা যায়, একেই ঊর্ধ্বস্রোতা বলে, এটাই কুণ্ডলিনী যোগের ভিত্তি। তাঁরা কল্পনা করেছেন মূলাধার থেকে একটা স্রোত উপর দিকে যাচ্ছে। বিজ্ঞানেও এটাকে physically true বলেছেন। আমাদের মেরুদণ্ডকে ভিত্তি করে সমস্ত nervous system প্রসারিত হয়েছে। ঋগ্‌বেদে ‘ধী’র কথা আছে। তাঁদের সাধনা ধীযোগ। গীতাতে—এটাকেই বুদ্ধিযোগ বলা হয়েছে। এটা তাঁরই প্রসাদে লভ্য—দদামি বুদ্ধিযোগং তম্ (গীতা ১০/১০)। কশ্চিৎ—কেউ কেউ ঊর্ধ্বস্রোতা, তাদের ধারা উজানে বইছে। বাহির থেকে যে কোনো বিষয় গ্রহণ করে তাকে ভিতরে টেনে উপরের দিকে উঠানো, তার জন্য একটা সাধনা আছে। যদি চিত্তকে ভ্রূমধ্যে স্থির করি তাহলে এটা সহজ হয়, ওটা করতে গেলে একটা tension আসে, তাই সবার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। ঊর্ধ্বপুণ্ড্র, তিলকটানা ইত্যাদি এইভাবেরই বহিঃরূপ। মন যদি ঊর্ধ্বে থাকে, তাহলে কামনার সংযম হয়। চিত্তকে আজ্ঞাচক্রে স্থির করতে হয়। শিবের তৃতীয় নয়ন মদনকে ভস্ম করে। যদি সেখানে চিত্তকে একাগ্র করি, তাহলে সব ঊর্ধ্বমুখী হয়। তখন কিছুদিন পরে মাথার ভিতরে সব ফাঁকা লাগে, নিজেকে মনে হয় যেন বেলুনের মত ভাসছি। প্রথম প্রথম অসুবিধা হয়। ক্রমে এটা স্বাভাবিক হয়। তখন ভাব হয় জলস্তম্ভের মতন। নদীর জল একটা জায়গাতে ঘুরে ঘুরে ওপরের দিকে যেমন যায়, তেমনি সমস্ত জগৎকে টেনে ওপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এটাই আহুতি। এটাই ধীযোগের কথা। গায়ত্রী মন্ত্রেরও এই তাৎপর্য। ‘ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ’—ধী এর প্রচোদন। এটাই যোগের ভোগ। দিব্য সম্ভোগ। এটাই অমৃতত্ব। এই যে সম্ভোগ, তার কর্তা কে? কে সম্ভোগ করছে? হৃদয়ে যখন এই ভাবনা করি, তখন ভাবগুলো আসে horizontal ভাবে। হৃদয় যেন কেন্দ্র। হৃদয়ে এসে তারা তলিয়ে যাচ্ছে। তারপরে এই ধারণাকে perpendicular করতে হয়। তখন একটা cone এর মতন সমস্ত কেন্দ্রীভূত হচ্ছে ভ্রূমধ্যে, আর সেখান থেকে ঊর্ধ্বের দিকে বিস্ফারিত হয়ে যাচ্ছে। হৃদয়কে ঘিরে জগৎ চারিদিকে বিস্তৃত রয়েছে, হৃদয়কে তাই অনেক জায়গায় বুদ্ধিক্ষেত্র বলা হয়েছে। ভ্রূমধ্যে থাকে প্রজ্ঞার আগুন। তাতে সব শোধিত হয়। তখনকার ভোগ হয় অমৃতসম্ভোগ। ভোগ করছে ভ্রূমধ্যে স্থিত পুরুষ বা হৃদি-সন্নিবিষ্ট পুরুষ। সাধনার দিক দিয়ে হৃদয় থেকে ভ্রূমধ্যে যাওয়া safe, নিরাপদ। বাইরে যা ঘটছে তাকে হৃদয়ে টেনে আনা আর তারপর তাকে perpendicular করে cone এর মতন ভ্রূমধ্যে নিয়ে যাওয়া এই সাধনা ধী এর সাধনা। Movement towards inside, প্রথম অন্তরের দিকে inward, তারপরে ঊর্ধ্বের দিকে upward। সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে থেকে কী করে অতীন্দ্রিয়ের মাঝে যাওয়া যেতে পারে এখানে তার সঙ্কেত পাচ্ছি। এটা একটা সাধনার

ধারা। সমস্তের মূলধারা অন্তরাবৃত্তি। ভিতরে একটা ডমরুর মতন অবস্থা হবে। বাইরে যা দেখছি তা একটা বিন্দুতে কেন্দ্রিত হয়ে সেখান থেকে আবার বিস্ফারিত হচ্ছে।

২।। আগের শ্লোকে প্রত্যক্ দৃষ্টির কথা বলা হল। কিন্তু যারা বালাঃ নির্বোধ, তারা পরাক্ যে কাম তারই অনুগমন করে। এটা চিত্তের বিক্ষেপ। তারা অমৃতত্ব লাভ করে না। মৃত্যুর পাশে তারা বদ্ধ হয়। বাইরের ভোগে থাকলে জীর্ণ অবসন্ন হয়ে যাই। একটা ভোগে তুষ্ট না হলে আরেকটা ভোগকে ধরতে যাই। একই বিষয়ে দীর্ঘ সময় থাকতে পারি না। monotony বা একঘেয়েমি ভালো লাগে না। কিন্তু যোগিচিত্ত monotonous একঘেয়ে, সে সবসময় ভিতরে থেকেও আনন্দে থাকতে পারে। বাইরের monotony ভালো লাগে না, তাই আমরা বিষয় বদলে বদলে স্বাদকে কায়েমী করতে চাই। কিন্তু সেটা মূঢ়তা। ভিতরে যদি ভাবকে continue করি তাহলে একই স্বাদ পাব, আর সেটাই অমৃতত্বের স্বাদ। ভিতরের দিকে যা নিয়ে যাই, সেটাই অমৃত হয়। বাইরে যে থাকে সে মরে যায়। যারা নির্বোধ—তারা আনন্দকে বাইরে খোঁজে। কিন্তু যারা ধীর তারা অধ্রুবকে চায় না, তারা চায় ধ্রুবকে। ভিতরে একটা continuity আছে। বাইরে অধ্রুব, তাতে ধ্রুব নেই, সে তারা জানে।

৩।। এখানে আমরা আরেকটা সাধনার সঙ্কেত পাচ্ছি। একেক করে সাধনাগুলো দেখানো হচ্ছে। প্রথম ইন্দ্রিয়সংযম, যা দিয়ে সাধনার আরম্ভ হয়।

বাইরের যা কিছু শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ সে বিষয়ে যতক্ষণ চেতনা আছে ততক্ষণ এইসব বিষয়ের রস থাকে। ভিতরে চৈতন্য আর বাইরে বিষয়, তাদের সংযোগ—এটাকেই মিথুনভাব বলা হচ্ছে। Contact হচ্ছে মৈথুন। এটা দুরকম হতে পারে। যদি চৈতন্য বাইরে প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহলে আসে অবসাদ। পুরুষ যদি প্রকৃতিকে অনুসরণ করে তাহলে তার অবসাদ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু প্রকৃতিকে যদি সে অন্তরে আকর্ষণ করে নেয় তাহলে অবসাদ দেখা দেয় না। আকর্ষণ করে নিয়ে সেটাকে শূন্যে মিলিয়ে দিতে হয়। এটাই প্রত্যাহারের ক্রিয়া। যেমন একটা ফুল দেখলাম, কিন্তু সে ফুলের ভাবকে সৌন্দর্যের ভাবে নিয়ে যেতে পারি। চিত্তকে যদি abstract ভাবনায় অভ্যস্ত করতে পারি তাহলে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের ভাবনা ভিতরে দৃঢ় হবে। সবকিছুই ভাল লাগে, এমন ভাল লাগার একটা সংস্কার ভিতরে তৈরি করতে হয়। এখন বাইরের ফুলকে যদি ভিতরে নিয়ে যাই তার একটা আনন্দরূপ রয়েছে সে সত্যিই নীরূপ। বাইরে তার বিচিত্র রূপ গন্ধ রস থাকতে পারে, কিন্তু ভিতরে সে একটা রসে পরিণত হয়। সেই রসই সমস্ত শরীরে তৃপ্তিরূপে, পুষ্টিরূপে ছড়িয়ে পড়ে। বাইরে বিচিত্ররূপ, ভিতরে একরস। বাইরের বিচিত্র প্রকৃতিকে যদি ভিতরে একরসে পরিণত করি, তাহলে তা হবে আরেকটা মৈথুন। তখন কী থাকে? কিছুই থাকে না। প্রকৃতির গ্রাস হয়ে যায়, শুধু শিবত্ব থাকে। যদি আমি প্রকৃতিতে লয় হয়ে যাই তাহলে সে হবে জীবত্ব। আর যদি প্রকৃতি আমাতে লয় হয়ে যায় তাহলে সে হবে শিবত্ব। Jung তাঁর Psychology of unconsciousnessএ Hero-worship-এর কথা বলেছেন। তাতে তিনি বলেছেন যে একটা কল্পনা সব পুরাণগ্রন্থে পাওয়া যায়। যেন একটা বিরাট তিমি মাছ সবাইকে গিলে খাচ্ছে। কিন্তু তাদের ভিতরে কেউ কেউ এরকম থাকে যারা তিমিমাছকে ভিতর থেকে কেটে বেরিয়ে আসে। এ ধরনের গল্প কী বোঝায়? এটা হচ্ছে unconscious আর self-conscious-এর দ্বন্দ্ব। যারা হজম হয়ে গেল তারা

অবিদ্যাজীব। কিন্তু তাদের ভিতর কেউ কেউ hero থাকে, তারা লয় হতে চায় না। তারা তিমির পেট চিরে বেরিয়ে আসে। তারা হচ্ছে বিদ্যাজীব। এটাই ধীরের লক্ষণ। প্রকৃতির দ্বারা, ভোগের দ্বারা যদি গ্রস্ত হই তাহলে আমরা শিব নই, জীব। কিন্তু যদি প্রকৃতিকে গ্রাস করতে পারি তাহলে জীবত্ব থেকে শিবত্ব পেয়েছি বলা যেতে পারে। সাংখ্যকার এটাকেই বলেছেন কৈবল্য। আমরা প্রকৃতির lower শক্তিকে নিয়ে রয়েছি, যে আমাকে গ্রাস করে রয়েছে। যদি সেটাকে ছাড়তে পারি তাহলে কৈবল্যকে পাব। তিনটি অবস্থা রয়েছে। এক সারূপ্যবৃত্তি, প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গেলাম, বদ্ধ অবশ যেন তিমির পেটে ঢুকে গেছি। দুই কৈবল্য, কেবলভাব, প্রকৃতি থেকে আলাদা। তখন আমি ভোগ্যবস্তু নই, কিন্তু ভোক্তা। তৃতীয় বিভূতি। তন্ত্রে এই ভাবকে ছিন্নমস্তা কালীরূপে দেখানো হয়েছে। প্রাকৃতভূমির উপর ছড়িয়ে আছে দিব্যভূমি। দেবীর পায়ের তলায় কাম নীচে, রতি উপরে। প্রকৃতি পুরুষকে ভোগ করছে। দুইদিকে দুই শক্তি, তমস্ ও রজস্, ডাকিনী ও যোগিনী। মাঝখানে সত্ত্বরূপা কালী, ছিন্নমস্তা—তা থেকে রক্তের ত্রিধারা বেরিয়ে আসছে। একটা কালী নিজে পান করছেন, অপর দুটি তাঁর ডাকিনী যোগিনী পান করছেন।

বাহিরের যে বিষয়সারূপ্য, তাকে যদি ভিতরে টেনে আনি, তখন তা থেকে পৃথক হয়ে যেতে হয়, তার ভিতরে যদি vacuum সৃষ্টি করি, তাহলে বাহির থেকে সমস্ত ভিতরে ঢুকে যাবে। তখন সবকিছুকে absorb করতে পারব। এটা একটা auto-suggestion-এর ব্যাপার। এভাবে সমস্তকে শুষে নিলেই কৈবল্য আসবে। আর সেটা থেকে বিভূতি দেখা দেবে বিচিত্র বিকিরণরূপে। জগতে যেখানে যত ভোগ আছে, সমস্তই সমষ্টিভূতের আনন্দ, সে আমারই মাঝে সংহত হবে, সংহত হয়ে বিস্ফারিত হবে। বাইরের জগতে ছড়িয়ে পড়বে। ভিতরে যখন টেনে আনি, তখন সব শূন্যে মিলিয়ে যায়। এটাই কৈবল্য। তখন কী থাকে?

এতৎ subjective, **ইদম্** objective, **তৎ** transcendent. এতৎ—আত্মা, ইদম্—বিশ্ব, তৎ—বিশ্বোত্তীর্ণ। **এতদ্বৈ তৎ**—এই যে শূন্যতার অনুভূতি এটাই সেই বস্তু।

এতেনৈব বিজানাতি। এতেন, আত্মানুভবেন, বিজানাতি বিজ্ঞান—একরস প্রত্যয়, সে রস আত্মানুভবের রস। সবাইকে ভিতরের দিকে টেনে নিয়ে আসা। একই বিষয় বাহিরের দিকে নানা বিষয়রূপে ছড়িয়ে পড়ছে। যখন সবাইকে ভিতরের দিকে টেনে নিয়ে আসি তখন কী থাকে? কিছুই থাকে না, যা থাকে সেই সে।

৪।। জাগ্রত চেতনায় কীভাবে আত্মাকে জানা যায় সেটা আগের শ্লোকে বলা হয়েছে। জাগ্রত চেতনায় আত্মজ্ঞান প্রত্যাহারের ব্যাপার। প্রতিক্রিয়াতে সৃষ্টি হচ্ছে না, সব তলিয়ে যাচ্ছে।

উপনিষদের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য—যা তাঁরা অধ্যাত্মক্ষেত্রে আবিষ্কার করেছেন—তা হচ্ছে চেতনার তিনটি ভূমিতে আত্মচৈতন্যকে জানা, অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে। সব দেশের আধ্যাত্মিক সাধনা জাগ্রত অবস্থাকে নিয়ে। উপনিষদ যুগে ঋষিরা অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাঁরা সাধনাকে শুধু জাগ্রতে না রেখে স্বপ্ন ও সুষুপ্তির মধ্যে তার অনুসন্ধান করেছেন। পরে পতঞ্জলি যোগসূত্রে একটা technique রূপে তার ব্যবহার করেছেন। (স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা ১/৩৮) যোগের মাঝে সমাধির অভ্যাস এটা থেকেই ধরা

হয়েছে। যেমন একটা সাপ বা ব্যাঙ শীতকালে কুম্ভক করে বেঁচে থাকে, ঠিক তেমনি ধ্যানের অনুকূল ব্যাপার প্রত্যেকদিন আমাদের ভিতরে হচ্ছে, স্বপ্নে এবং স্বপ্নান্তে। আমাদের চেতনার তিনটি অবস্থা—জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি। জাগ্রৎ অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি বাহিরের দিকে ছড়িয়ে থাকে। স্বপ্নভূমিতে ইন্দ্রিয় রুদ্ধ হয়ে যায়। ধ্যানে আমরা তাই করতে চাই। আমরা চিত্তকে স্থির করতে চাই। এই ব্যাপার স্বপ্নভূমিতে অর্থাৎ ঘুমের সময়েও ঘটে। তখন অনায়াসে ইন্দ্রিয়জগৎ লুপ্ত হয়। তখন ভিতরে ফোটে আর একটা জগৎ। সেটা ভাবের জগৎ। জাগ্রতে দেহ, প্রাণ, মনের ক্রিয়া চলে। স্বপ্নে, যেমন প্রশ্ন উপনিষদে বলা হয়েছে, প্রাণের আগুন জ্বলতে থাকে। তার ভিতরে প্রকাশিত হয় যে বিজ্ঞান, তার ক্রিয়া স্বপ্নে চলে। জাগ্রতের মাঝেও যে স্মৃতি বা ভাব থাকে তার সঙ্গে এই বিজ্ঞান যুক্ত থাকে কিন্তু জাগ্রতে এই স্মৃতি বা ভাব খুব স্পষ্ট হয় না। সে স্পষ্ট দেখা দিতে পারে যখন আমরা স্বপ্ন দেখি। আমাদের প্রাকৃত চেতনায় দেখি ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে বাদ দিয়েও ভাবকে ভিতরে স্পষ্টভাবে তোলা যেতে পারে। ঠিক সেইভাবে আত্মভাবকে কি ভিতরে তোলা যায় না? এ থেকেই ধ্যানের technique। ধ্যান হচ্ছে যেন জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা। এটা যখন গভীর হয় তখন আসে ভাবসমাধি। একটা কৃত্রিম নিদ্রা। অন্তরিন্দ্রিয় সজাগ থাকলে কোনো একটা ইষ্টের বাসনা বা সংস্কার নিয়ে ভিতরটাকে উদ্বুদ্ধ করলাম। উদ্বুদ্ধ করে চিত্তের একাগ্রতা দিয়ে সে সংস্কারকে স্পষ্ট করে তুললাম। তখন দেবতা আমাদের সামনে প্রত্যক্ষ হন। সেটা self-induced, স্বপ্রণোদিত, সম্পূর্ণরূপে আমাদের বশে। স্বপ্ন আমাদের হাতে নয়, কিন্তু এটা আমরা যখন ইচ্ছা করতে পারি। এটা হল একশ্রেণির পাওয়া বা উপলব্ধি। এটা বিজ্ঞানভূমির দর্শন। প্রাকৃত স্বপ্নেও এর আভাস আমরা পেতে পারি। প্রাকৃত স্বপ্নের দুদিক আছে—একটা হচ্ছে জাগ্রতের repetition পুনরাবৃত্তি বা স্মৃতিকে উদ্দীপ্ত করা, নিজের বাসনার প্রেরণাতে স্বপ্ন দেখা। এটাই হচ্ছে Freud-এর Dream analysis। কিন্তু আমরা কখনও এমন স্বপ্নও দেখি যা বাসনার ঊর্ধ্বলোক থেকে আসে। যেমন স্বপ্নে কোনো মন্ত্র পাওয়া, কোনো দেবতাকে দেখা ইত্যাদি। এটা অন্যধরনের স্বপ্ন। এটাতে আমাদের যে সত্যের দিকে অভিযান চলছে, সেটাই একটা রূপ নেয়। আগের স্বপ্নে প্রাকৃত চেতনার পুনরাবৃত্তি। তার গতি চলছে জাবর কাটার মতো কিন্তু এই দ্বিতীয় স্বপ্ন এটা জাবরকাটা নয়, এটা একটা উপলব্ধি। আবার স্বপ্ন নিরর্থকও হয়।

স্বপ্নকে সমাধির means বা উপায়রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। তা হচ্ছে ইচ্ছা করে স্বপ্নকে induce করা বা ফোটানো। জাগ্রত ভাব পিছনে স্পষ্ট থাকলে সে বোধের মাঝে স্বপ্ন আসে—তার সম্পর্কে সাক্ষীর ভাব রাখা। প্রাকৃত স্বপ্নও সেভাবে করতে পারি। যখন একটা স্বপ্নের মাঝখানে জেগে উঠি তখন আবার ঘুমিয়ে গিয়ে স্বপ্নের বাকিটুকু যদি দেখতে পারি, তাহলে স্বপ্নের মধ্যে একটা control আসে। তখন স্বপ্নতেও নিজেকে আলাদা করতে পারি। মাণ্ডূক্য উপনিষদে স্বপ্নচেতনাকে প্রবিবিক্তভুক্ বলা হয়েছে। আমি আমাকে বিষয় ও বিষয়ীরূপে আস্বাদন করি। স্বপ্নকে এইভাবে চিত্তবৃত্তিনিরোধের উপায়রূপে গ্রহণ করতে পারি। স্বপ্নের পরে সুষুপ্তি। সুষুপ্তি হচ্ছে শূন্যতা। আমরা যখন ঘুমোতে যাই তখন প্রথম আসে সুষুপ্তিভাব। কিন্তু তার মাঝে ফুটে ওঠে স্বপ্ন—যার antechamber-এ পশ্চাৎপটে থাকে প্রাকৃত-চেতনার পুনরাবৃত্তি, এলোমেলোভাবে আবর্তন। তারপরে সবগুলি গুছিয়ে আসে ও পরে স্বপ্নটা কোনো একটি স্পষ্টরূপ ধরে,

তখন মন্ত্র বা দেবতা দেখি। আরও গভীরে যাই যখন, তখন তাও থাকে না, তখন থাকে শুধু স্বপ্নচেতনা, স্বপ্নপুরুষের চেতনায় জেগে ওঠো—এটা হচ্ছে জাগ্রৎ আমিতে আত্মার দর্শন। এটাই ভাবসমাধি। এরপরে অন্ধকারের মাঝে— সুষুপ্তিতে— শূন্যতায় তলিয়ে যাই। মাণ্ডূক্য উপনিষদে সুষুপ্তিকে বলা হয়েছে আনন্দভুক্ সর্বেশ্বরঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বযোনিঃ। তিনি ঈশ্বর। আগে যিনি প্রবিবিক্ত—বিষয় বিষয়ীতে বিভক্ত ছিলেন—তিনি এখানে এক হয়ে যান। জাগ্রতে বিষয় জড়, বিষয়ী চেতন। স্বপ্নে বিষয় আর বিষয়ী দুই-ই চেতন—তবু দুই থাকে আরও গভীরে গেলে সুষুপ্তিতে দুয়ে মিলে এক হয়ে যায়। তখন থাকে শুধু আনন্দ-সত্তা। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে জাগ্রতে বাহিরের জগতে তিনটি চেতনা আছে। প্রথম অন্নময়—আমাদের দেহ। দ্বিতীয় প্রাণময় চেতনা—আমাদের বাসনা কামনা, passions, feelings ইত্যাদি। তারও গভীরে আছে মনশ্চেতনা। তারও গভীরে আছে বিজ্ঞানচেতনা আর আনন্দচেতনা, তারপর আত্মা। এইভাবে পাঁচটি কোষের কথা বলা হয়েছে। তিনটি অন্নময়, প্রাণময়, ও মনোময় কোষে প্রাকৃত বা অযোগের অবস্থা। তারপরের দুটি বিজ্ঞান ও আনন্দে যোগীর অবস্থা। প্রত্যেক কোষের মধ্যে পুরুষ রয়েছে। তাদের পার হয়ে গেলে বিশুদ্ধ আত্মার দর্শন পাব। সুষুপ্তিতে আমরা আনন্দময় পুরুষকে লাভ করব। এই বিশুদ্ধ আনন্দই শক্তি। মাণ্ডূক্যে তাকেই সর্বযোনি সর্বেশ্বর বলা হয়েছে। সমস্ত কিছুই এ থেকে, অব্যক্ত থেকে উৎসারিত হচ্ছে—নিয়ন্ত্রিত controlled হচ্ছে। বিশুদ্ধ শক্তিকে ভাবের উৎসকে অভাবকে সেখানে পাচ্ছি। তত্ত্বের যে স্বরূপ—তা ভাবও নয় অভাবও নয়। ভাব স্বপ্নজগৎ বিজ্ঞানভূমি। আর অভাব সুষুপ্তি জগৎ বা আনন্দভূমি। আত্মা এদুটোকে আলোকিত করছেন। সাংখ্যে পুরুষকে আত্মা বলা হয়েছে। পুরুষের পাশেই অব্যক্ত। সে-ই প্রকৃতি। তাতে লয়ই সুষুপ্তি। তার স্বরূপ আনন্দ— পুরুষেরই সে আনন্দ। কেবল পুরুষেরই কাছে প্রকৃতি শুদ্ধ আনন্দময়ী। এই ভাবধারা শৈবদর্শনে রূপ পেয়েছে। এই প্রকৃতি বা আনন্দ-তত্ত্ব থেকে মহৎ-তত্ত্ব। তাকে বিশ্বস্বপ্ন বলা যেতে পারে। আনন্দতত্ত্ব নীলাকাশ। তাতে যে সূর্য তা বিজ্ঞান বা মহৎ। তারপরে পৃথিবী—দেহ, প্রাণ, মনের লীলা। আকাশে যে সূর্যোদয় তারও ওপারে যে অদৃশ্য আলো—সেই আত্মা।

জাগ্রতান্তে পৌঁছনই বিজ্ঞানের ভূমিতে পৌঁছন—যেখানে জ্ঞান সুস্পষ্ট হয়। আর যে জ্ঞেয় সে সেই জ্ঞানে অভিব্যক্ত হয়। আমাদের প্রাচীন মতে, যে জ্ঞান বাহিরের ধাক্কা থেকে আসে, তাকে প্রাকৃত জ্ঞান বলে। যা অপ্রাকৃত জ্ঞান তাতে ভিতরের ধাক্কা থেকে জ্ঞান বিচ্ছুরিত হয়। যেমন কবির হয়। প্রথম তারই ভিতরে যখন ধাক্কা দিল, তখন সে বাহিরে প্রকাশ পেল ভাষারূপে, বাক্যে এবং ছন্দে। তখন এই তিনটি অবস্থা সুষুপ্তি, স্বপ্ন এবং জাগ্রৎ—উল্টোভাবে আসে। এটা অপ্রাকৃত অবস্থা। সেখানকার যে প্রসন্নভাব তাকে আকাশ বলা যেতে পারে। তার মাঝে আনন্দের উদ্বেলন জাগল। আমি রয়েছি—তারই আনন্দ। আনন্দ ও বিশ্রান্তি। যখন বিশ্রাম পাই তখনই আনন্দ পাই। বাহিরের অবলম্বন ধরে যথার্থ বিশ্রাম হয় না। স্বরূপস্থিতি— সেই বিশ্রামের অনুভব থেকে যে রসচেতনা জাগে—তার যে আনন্দভাব সেটা সর্বেশ্বর, সর্বযোনি। তার থেকেই সব ভাব জাগে এবং ভাগ থেকে বিষয় জাগে। তিনি ভাবের জগৎ এবং জড়জগতকে control নিয়ন্ত্রিত করেন। সুষুপ্তিতে চিত্তের বিশ্রামের ভাব যদি ফুটে উঠতে পারে তাহলে যোগী চেতনার স্বরূপকে পেতে পারে। এটাই বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ অতীন্দ্রিয়ম্। সেখানেই বেশি থাকা আর সেখান

থেকে বাহিরের জগতে কাজ করা—আমরা এই principle বহির্জগতে খাটাতে পারি।

শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের Higher Mind, Illunined Mind, Intuitive Mind ইত্যাদির পিছনে এই principle কাজ করছে। বাইরে থেকে যে-কোনো বস্তুর ধাক্কাকে ভিতরে তলিয়ে দেওয়া আর তাকে ভিতরে স্বরূপস্থিতির বিশ্রান্তিতে পৌঁছানো। তারপরে যে আসে সে বাইরে প্রকাশ হয় অন্যরূপে, দিব্যরূপে। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, আমি কিছু করি না, মা বলাচ্ছেন, মা দেখাচ্ছেন ইত্যাদি। এটাই হচ্ছে সব দিয়ে সব পাওয়া। আকুলিবিকুলির সার্থকতা প্রথমদিকে থাকে কিন্তু সেটাকে চিত্তের নিস্পন্দতা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করে তাঁর সম্পর্কে সুস্পষ্টবোধ সমত্বপূর্ণ বোধ এনে তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করে, শুধু তোমাকে চাই, এইভাবে যদি সমর্পণ করা হয়, তখন এই বোধের বাইরেও বিচ্ছুরণ হয়। তখন আবার বস্তু ভিতর থেকে ফোটে। Surrender এর পিছনে এই ভাবের technique রয়েছে। দুটো জিনিসের দরকার। একটা অসীমতার বোধ, সত্তার বোধ, তার সর্বব্যাপিত্বের বোধ, শুধু তিনিই আছেন। এটাই শূন্যতা, সর্বশূন্যতা। তাতে চিত্তের রিক্ততাকে নিয়ে আসা। শুধু একটা সংযোগের আকাঙক্ষা, কিছু পাবার আশা নয়, কোনো mental construction নয়। এই চিত্তের শূন্যতাকে সর্বশূন্যতার সঙ্গে যখন যুক্ত করা যায় তখন তাকে মন্থন করে এই ভাব জাগে, এ করতে ধৈর্যের দরকার। রবীন্দ্রনাথের একটা গান আছে 'আপন হৃদয় গহন দ্বারে কান পেতে রই'। যখন কিছুই দেখছি না, তখন হতাশ হলে হবে না। যদি এইভাবে থাকি তাহলে ভিতর থেকে আপনা থেকে যে উপচে উঠবে তখন যে প্রাপ্তি হবে সে একটা সর্বাঙ্গীণ প্রাপ্তি, soul এর একটা পরিপূর্ণ growth। এটাই সহজ ধারা। মধ্যযুগ পর্যন্ত যোগীরা এইভাবে সাধনা করতো। বৌদ্ধমতে যাকে সহজযান বলা হতো। কবীরের মধ্যেও এর একটা প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। 'আঁখ ন মুদোঁ কান ন রূধোঁ সহজ সমাধি ভলী।' এটাই চিত্তের শূন্যতাকে পরম শূন্যতাতে যুক্ত করে শুধু প্রতীক্ষায় থাকা।

আমাদের গভীরে এইরকম সুষুপ্তি এবং স্বপ্নজগৎ রয়েছে। ভাবের জগৎ এবং রসের জগৎ। বিজ্ঞান এবং আনন্দের জগৎ। তাকে আবিষ্কার করতে হবে। **জাগরিতান্তকে** এবং **স্বপ্নান্তকে অনুপশ্যন্**। জাগ্রৎ থেকে সুষুপ্তি পর্যন্ত একটা continuity রাখা। আত্মস্বরূপে স্থিত থেকে যদি এগুলিকে drive করি তাহলে দেখতে পাই, শুধু দেখাই থাকে। শুধু দেখা থেকে আবির্ভাব, অস্তিত্ব থেকে আনন্দ, সেটা থেকে ভাব। শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলতেন Bliss of existence। দেহের মাঝে যে ভাব কখনো কখনো ওঠে Joy of living, এটাই আত্মস্বরূপ। তার শক্তির প্রকাশ হয় আনন্দরূপে। সাধনা সব সময় কৃচ্ছ্রসাধন নয়। রসে থাকাতেও আমরা সে ভাব পেতে পারি। সে আনন্দকে অবলম্বন করে ফুটে ওঠে ভাবের জগৎ, সৃষ্টির স্বপ্ন। তারপর বাহ্য বা স্থূল জগৎ। উপনিষদে ব্রহ্মের দিক দিয়ে সব দেখানো হচ্ছে—শুধু অস্তিত্ব বন্ধ। অস্তিত্বের আনন্দ—সেই ঈশ্বর। এ থেকে যে আলো তাকে হিরণ্যগর্ভ (বিজ্ঞান বা স্বপ্নস্থান) বলা হয়। উপনিষদে যাকে বলা হয় তৈজস। তারপর সেটা থেকে হয় বিরাট। সেই বিরাটই জাগ্রৎস্থান। যেমন আমাদের ভিতরে প্রথমে আমি, আত্মবোধ তারপর সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থা, তেমনই cosmic-এও সমষ্টিতেও। সংহিতাতে বিরাট পুরুষের বর্ণনা করা হয়েছে—'সহস্রচক্ষুঃ...'। এখানে আর একটা সাধনার সঙ্কেত আমরা পেতে পারি। আত্মভাবনা থেকে সেটা পরিণত হয় বিশ্বভাবনায়।

একদিকে অভিব্যক্ত হয় পুরুষরূপে আর একদিকে অদিতিরূপে। তিনি আনন্দের শক্তি, যে আনন্দ ভাব এবং বস্তুর সৃষ্টি করছে। যেমন সাধক কবি তেমন তিনিও কবি। কবির ভিতরে যেমন তার অস্তিত্ব, তারই আনন্দ, তার থেকে ভাব, ভাব থেকে ভাষা এবং ছন্দের সৃষ্টি, ভিতর থেকে বাইরে উৎসারণ। আমাদের ভিতরে প্রথম প্রথম এই শুধু-অস্তিত্বের সংস্কার আনা কঠিন নয়। তার জন্য 'স্থিরসুখমাসনম্' করে দেহ প্রাণ এবং মনের শৈথিল্য আনতে হয় প্রযত্নশৈথিল্য দিয়ে আর অনন্ত সমাপত্তি দিয়ে (যোগসূত্র ২।৪৬-৪৭)। কোনো কিছুকে ধরে রাখছি না, দেহ-প্রাণের ইচ্ছাকে, মনকে, সবাইকে শূন্যে পর্যবসিত করছি। নিজেকে আলো, বাতাস হয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছি। ছেড়ে দেওয়া আর ছড়িয়ে দেওয়া এটা থেকে অস্তিত্বের ভাব জেগে উঠতে পারে। অন্তর্যামী তখন প্রশাসন করে। পতঞ্জলির আসনের সূত্র প্রাণে এবং মনে apply করতে পারো। বিশুদ্ধ অস্তিত্বের বোধ নেই বলে এ করতে গিয়ে একটা tension উঠতে পারে, আমরা বাইরের দিক অবলম্বন করে থাকি তাই। জাগ্রতভাবে যদি ঘুমিয়ে থাকতে পারি তাহলে tension থাকে না। যেমন পৃথিবী বিস্তারিতভাবে পড়ে আছে, এটা তার শুদ্ধ অস্তিত্ব। সমুদ্রের যেমন নিজস্ব বিরাট অস্তিত্ব রয়েছে। বিরাট-বোধের জন্য অস্তিত্বের বোধের জন্য, সর্বব্যাপিত্বের বোধের জন্য এসব উপমা বেদে গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন—সর্বব্যাপী বায়ু, আকাশ, আলো, তেজ, সবদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রত্যেকেই প্রশান্ত। শুধু থাকা। তাদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা। এই অস্তিত্বের ভাবনা যত বেশি করব ততই শুদ্ধ অস্তিত্বের সংস্কার আমাদের ভিতরে দৃঢ় হবে। তখন আর নিগ্রহের দরকার হবে না। এই অস্তিত্ব থেকে জাগে আনন্দের জগৎ, ভাবের জগৎ।

উল্টোদিকে যদি আসি তাহলে জাগ্রৎকে সহজে control নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। এটাই বৈদিকদের সাধনা। এটাকে আমরা প্রকৃতিবাদ naturalism বলে অবজ্ঞা করি। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথ আধুনিকযুগে সেই ভাবকে আবার ব্যক্ত করেছেন।

আমরা যদি এইভাবে সাধনা করি—তাহলে দুই ক্রমে হতে পারে। বিলোম ক্রমে জাগ্রৎ থেকে স্বপ্নে আর স্বপ্ন থেকে সুষুপ্তিতে। আর তাকে যদি অনুলোমক্রমে follow করি তাহলে অস্তিত্ব থেকে আরম্ভ করে, প্রথম তার সংস্কার উৎপন্ন করে যদি সেখানে পৌঁছাই তখন আত্মার একটা বিভুত্ব এবং মহিমাকে অনুভব করতে পারি। বিভুত্ব আসে বিজ্ঞানসত্তা থেকে। তাঁর বিচিত্র হওয়া। আর আত্মার মহিমা আসে আনন্দভূমি থেকে। এটাই সত্যিকার মুক্তি। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, 'মন নাহি মোর কিছুতেই'। শুধু আমি আছি, আনন্দ আছে, আলো আছে, সৃষ্টি করবার কোনো কিছু বাসনা নাই। আপনা থেকেই সৃষ্টি হবে।

৫।। শ্লোক ৪ আর ৫ দুটি মিলে একটি দর্শন। এই যে আত্মা তিনি **মধ্বদ** মধুভোজী। যদি আত্মসত্তাকে অনুভব করি তাহলে আনন্দস্বরূপ ও ভাবস্বরূপকে অনুভব করতে পারি। আমি আছি, শুধু তাই বলে স্পন্দিত হওয়া তা-ই উজ্জ্বল। এটা pure existence এর বোধ। তা থেকে bliss এর বোধ। তা থেকে pure understanding এর বোধ—এটাই বিজ্ঞান। এই যদি জাগে তখন সে মধ্বদ হয়। Pure existence তুরীয়। Bliss—সুষুপ্তি। Pure understanding—স্বপ্ন। তারপর জাগ্রৎ। এই জাগ্রৎকে যিনি মধুরূপে ভোজন করছেন তিনি মধ্বদ। অন্য জায়গায় তাঁকেই অন্নাদ বলা হয়েছে। চৈতন্য সবকিছু অন্নরূপে

গ্রহণ করছেন। তিনি সুখ ও দুঃখ হর্ষ ও শোক দুই-ই গ্রহণ করছেন। কিন্তু তিনি নির্বিকার নির্লেপ। ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি। তটস্থ থেকে বিষয়ভোগ। কিন্তু আত্মার অন্তিকাৎ। আত্মাকে যদি অপরোক্ষ করতে পারি তখন আত্মা মধ্বদ হন। এই মধ্বদকে psychic being বলা যেতে পারে। সাধারণ being যা গ্রহণ করে তা থেকে সে সুখী হয় বা দুঃখী হয়। কিন্তু যদি আত্মসত্তাকে পেতে পারি তখন দুইয়ের রূপান্তর হয় রসে। সুখ ও দুঃখ দুইয়ের মাঝেই রস রয়েছে। বাউলরা বলেছেন,

ত্রিভুবন জুড়ে তার প্রেমের প্রকাশ
পরমা প্রকৃতি সেই প্রেমেতে উদাস।
অন্তরে বাহিরে প্রেম, প্রেম ঘরে ঘরে
ভোগে প্রেম, যোগে প্রেম, রোগে প্রেম ঝরে।

এঁরা ভালবাসা দিয়ে কথাটা বলেছেন। সে মত্ততা শিবের ভাঙ্ খাওয়ার মতো। অশ্বিদ্বয় হচ্ছেন মধুর দেবতা। মধুররস আসে রুদ্রগ্রন্থিভেদের পরে। চেতনা ভ্রূমধ্যের ওপারে যাবার পরে।

শুধু আত্মা নয়, এই জীব এই life সমস্ত মধ্বদ হবে—এটাই সমগ্র দৃষ্টি। যিনি আত্মা সেই জীব। Consciousness-ই life। সবকিছু প্রকাশ পাচ্ছে, সমস্ত মধু হয়েছে—মধু বাতা ঋতায়তে... মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। আত্মা যখন মধ্বদ হয় তখন সে ঈশান হয়, mastery আসে—control over everything, ভূতভব্যস্য যা ঘটবে তা দিব্য সঙ্কল্পের অনুযায়ী ঘটবে, আর যা ঘটেছে তাও তারই অনুযায়ী ঘটেছে। সাধকের দিক থেকে বলতে গেলে যা ঘটেছে তার মঙ্গলের জন্য এবং যা ঘটবে তাও তাঁরই ইচ্ছানুসারে সাধকের মঙ্গলের জন্য। তখন জীবনের প্রত্যেকক্ষণ হবে ঋতছন্দা। কোনো কিছুই ব্যর্থ হয়নি। রবীন্দ্রনাথের একটা গানে আছে—প্রথমে একটা ব্যর্থভাব—'আজিকার ব্যর্থ হলো বেলা ব্যর্থ হলো দিন' তারপর হঠাৎ বলেছেন—ব্যর্থ হয়নি... ...। বিবেকানন্দের শেষজীবনেও সেই ভাব দেখি। Joe কে লেখা চিঠিতে তিনি বলছেন, আমি আর সে বিবেকানন্দ নই। যে আছে সে ঐ দক্ষিণেশ্বরের বালক। আমি শুধু ভেসে যাচ্ছি... ইত্যাদি। তাঁর ঈশানকে স্বীকার করা। তিনিই আমার master—এই ভাব সাধকের ভিতরে আসবে। সিদ্ধের দিক দিয়ে যদি দেখি, তখন বুঝব সেই প্রজ্ঞা পুরাণীর অনুশাসনেই সব হচ্ছে। মধ্বদ আত্মাকে ঈশানরূপে দেখি। এই হচ্ছে শক্তির দুটি রূপ। আনন্দ এবং সঙ্কল্প। যিনি মধ্বদ তিনিই ঈশান।

জুগুপ্সা—একটা কিছুকে ঘৃণা করা। এটা হচ্ছে তার সামান্য অর্থ। আসল অর্থ হচ্ছে shrink করা। এই shrinking আসে এক অহং-এর সঙ্গে অন্য অহং-এর বিরোধ থেকে। শামুকের মতন গুটিয়ে থাকা—তাই অহং। সে স্বার্থপর। তার উল্টো হচ্ছে ব্রহ্ম—বিরাট, ছড়িয়ে থাকা। অহং দুর্মতি, ব্রহ্ম সুমতি। ব্রহ্ম নির্বাধ—কোনো বাধা থাকবে না, উরু অনিবাধ, কোনো সঙ্কোচ, বিজুগুপ্সা থাকবে না। যখন মধ্বদ জীবাত্মাকে ঈশানরূপে পাই, তখন সে সর্বভূতময় হয়ে যায়, সর্বোভূত্বা সর্বমেবাবিশৎ। সর্বভূতেষু চাত্মানং... (ঈশ ৬), কোনো recoiling নেই, কোনো shrinking নেই।

৬।। এই জীবাত্মা, তার এই বিশ্বব্যাপ্তি আমাতে যখন পেলাম, তখন সবার মাঝেই পেলাম। তিনি সবার মাঝে পেয়েই রয়েছেন, গুহাহিতম্ গহ্বরেষ্ঠম্ হয়ে রয়েছেন। তাঁর যে

ঈশ্বররূপ তা স্থিতির স্বরূপ। কিরকম তা বর্ণনা করা হচ্ছে—সৃষ্ট প্রকৃতি অনুযায়ী।

সৃষ্টি যে হয়েছে তার মূলে ছিল তপঃ। তা থেকে উৎপন্ন হল অপ্ আর অপ্ থেকে ভূত। যখন মানুষের দেহ প্রতপ্ত হয় তখন সে ঘামে, perspire করে। তেমনি এই যে বিরাট, তার মাঝে আগুন জ্বলছে, তিনি প্রতপ্ত হচ্ছেন, আর প্রতপ্ত হয়ে ঘামছেন। সে ঘামই কারণবারি। এটা একটা অবস্থার বোধ। প্রথম তপঃ, তপঃ থেকে সৃষ্টি। তাই উপনিষদে আছে—স তপঃ অতপ্যত। তপস্তপ্ত্বা অসৃজত্। আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে বলা যেতে পারে যে, অন্তর্মুখীনতা থেকে তাপ উৎপন্ন হয়। তাতে সমস্ত শরীর, প্রাণ, মন প্রতপ্ত হয়।

আকাশ, বায়ু, তেজ, অপ্ ও পৃথিবী এই পঞ্চভূত। কিন্তু কোনো কোনো উপনিষদে তিনটি ভূতের কথা বলা হয়েছে। ত্রিবৃৎকরণে প্রথম দুটি ভূতকে বাদ দেওয়া হতো। তেজ রূপকৃৎ, dynamism। অপের গতি আছে। dynamism থেকে রূপের সৃষ্টি হয় কিন্তু সে রূপ প্রথমে জলের মতো থাকে, কঠিন হয় না। তখন সে সব কিছু হতে পারে। সেটাই আমির বিশুদ্ধরূপ। তখন আমি সব রূপ ধারণ করতে পারি। তারপর সৃজন হয় বিশিষ্ট রূপের। তখন আসে রূপের মধ্যে বিরোধ। ছান্দোগ্য উপনিষদে 'তিস্রঃ দেবতাঃ'র কথা বলা হয়েছে। তারাই বিশ্বরূপের মৌলিক শক্তি। ক্ষিতি, অপ্, তেজ। তেজের মূলে প্রাণ—তা হচ্ছে বায়ু, আর তার মূলে আকাশ। আকাশ প্রজ্ঞান, বায়ু প্রজ্ঞানের শক্তি। আকাশ শিব, বায়ু বা প্রাণ শক্তি। ব্রহ্মসূত্রে আছে, আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ, অতএব প্রাণাঃ। ঐতরেয় উপনিষদে আছে প্রজ্ঞামাত্রা প্রাণমাত্রা। আকাশ-প্রাণের মিথুনই সৃষ্টির মূল। তা থেকে উৎপন্ন হয় তেজ—kinetic energy। তা থেকে রূপছন্দঃ। আর তারপরে ব্যষ্টিরূপ জাগে। Psychologically এটা correct। আকাশের ভাবনা আর প্রাণের dynamism তা থেকে তাপ। সে তাপ থেকে ভাবের উদ্বেলতা আর তা থেকে সৃজন। তেজ, অপ্ ও ক্ষিতির পূর্বে তিনি ছিলেন আকাশ ও প্রাণরূপে। অনন্ত আকাশ, অনন্তপ্রাণ। তিনি কী করছেন? **ভূতেভিঃ ব্যপশ্যত**। তিনি সমস্ত ভূতের সঙ্গে সঙ্গে দেখছেন। এটা বিদর্শন। অদিতির কথা পরের শ্লোকে বলা হবে। যিনি জাত হচ্ছেন, তপের পূর্বে, অপের পূর্বে। √জন্-এর অর্থ প্রাদুর্ভাব—revealed, অব্যক্তম্ ব্যক্তিমাপন্নম্—তিনি **গুহাম্ প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তম্** প্রত্যেক ভূতের ভিতর গুহাতে চুপ করে আছেন চিৎকণরূপে, জীবশক্তিরূপে। তিনি যখন ভৌতিক ব্যাপারে আবিষ্ট হলেন তখন স্বয়ম্ভূ যেন নিজের ভিতরে ছিদ্র করলেন। তখন পরাক্ পশ্যতি। সে বিচিত্ররূপকে দেখা। বি+অপশ্যত—আমি দেখছি না—যিনি স্বয়ম্ভূ, যিনি আমার ভিতরে গুহাহিত, তিনি দেখছেন, এই ভাবনা। **এতদ্ বৈ তৎ**—এই যে তোমার মাঝে রয়েছেন—যিনি সব কিছুকে দেখছেন—সেই তিনি।

শ্লোক ৬, ৭, ৮ তিনটি মন্ত্র সংযুক্ত। প্রথমে পুরুষতত্ত্ব, দ্বিতীয়ে শক্তিতত্ত্ব, তৃতীয়ে জীবতত্ত্ব। আত্মাকে পুরুষরূপে, শক্তিরূপে, সম্ভূতিরূপে আবার জীবরূপে জানতে হবে। প্রথমে তিনি—যিনি সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন, যাঁর থেকে তাপ, তাপ থেকে কারণ শরীর আর তা থেকে ভূতশরীর। তাদের ভিতরে যিনি ফুটেছিলেন দৃক্শক্তিরূপে। সৃষ্টির পূর্বে ছিল চৈতন্য। তার ভিতরে দেখা দিল সঙ্কল্প—Divine will। সোঽতপ্যত, সোঽকাময়ত। আর তা থেকে প্রাণশক্তি—সেই অপ্ আর সেই ভূতরূপে দেখা দিল। তিনটি ভূত— তেজ, অপ্, পৃথিবী—matter, life and spiritual energy। তার ঊর্ধ্বে মহাপ্রাণ বায়ু আর

তার উর্ধ্বে আকাশ—এই সৃষ্টির বিবর্তন। এ সবার ভিতরে তিনি প্রকাশ পাচ্ছেন দৃক্‌শক্তিরূপে। তিনিই বাহিরের দিকে দেখছেন। এটা হলো দৃক্‌শক্তির অনুপ্রবেশ। এটাই পুরুষতত্ত্ব।

৭।। সেই তত্ত্বকে শক্তিরূপে দর্শন করতে হয়। তাকে বলা হয়েছে অদিতি। এঁর conception ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। অবশ্য তাঁর নামে সূক্ত কোথাও নেই, কিন্তু অনেক জায়গায় যেভাবে তাঁর উল্লেখ রয়েছে, তাতে মনে হয়, এক শ্রেণির সাধকের কাছে তিনি ইষ্টদেবীরূপে ছিলেন। এই অদিতি সেই মহাশক্তি। ঋগ্বেদে দুটি Mystic figure দেখা যায়, একটি বরুণ আর একটি অদিতি। বরুণের নামে সূক্ত রয়েছে। অদিতির নামে কোন সূক্ত নেই। বসিষ্ঠসূক্তে বরুণ এবং অদিতিকে এক সঙ্গে দেবতাদ্বন্দ্বরূপে রাখা হয়েছে। পুরাণেও এইরকম দেবতাদ্বন্দ্ব, দুটো form একই ভাবনাকে express করছে। দুটি দেবতার ভাবনা যেন পরস্পরপূরক বা সহায়ক হয়। তখন তাকে দেবতাদ্বন্দ্ব বলে। যেমন—মিত্র-বরুণ। তেমনি বরুণ-অদিতি। একই দেবতারে দুই দিক। বরুণ বোঝাচ্ছে অব্যক্তের রহস্য রাত্রির রহস্য। বরুণ-অদিতি দুই-ই transcendent। অদিতির বিপরীত দিতি—তার থেকে হয়েছে দৈত্য। আর অদিতির থেকে আদিত্য। √দো—খণ্ডন বা বন্ধন করা। যিনি অদিতি তিনি অবন্ধনা, অখণ্ডিতা, অবাধিতা, সমগ্র, নিত্যমুক্ত। Nature-এর কোনো phenomenon-এর সঙ্গে যুক্ত বোঝা যায় না। কোনো কোনো সময় সে অসীম আকাশকে বোঝায়। তার ভিতরে সাতটি আদিত্য-চেতনার রূপ জেগে উঠেছে। বরুণ অদিতি দুই-ই ব্রহ্ম। বরুণ ব্রহ্ম পুরুষরূপে। অদিতি ব্রহ্ম শক্তিরূপে। অদিতিই ব্রহ্মশক্তি। একশ্রেণির ঋষিরা তাঁকে ব্রহ্ম বলেছেন। অদিতি মাতা স পিতা স পুত্রঃ, তিনিই মাতা, তিনিই পিতা, তিনিই পুত্র। তিনি মহেশ্বর, তিনি উমা, তিনি কুমার। পতি, পাশ আর পশু—ব্রহ্ম, শক্তি আর জীব একটা Trinity ত্রয়ী। অদিতিকে বরুণের counterpart বলা যায়। বসিষ্ঠের মন্ত্রে সে মিথুনভাব পাওয়া যায়। দুইজনেই সমতুল্য, সমস্ত সৃষ্টির উর্ধ্বে অসম্ভূতির ক্ষেত্রে। পুরাণে পুরুষকে অসঙ্গ বলা হয়েছে। বরুণ অসঙ্গ। তিনি সর্বাতীত। অদিতি তন্ত্রে পরিণত হয়েছে কুমারীতত্ত্বে। শূন্য থেকে সমস্ত কিছুর উদ্ভব হয়, তাকেই তাঁরা বলেছেন কৌমারীতত্ত্ব থেকে সব সৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে। খ্রিস্টান ধর্মের Virgin Mother conception-এ এই ভাব পাওয়া যায়।

Philosophically বা দর্শনের দৃষ্টিতে বলতে গেলে, সৃষ্টির মূলে একটা শক্তি ক্রিয়া করছে, তিনিই সৃষ্টি-প্রসূতি মাতা। যখন আমরা উজিয়ে যাই তখন দেখি সে কিছুই প্রসব করছে না। তখন সে কুমারী। আবার সেই কুমারীই সব প্রসব করছে। অথর্ববেদে বন্ধ্যা গাভীর উপমা ব্যবহার করা হয়েছে। তাকে তাঁরা বলতেন বশা। যজুর্বেদে বশার কথা আছে। √বশ্ ধাতুর অর্থ to wish, to seek, অথচ বশা বোঝাচ্ছে বন্ধ্যা গাভীকে। Mystic-দের মাঝে **'গাভিয়া বঞ্ঝা'** কথার ব্যবহার মধ্যযুগ পর্যন্ত চলেছে। মূলে অটল, অচল তত্ত্ব। সে অনির্বচনীয় এক রহস্যের মাঝে জগৎ-সৃষ্টির কল্পনা জাগছে। এই বন্ধ্যাগাভী বা virgin mother conception ঈশোপনিষদে অন্যভাবে বলা হয়েছে। সেখানে বলেছে অসম্ভূতি এবং সম্ভূতি দুটিকে এক সঙ্গে জানতে হবে। তখন পুরোপুরি জানা হবে। একদিক দিয়ে সে অব্যক্ত আর তার মাঝে যেন সূর্যোদয়। যেমন সূর্যকে তেমন মহাশূন্যকে দেখতে হবে। এইভাবে অদিতির পূর্বে বরুণ যেন transcendent। বরুণ থেকে

সৃষ্টি হয়েছে বলা হয়নি। সে লয়স্থান, যা বুদ্ধের নির্বাণস্থান। সেখান থেকে পুনরাবৃত্তি নেই। একদিকে সমস্ত সৃষ্টির উৎসারণ অথচ তার মূল অচঞ্চল। এই অদিতিকে তন্ত্রে দেবী সর্বশক্তিময়ী, ভাবরূপিণী ইত্যাদি বলা হয়েছে। আবার তিনি শূন্যা। যখন তিনি শূন্য তখন তিনি বৌদ্ধদের প্রজ্ঞাপারমিতা আর হিন্দুদের কালী, তারা। যখন তিনি সর্বশক্তিময়ী তখন তিনি ষোড়শী, কমলা ইত্যাদি। শূন্যতা থেকে পূর্ণতা। সমাধি থেকে ব্যুত্থান। সেই অদিতি দুই-ই, রিক্তা এবং পূর্ণা। এই শ্লোকে কথাটা সম্ভূতির দিক দিয়ে বলা হয়েছে। আগের শ্লোকে দৃক্‌শক্তির অনুবৃত্তি ছিল। দ্রষ্টা সর্বত্র। বোধের প্রকাশ সবার ভিতরে হচ্ছে। এই বোধের যে dynamism বা সক্রিয়তা তার কথা এখানে বলা হয়েছে। তারপরে এই দুটো জীবের মাঝে কী করে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব সেটা বলা হবে। তারপরে আবার সেই বিন্দুভাব কী করে বিস্ফারিত হয় বলা হবে।

প্রথম চেতনার একটি বিস্তার, প্রশান্তি, এক শূন্যতা—এটাই দৃক্‌শক্তি। শুধু দেখছি। তার ভিতরে মহাপ্রাণের একটা স্পন্দন—এটার অনুভব। সেটা দ্বিতীয় পর্ব। তারপর দুটি অনুভবকে নিজের মধ্যে নামিয়ে আনা—ভ্রূমধ্যে বা হৃদয়ে—সেটা তৃতীয় পর্ব। হৃদয় তাই প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃতের কেন্দ্রস্থান। মাথার উপর মহাশূন্য—অব্যক্ত। সে মহাশূন্যের স্পন্দন, সেটাও মাথার উপরে। সেটা concentrated (ঘনীভূত বা সংহত) হয় হৃদয়ে। নেমে এসে মহাশক্তির সংহতি হয় হৃদয়ে আর তার থেকে বিস্ফারণ—সেটা একটা ছন্দ। প্রথম একটা sense of infinity—অনন্তের বোধে বোধিত হয়ে সমস্তে ছড়িয়ে পড়া। 'হংসঃ'—যখন আবিষ্ট তখন সঃ, যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন হং। ঊর্ধ্বে তত্ত্বের একটা অসঙ্গ মিথুন—বরুণ এবং অদিতি। **অদিতিঃ দেবতাময়ী**—তিনি সমস্ত দেবতার জননী। চেতনার সমস্ত বিভূতিগুলি তাঁর থেকে এসেছে। অদিতি থেকে আদিত্য। পুরাণে দ্বাদশ আদিত্যের কথা বলা হয়েছে। সাতটি আদিত্যের কথা ঋগ্‌বেদে বলা হয়েছে। তিনটি উজানে, তিনটি ভাটাতে, মাঝখানে একটি আদিত্য সেতুর মতন। যেমন সপ্তলোকের কথায় আছে। যে আদিত্য সেতুর মত তিনি ভগ—ভগবান। সবার ঊর্ধ্বে বরুণ আর নিম্নে অংশ। বিষ্ণুতত্ত্বকে অবলম্বন করে বরুণ পর্যন্ত উজিয়ে যেতে হবে। আর একটা imagery আছে। অদিতির আটটি পুত্র—সাতটি দিলেন দেবতাদের—তারা সক্রিয়। আর একটি পুত্র মার্তণ্ড—সেই মার্তণ্ড সূর্য অথবা মৃত অণ্ড—মরা ডিম। এটা অসম্ভূতি তত্ত্ব। সাতটি দেবশক্তি চিৎশক্তির বিভাব। আর একটা তত্ত্ব মার্তণ্ড শূন্য বা প্রলয়। বৌদ্ধদের শূন্য, বৈদিকদের অসম্ভূতি, গীতাতে যাকে পরম অব্যক্ত বলা হয়েছে। অদিতি থেকেই সম্ভূতি ও অসম্ভূতি দুটোই হয়েছে। সম্ভূতি তার প্রাণস্বরূপ। অসম্ভূতি আকাশস্বরূপ। তিনিই আকাশ, বরুণই আকাশ। বরুণ কুমার, অসঙ্গ। অদিতি কুমারী। এটাই পরমতত্ত্ব। এটা বিসৃষ্টির পূর্বে। আবার এটাই প্রাণতত্ত্ব। যিনি **প্রাণেন সম্ভবতি**। যিনি আকাশ স্বরূপ হয়ে প্রাণরূপে স্পন্দিত হচ্ছেন। তিনিই দেবতাদের মা। প্রাণের স্পন্দনে দেবতারা জাগল, চিৎশক্তির বিচ্ছুরণ হল। এটা সৃষ্টির একটা ধাপ। তারপর অন্যধাপ বলা হচ্ছে **গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীম্ যা ভূতেভিঃ বি-অজায়ত** তারপর আবার **ব্যপশ্যত**। এখানে জননী-শক্তি জাত হলেন আর তার মাঝে সাক্ষীভাবে রইলেন—এটা তারই পরিণাম, সন্তান যেমন মায়ের পরিণাম। এটা বিজাতি—**বি-অজায়ত**, বিচিত্ররূপে জাত হলেন। আর একটি অর্থ আছে। তিনি বিশেষরূপে জাত হলেন। সাধারণভাবে উদ্বুদ্ধ হওয়া প্রজাতি। আর বিশিষ্টরূপে উদ্বুদ্ধ

হওয়া বিজাতি। ঋষির মনে এই ভাব ছিল—যে অদিতি ভূতে ভূতে আবির্ভূতা তা মূল অসঙ্গ। এই ভাবই দেবীসূক্তে পাই। সেখানে তাকে বলা হয়েছে উপস্পর্শ। যেমন একটা tangent circle এর একটা pointকে ছুঁয়ে রয়েছে। তাকে যদি extend করা যায় তাহলে মনে হয় যে বিন্দুই ওই বর্তুলকার ধারণ করেছে। এই idea physics এ আধুনিক যুগে দেখা দিয়েছে। আইনস্টাইন বলেছেন matter কিছুই নয়, শুধু space এর curvature। আমাদের যেমন ৭ এর চিহ্ন। দাঁড়িকে আমরা নিঃসঙ্গ, অসঙ্গের চিহ্ন বলতে পারি। তার একটা বিন্দুতে বাঁক ধরবার আকাঙক্ষা জন্মাল। এটাকেই সৃষ্টির জন্ম বলা যেতে পারে। এটাই উপস্পর্শ। কাছে থেকে স্পর্শ দেওয়া। তখন যা উৎপন্ন হয় তা বিজাতি। যদি বলি একটি রেখা এসে পাক নিয়েছে তখন হয় প্রজাতি। তখন সম্পূর্ণরূপে জন্ম বলতে পারি। সবই তিনি। সাংখ্যের ভাষায় সবই প্রকৃতি। অদিতি আর প্রকৃতি যদি এক বলি, তাহলে সবই তিনি। তখন এটা প্রজাতি। অথচ সব হয়েও তিনি তার অতীত, সবাইকে ছাড়িয়ে আছেন, অথচ ছুঁয়ে আছেন, তখন বিজাতি tangent এর মত। তেমনি তিনি প্রত্যেক ভূতে atomic structure হয়ে, ধূলিকণারও মাঝে তার গুহাতে তিনি স্থির হয়ে আছেন, বিদ্ধ করে রয়েছেন। আর যদি বিজাতিরূপে ভাবি, তখন আমাদের আধারে, যেখানে একটা nucleus রূপে রয়েছেন, মধ্যে আত্মনি, সেটা হৃদয়ে, ভ্রূমধ্যে বা নাভিতে। যেখানে অদিতির একটা আবেশ বা স্থিতি আছে, যে বিন্দুতে সে বিদ্ধ হয়েছে, তার ওপারেও সে প্রসারিত। ঊর্ধ্বে তিনি রয়েছেন অসম্ভূতিরূপে আর আমাদের মাঝে তিনি কুণ্ডলী পাকিয়ে আছেন, সেটা সম্ভূতি। যখন বিভূতি, তখন বৈচিত্র্য phenomenon of multiplicity। আমার ভিতরে যে ইষ্ট তিনি সবার মাঝে আছেন। সবই তিনি। বিভূতি Manifold becoming। সম্ভূতি—Total becoming। এই দুইভাবেই অদিতি সবার মাঝে বিজাত হয়েছেন।

সৃষ্টির মাঝে প্রথম চৈতন্য, তারপর তাপ, তাপ থেকে অপ্, আর অপ্ থেকে ভূত। তেমনি আর একদিকে প্রথম অদিতি, তাঁর চিৎশক্তি—তাঁর প্রাণ, তা থেকে দেবতা, আর তারপর ভূত। লক্ষ্য করার বিষয়, এই যে দুটি সৃষ্টির যে ক্রম (order) রয়েছে, তাতে একটা পারস্পরিকতা রয়েছে। প্রথম order-এ নীচের তত্ত্বগুলি জড়বৎ কিন্তু এখানে দ্বিতীয় সৃষ্টিতে শক্তির কথা বলা হয়েছে। তাই নীচের তত্ত্বগুলিকে চৈতন্যরূপে বলা হয়েছে। পুরুষের দৃষ্টিতে যখন সৃষ্টিকে দেখি তখন তার counterpart জড়। কিন্তু যখন শক্তির দৃষ্টিতে সৃষ্টিকে দেখি তখন তার counterpart চৈতন্য। শক্তি ও চৈতন্যের অভেদভাব—যুগনদ্ধতা দেখানো হয়েছে। আরও সহজ কথায় বলতে গেলে every living being is a conscious being and every conscious being is a living being.

অনন্ত ঠিক এমনি করে আমাদের মাঝে সান্ত হচ্ছে। এতদ্বৈ তৎ। আমার মাঝে তাঁরই বিজাতি— সেই তিনি, ওটাই সে। Transcendent ও individual দুই-ই এক। শূন্যের হওয়া আর হওয়ার পরিণাম শূন্যতা। একটা শিবের কথা, একটা শক্তির কথা।

৮।। জীবচৈতন্যের কথা। জীবচৈতন্যকে অগ্নিস্বরূপ বলা হয়েছে। জাতবেদা হচ্ছে অগ্নির বিশেষণ। ঋগ্বেদে আছে, যা কিছু জাত হয় অথবা যা বারবার জাত হয় তার যিনি বেত্তা—তিনি জাতবেদা। সমস্ত ভূতের ব্যষ্টিরূপে উৎপত্তি, তার মূলে একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ

রয়েছে। এক বৈশ্বানর অগ্নি সর্বব্যাপী। তিনি ব্রহ্মচৈতন্য। নিরুক্তকার ব্যাখ্যা করেছেন বিশ্বনরে যিনি রয়েছেন, তিনি বৈশ্বানর। সর্বব্যাপী অগ্নিময় চৈতন্য। ভূতের জন্মের সময় সে চৈতন্য তাতে আবিষ্ট হয়ে বারবার জাত হয়ে চলেছে। Europeansরা বলেন ঋগ্বেদে পুনর্জন্মের কথা নেই। কিন্তু ঋগ্বেদে একটি মন্ত্র আছে—জন্মন্-জন্মন্-নিহিতো জাতবেদাঃ (৩।১।২১)। জন্মের অর্থ যদি birth বোঝা যায়, তাহলে বারবার জন্ম বা পুনর্জন্মের কথা আছে। জন্ম বলতে Race বা Being অর্থ যদি বুঝি, তখন একজীবের বিভিন্ন জন্ম বা যিনি বারবার জন্মাচ্ছেন, অনেকের ভিতরে—এই দুটি অর্থ করা যায়।

জাতবেদা অর্থাৎ জন্মজন্মান্তরের যিনি বেত্তা বা সাক্ষী। এই জাতবেদাই জীবাত্মা। সে নিহিত রয়েছে **অরণ্যোঃ**—দুটি অরণির মাঝে। একটি অধরারণি—শক্তি। অপরটি উত্তরারণি—শিব। অধর অরণি পাতা থেকে আর উত্তর অরণি মন্থন করে। তখন অধর অরণির মধ্যস্থলে একটি আগুন জ্বলে। জীবের জন্ম এইভাবে হয়। ঊর্ধ্ব থেকে একটি চিৎশক্তি আধারে আবিষ্ট হয়। আর আবিষ্ট হয়ে তার অনুকূল ব্যবহার করে। একটি আধারে প্রথম নির্মাণশক্তি তার আবাসস্থান নির্মাণ করছে। যখন আবাস তৈরি হল, তখন চিৎশক্তি এসে তাতে আবিষ্ট হল। তখন চিৎশক্তির সঙ্কল্পে সে সঞ্জীবিত হয় এবং তার অনুকূল ব্যবহার করে। আমাদের প্রত্যেকের মাঝে সেই একই ব্যাপার হচ্ছে। সেই চিৎশক্তি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে হৃদয়ে নিহিত হচ্ছে। আমাদের আধার হচ্ছে—অধরারণি আর চিৎশক্তি উত্তরারণি।

এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদেরই একটি মন্ত্র, গর্ভ ইব সুধিতো গর্ভিণীভিঃ (৩।২৯।২)। **গর্ভিণীভিঃ** বহু গর্ভিণীদ্বারা **সুভৃতঃ** সুন্দর করে ভৃত, পোষিত গর্ভের মতো। সে একটি গর্ভিণীর একটি গর্ভ তা নয়। এটি পুরাণে কুমারসম্ভবে কুমারের কল্পনায় দেখানো হয়েছে। আমাদেরই দিব্যজীবরূপে উৎপত্তি, তাই কুমার। যখন তিনি উৎপন্ন হলেন তাকে পোষণ করেছিলেন ছ'টি মা। আর যদি উমাকে ধরা যায় তাহলে সাতটি মা। আগুনের সাতটি মা; তাঁরা হচ্ছেন; সপ্ত আপঃ। ঈশোপনিষদে এই অপ্ শব্দের ব্যবহার আছে, 'তস্মিন্ অপো মাতরিশ্বা দধাতি' অপ্ energy বা work আর একদিকে জল। প্রাণশক্তির energisation স্পন্দন—আপঃ। সাতটি অপ্-শক্তি চিৎশক্তিকে ধারণ করে আছেন, লালন করছেন। এই সাতটি অপ্-শক্তিকে ধারণ করে আছেন সাতটি সমুদ্র। তার মাঝে আবার এক একটি করে সাতটি ভুবন উৎপন্ন হয়েছে, যেন তার ভেতরে বয়ার মতো ভাসছে। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ তপঃ, সত্য, প্রত্যেকজীবে এই সাতটি principles সমাবিষ্ট রয়েছে, তার ভিতরে পরার্ধ এবং অপরার্ধের ভাগাভাগিও রয়েছে। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ lower। জনঃ, তপঃ, সত্য ঊর্ধ্ব বা upper। মহঃ মাঝখানে। আর তার আশেপাশে তিনটি করে ছ'টি মাতা। কুমার জননীতেও উমা মাঝখানে। আমাদের মাঝেই এইসব possibility-এর বিকাশ হতে পারে। জনঃ, তপঃ, সত্য হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ আর ভূঃ ভুবঃ স্বঃ দেহ, প্রাণ মন। আর বুদ্ধি বা মহঃ। এইভাবে ভাগ হবে যদি অধ্যাত্মভাবে দেখি। আর যদি অধিদৈবতরূপে দেখি তখন Universal Body, Vital Being, Mind ইত্যাদি। এইগুলিকেই এখানে গর্ভিণী বলা হয়েছে। We are nourished by seven mothers। যেমন গর্ভস্থিত ভ্রূণ তা থেকে nourishment পাচ্ছে তেমনি আমরাও তাদের মাঝে রয়েছি, nourished হচ্ছি। Jung এর theory of Unconscious। ভ্রূণেরই একটি তপস্যা রয়েছে, সেটা হচ্ছে এই গর্ভেরই

আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা। এটাই নচিকেতার অভীপ্সা। বরুণে স্থিতি বা লোকোত্তরে প্রতিষ্ঠা এই যে নিহিত রয়েছে তাকে **ঈড্য** করতে হবে। তার সাধারণ অর্থ স্তুতি। কিন্তু প্রাচীন অর্থ অগ্নিকে জ্বালিয়ে দিতে হবে। অগ্নি সর্বব্যাপী হবে, তাতে আহুতি দেওয়া বা সমিদ্ধ করা। অগ্নি কী করে পরপর আমাদের মাঝে জ্বলবে, তার graphic বর্ণনা অনেক স্থানে পাওয়া যায়। তার eleven steps রয়েছে। প্রথমে তাকে প্রবুদ্ধ করতে হয়, তারপর সমিদ্ধ তারপর ছড়িয়ে পড়া ইত্যাদি। নিজের মাঝে অগ্নিমন্থন করতে হবে এটাই অগ্নিচয়ন, অগ্নিহোত্র কর্ম। **দিবেদিবে** দিনের পর দিন। দিব্—Day দ্যুলোকের আলো। দিব্ অন্য অর্থে জাগ্রৎ চেতনা। উপনিষদের সমনস্কতা। রাত্রির মাঝেও অগ্নিবিদ্যা চলতে পারে। দিন এবং রাত্রির দুটো বিদ্যাকে যে জানে তাকে অহোরাত্রবিদ্ বলা হতো। শুধু দিনের বেলা যারা অগ্নিচয়ন করে তাদেরকে অহর্বিৎ বলা হতো। আমাদের ভিতরের অগ্নিকে প্রবুদ্ধ ও সমিদ্ধ করে তুলতে হবে। এভাবে যাঁরা জাগ্রত থাকেন তাঁদের দ্বারা **জাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিঃ**। মানুষ এমনি করে তার নিজের হৃদয়ে আগুনকে জ্বালিয়ে তোলে, যে অগ্নিকে সাতটি মাতা আপঃ পুষ্ট করছে আর যিনি জাতবেদা। মানুষকে সবসময়ই জেগে থাকতে হয়। সব সময় আহুতি দিতে যেতে হয়। যা কিছু বাহির থেকে আহরণ করছি সমস্তকে সেই অগ্নিতে সমর্পণ করব। তখন অগ্নি সবদিকে সবকিছুতে ছড়িয়ে পড়বে। তখন জাত-বেদা বৈশ্বানর হবে। যিনি স্ফুলিঙ্গরূপ তিনি জাতবেদা। আর যখন সমস্ত আধার জ্বলে উঠবে, সারা ভুবনে ছড়িয়ে পড়বে, তখন তিনি বৈশ্বানর। তারপর তিনি মহাশূন্যে মিলিয়ে যাবেন। ঋগ্বেদে বৈশ্বানর-সূক্ত আছে, তাতে বৈশ্বানরের একটি স্বরূপকে মহাশূন্য বলা হয়েছে। একটি individual fire আর একটি universal fire। জাতবেদারূপে অগ্নিবীজ আমাদের ভিতরে রয়েছে আর সে বিশ্বশক্তি থেকে পুষ্ট হচ্ছে। আমাদের কর্তব্য-সচেতন হয়ে তাকে জ্বালিয়ে তোলা। এই অগ্নিসমিন্ধন অজ্ঞাতভাবে সবার মাঝে চলছে। আমরা জানি বা না জানি। সে তিনিই। এতদ্বৈতৎ।

এমনি করে বিশ্বোত্তীর্ণ, বিশ্বাত্মক আর জীবভাবে তাঁরই প্রতি আমরা চলছি। Transcendental universal and individual all are moving towards that, এই তিনটি ভাবনাকে আমরা এইভাবে একাগ্র করতে পারি। প্রথম শ্রদ্ধা দিয়ে ভাবনা করা যে আমাদের বেষ্টন করে রয়েছে—মহাশূন্য। তাতে রয়েছেন চিৎশক্তি—যিনি আমাদের সমস্তকে স্ফূটিত করছেন। আর একটা স্ফূলিঙ্গ রয়েছে আমাদের হৃদয়ে। আমাদের তাকে মন্থন করে জাগিয়ে তুলতে হবে। সে বিশ্বোত্তীর্ণ হবে, আর তারপরে মহাশূন্যে তার লয় হবে। আমাদের দেহ মন প্রাণকে ঘিরে রয়েছেন—অনন্ত। সাধনার দ্বারা আমাদের আত্মবিস্ফারণ ঘটাতে হবে, যাতে সব বন্ধন ভেঙে যায়, আর আমরা সেই অনন্তের সাথে এক হয়ে যেতে পারি।

৯।। সাধনার আর একটি ধারা এখানে পাচ্ছি। এটা **সূর্য**-সাধনা। সূর্যের একটা আবর্ত গতি আছে। সে অব্যক্ত থেকে **উদয়** হচ্ছে—আবার অব্যক্তে লয় হচ্ছে, **অস্তে** যাচ্ছে। এই দুটো অব্যক্ত একটি বিন্দুতে মিলেছে, যেখান থেকে উদয় হয় আর যেখানে অস্ত হয়—সেই সন্ধিবিন্দুতে সমস্ত দেবতারা **অর্পিতাঃ** অর অর্থাৎ শলাগুলো যেমন নাভিতে গিয়ে জুটে তেমনি অব্যক্তেও চিৎশক্তির উদয়—আর সেই অব্যক্তেই তার প্রলয়—সেই সন্ধিবিন্দুতে সমস্ত দেবশক্তি সংহত, অর্পিত হয়েছে। সে সন্ধিবিন্দু কোথায়?

আমাদের দেহে সে সন্ধিবিন্দু হচ্ছে একটি হৃদয়ে, একটি ভ্রূমধ্যে আর ঊর্ধ্বে ব্রহ্মরন্ধ্রে। আমাদের সমস্ত চিত্তবৃত্তি—অবিদ্যাবৃত্তি নয়, বিদ্যাবৃত্তি সৌর চেতনায় আবিষ্ট হয় ভাস্বর রূপে। তাদের যেমন উদয় হয় তেমন অস্ত হয় সেই বিন্দুতেই। হৃদয় থেকে উদয় হয় আবার সেখানেই অস্ত হয়। ঠিক তেমনই ভ্রূমধ্যে ও ব্রহ্মরন্ধ্রেও হয়। এই বিন্দুতে সমস্ত দেবতারা অর্পিত হন। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেবতার অর্থ ইন্দ্রিয়বৃত্তি—চিন্ময় ইন্দ্রিয়বৃত্তি। প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছিল সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো পরাক্ পশ্যাতি—going out; কিন্তু ভাবনা করতে হবে—তারা ভিতরে আসছে—অর্পিত হচ্ছে।

আমরা নিস্পন্দ থাকলেও বাইরে থেকে বিষয় আঘাত করবে। তখন আমাদের চেতনা উদ্রিক্ত হবে। তখন সেই চেতনাকে বাইরে যেতে না দিয়ে ভেতরে নিয়ে যাওয়া—এখানে প্রত্যাহারের সঙ্কেত পাই। বাইরের যা কিছু feeling প্রতিভাত হবে—সাধু বা অসাধু, সুন্দর বা অসুন্দর সবাইকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া—আর তাতে লয় করা এটাই আত্মসমর্পণের ভাবনা। তিনি অন্তরে রয়েছেন, বাইরের সমস্ত কিছুকে আহরণ করে ভিতরের দেবতাকে দিচ্ছি। এই যে প্রলীন করা—এই যে সাধনা তার ফলে যে রিক্ততার বোধ, সেও তিনি। এতদ্বৈতৎ। গীতাতে আছে, শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি (৪।২৬)। ইন্দ্রিয়সমূহকে জ্ঞানাগ্নিতে হোম করা not to react, কোনো প্রতিক্রিয়া না করা—সমস্তকে নিজের ভিতরে তলিতে দেওয়া। এটা আসে তিতিক্ষার দ্বারা। ভিতরটাকে গুটিয়ে রাখছি—আর বাইরে থেকে যা আসছে তাকে তলিয়ে দিচ্ছি। যা আসছে সমস্তই সেই মহাজ্যোতি থেকে আসছে—সেই জন্য এখানে সূর্যের ভাবনা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত সেখান থেকে উঠছে—আর সেখানে অস্ত যাচ্ছে—হৃদয়ে বা ভ্রূমধ্যে বা ব্রহ্মরন্ধ্রে। তার থেকে যে বোধ, সে তিনিই।

১০।। ভেদজ্ঞান থাকবে না। সহজ অবস্থার কথা। আমরা **ইহ** আর **অমূত্রের** মাঝে তফাৎ করি। প্রাকৃতদশায় যখন আমরা থাকি তখন আমাদের যে লক্ষ্য সে থাকে দূরে। আমি এখানে, সে দূরে—এরূপ ভাব আসে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, অজ্ঞানীর ঈশ্বর হোথা, হোথা—কিন্তু জ্ঞানীর ঈশ্বর হেথা, হেথা। এই দূরত্বের সংস্কার দূর করতে হবে। তখন ভাবতে হয়, একটা ব্যাপক সত্য চারিপাশে রয়েছে—আর আমরা তার মাঝেই রয়েছি। রামকৃষ্ণদেব দেবেন্দ্র ঠাকুরের সাথে দেখা করতে গেলেন। তখন দেবেন্দ্রঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার অনুভব কী রকম? রামকৃষ্ণদেব বললেন, 'ব্রহ্ম যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্রের মতন—আর তার ভিতরে মীনের মতন বিচরণ করছি।' সেই তিনি এই হয়েছেন, যদি তা ভাবি, তাহলে এখানে যা দেখছি, তাই ওখানে আর যা ওখানে তা এখানে। কিন্তু আমাদের এখানকার দেখা খণ্ড দর্শন। খণ্ড দিয়ে অখণ্ডকে দেখতে গেলে খণ্ডের সংস্কার থেকে যায়। কিন্তু সেই অখণ্ড বোধ থেকে যদি এই খণ্ডের দর্শন করি তাহলে দর্শনধারা সহজ হয়। সেই অসীম যেন আমায় আকর্ষণ করছেন বারে বারে, তাঁর মাঝে আমার চিত্ত লয় হচ্ছে। এখানকার সংস্কার যখন ভাঙবে তখন জগৎ স্বপ্নের মতন মনে হবে। কিন্তু যখন সেই চেতনা স্বচ্ছ হয়—তখন রসের উল্লাস চিত্তে জাগে। আনন্দরূপে তার উপলব্ধি হয়। এটাই সচ্চিদানন্দের উপলব্ধি। 'অস্তি ইতি' উপলব্ধি হয়। তিনি আছেন—প্রশান্তি মাত্র। তা যখন গভীর হবে, তখন সৎ, চিৎ সব ছায়ারূপে মনে হয়। গীতাতে বলা হয়েছে—'ন ত্বহং তেষু, তে ময়ি'—আমি ভূতগ্রামে নেই কিন্তু তারা

আমার মাঝে রয়েছে। আমি তাদের মাঝে নিঃশেষিত হইনি। আমাদের মাঝে একটা sense of unreality থাকে। তারপরে আমরা যখন জাগ্রত হই, তখন মনে হয়, সব তিনি। ইহ এবং অমুত্রে তফাৎ করা—সেই নানা। 'নানা'র অর্থ হচ্ছে একটা থেকে আর একটার তফাৎ করা। একটা শ্রেয়ের goal—আর একটা প্রেয়ের goal। সেই অর্থেও 'নানা' প্রয়োগ হতে পারে। যে এখানে ও ওখানে তফাৎ করে, সে মৃত্যু থেকে মৃত্যুকে লাভ করে। এইটার দুটো অর্থ হতে পারে। একবার মরে যে আবার মরে। সংহিতাতে পুনর্জন্মের কথা ছিল না—ছিল পুনর্মৃত্যুর কথা। মৃত্যুকে যদি স্বীকার করি তাহলে আবার মরতে হবে। আর যদি স্বীকার না করি তাহলে মৃত্যু বলে কিছুই থাকে না। এটাই হচ্ছে অস্তিত্বের ভাবে নিজেকে সব সময় রাখা। পুনর্জন্মের ভীতি জাগে তখন, যখন এখানকার অস্তিত্বের অস্বীকার করি, নেতিবাদ থেকে। যখন বলি আমি আর মরব না, বার বার মরব না, তখন অস্তিত্ব স্বীকার করি। এখন পুনর্জন্মের প্রতিষেধ বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু উপনিষদে পুনর্মৃত্যুর প্রতিষেধের কথা বলা হয়েছে। ঋগ্বেদে সোমমণ্ডলের শেষে সমস্ত কিছু positive ভাবে বলা হয়েছে। পুনর্জন্ম কোনো বিভীষিকা নয়। দেবতাদের জন্ম হয়—তেমনি আমাদের জন্ম হয়। কিন্তু আমাদের মৃত্যু হয়, তাদের মৃত্যু হয় না। দেবতারা অমৃত কিন্তু তারা জাত। সে পরমচেতনা জাত হয়, কিন্তু তার বিলোপ হয় না। শঙ্করাচার্য সেটাকে অন্যভাবে বলেছেন। 'অবিদ্যার নাশে বিদ্যার জন্ম হয়, কিন্তু একবার বিদ্যার জন্ম হলে তার নাশ হয় না।' তাঁকে নিয়েই অস্তিত্ব। তাঁকে নিয়ে আছি—এই ভাবনা। তিনি চিরন্তন হয়ে রয়েছেন—substratum বা ভিত্তিরূপে তাঁকে আবিষ্কার করতে হবে। তাতে নিজেকে বিলীন করে দিতে হবে। সমস্ত অস্তিত্বের বোধে চেতনাকে ব্যাপ্ত করে দিতে হবে।

এটা অত্যন্ত সহজে আসতে পারে, যদি শুধু এই ভাবনা করি, তিনি আছেন, আকাশবৎ, সমস্ত কিছুকে অনুপ্রবেশ করে রয়েছেন। ওই আকাশবৎ হওয়াতেই আমার অস্তিত্বের পূর্ণতা। এখানে অস্তিত্বসাধনার কথা আছে। আর একটা কথা আছে—মৃত্যুর কাছ থেকে মৃত্যুকে গ্রহণ করতে হবে। সে মৃত্যু একদিকে অমৃতজ্যোতি, আর একদিকে দেহের পতন। মৃত্যুর কাছ থেকে প্রাকৃত মৃত্যুকে সেই গ্রহণ করে, যে তার অমৃতরূপকে দেখতে পায় না, যে 'ইহ' আর 'অমুত্রে' তফাৎ করে। যা ওখানে তাই এখানে, যা এখানে সেই ওখানে, এইভাবে যে স্থির হতে পারে—সে মৃত্যুর অমৃত দিকটাকে গ্রহণ করে। বৈনাশিক বৌদ্ধদের একজন আচার্য নাগার্জুন বলেছেন, যদি তুমি নির্বাণে এবং ভবে তফাৎ কর তাহলে প্রজ্ঞার উদয় হবে না। যার কাছে নির্বাণ ও ভব দুই-ই এক, সেই পূর্ণসত্যকে লাভ করেছে। নির্বাণ লোকোত্তর, অরূপাবচর ভূমির ওপারে তাকে স্থাপিত করা হয়েছে। রূপাবচর থেকে অরূপাবচর ভূমিতে উত্তীর্ণ হওয়া—সেটাই নেতি। আমির সেখানে প্রলয় হবে। 'নৈব সংজ্ঞা নৈবাসংজ্ঞা' যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন। তার সংজ্ঞা আছে কিনা বলা যায় না। এই বোধ আর একটা বোধ দিয়ে আলোকিত হতে পারে—যখন এক অসীম বোধে সবকিছু ছেয়ে যায়। যেমন ভোরের আকাশ—সেখানে শুধু একটা শুকতারা জ্বলছে—তাকে চেতনার স্ফুলিঙ্গের সাথে তুলনা করতে পারি। সবিতার আভাস সে দেখতে পাচ্ছে, সেইজন্য ঊষাতে সবিতার উদয় হলে তার আলোতে সে তারার আলো প্লাবিত হয়ে যায়—এই হল নির্বাণ। একটি সত্তা বৃহৎ সত্তায় প্লাবিত হয়ে যায়। প্রথম সম্প্রজ্ঞাত পরে অসম্প্রজ্ঞাত। পুরুষ প্রথমে object গ্রাহ্যবস্তু। কিন্তু তিনি যখন possess

করেন, তখন তাকে জানা না-জানার মতনই। শুধু তিনিই থাকেন। আমিত্বের পরিপূর্ণ প্রলয় হয়। এটা থেকে যখন জাগি তখন মনে হয় এপারে তিনি, ওপারে তিনি। আমার তরফ থেকে দেখতে গেলে সূক্ষ্ম তফাৎ থেকে যায়। তাঁর ভিতরে ঝাঁপ দিতে হয়। তিনি আছেন, আমি নেই। এখানে শুধু বলা হয়েছে, ওপার এপার মিলিয়ে দাও। ওপারের জ্যোতিতে এপার প্লাবিত হয়ে যাক। ভেদ ঘুচে যাক। তাহলে শুকতারার মতন আমার আলোর যদি মরণ হয়, তখন সব অমৃত হয়ে যাবে। এটা কঠিন নয়। তিনিই আছেন এই ভাব রাখা, সমস্তকে তার দ্বারা প্লাবিত করা।

১১।। **মনসা এব ইদম্ আপ্তব্যম্** এই সংস্কার মনের মাঝে করে ফেলতে হবে। প্রাকৃত চেতনায় মনই মুখ্য সাধন তার ভিতরে এই সংস্কার দৃঢ় করতে হয়—ভাবের দ্বন্দ্বে আমার কিছু আসে যায় না। প্রথম আসে সাক্ষী চেতনা। সব ফাঁকা হয়ে যায়। থাকে শুধু দৃক্‌শক্তি। তখন ফুটবে তাঁর দৃক্। তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। তাঁর এক বিরাট চক্ষু দ্যুলোককে আতত করে ফুটে উঠল। সমস্ত মন দিয়ে তাঁকে পেতে হবে। তিনি আছেন—'নানা' ভেদ মিটে গেছে। আমার সমস্ত চেতনা সেই বিশ্বতশ্চক্ষুর চক্ষুমাত্র। আমার চেতনাকে তিনিই দেখছেন।

১২।। এই অবাধিত চেতনার মাঝে আবার সেই পুরুষ জাগে, আমি জাগি তিনি হয়ে। আমার মাঝখানে চেতনার কেন্দ্রে। হৃদয়ে **অঙ্গুষ্ঠমাত্র** পুরুষ রয়েছে। অঙ্গুষ্ঠ শব্দ symbolical প্রতীকী। ঋগ্বেদে 'আঙ্গুষ' শব্দটি আছে, √অজ্ ধাতু থেকে। যার থেকে অগ্নি হয়েছে। আঙ্গুষ—বাণী, আনন্দ, জ্যোতি। তাকে বলতে পারি অগ্নিশিখা। অঙ্গিরা-অগ্নি-অঙ্গ—এইসব রূপ তার থেকে হয়েছে। অঙ্গের derivative meaning হবে—আগুনের শিখা। ঋগ্বেদে অগ্নির শিখার সাথে অঙ্গুলির তুলনা করা হয়েছে। অগ্নিশিখাগুলো যেমনি উপরের দিকে চলে যায়—তেমনি অসীমকে ধরবার জন্য হাতের আঙুলগুলো যেন উপরের দিকে যাচ্ছে। (অগ্নিশিখা কখনও অগ্নিমন্থন, সমস্ত একটা flame)। সেইরকম আমাদের চেতনা একটা কিছুকে ধরবার জন্য উদ্যত, সমস্ত দেহ তাই অঙ্গ। অঙ্গুষে যিনি স্থিত তিনি অঙ্গুষ্ঠ। সমস্ত দেহকে যদি আগুনের ভাবি—তাহলে আঙুলগুলো leaping flames। √অজ্ ধাতুর আর একটা অর্থ আছে to leap up। অধ্যাত্ম অর্থে আমাদের মাঝে অঙ্গুষ, অঙ্গ, অঙ্গুলি—সবই হচ্ছে the leaping up of aspiration for the Infinite। মনীষা মনের leaping up বা upsurge। যিনি অঙ্গুষে স্থিত তিনি অঙ্গুষ্ঠ। বাইরের অর্থ বুড়ো আঙ্গুল। রথস্থিত বামন এই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষই। তারই plan-এ জগন্নাথের মূর্তি গড়া হয়েছে। দেহের ভিতরে সেই 'অঙ্গুষ্ঠ পুরুষ' রয়েছে। তারই উদ্যতি আমার মাঝে অভীপ্সারূপে দেখা দিয়েছে। ঐ একাকার ভাব থেকে আত্মসত্তা আমাদের আধারে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষরূপে জাগল। তার একটা ঊর্ধ্বমুখী আকর্ষণ রয়েছে। তাই চেতনা ঊর্ধ্বস্রোতা। তিনি ভূত ভব্যের ঈশান। যা হয়েছে তা **ভূত**, যা হবে তা **ভব্য**। অতীতে যা হয়েছে তা এরই জন্যে। ভবিষ্যতে যা হবে তা হয়ে তার সাথেই মিলিয়ে যাবে। **ঈশান** master। তিনি প্রভু। তিনিই এই অনুভব এনেছেন, তিনিই এটা রাখবেন, সাধক যদি এই ভাব রাখে, তখন আর জুগুপ্সা থাকে না, shrinking থাকে না।

দীপকণিকার মতন দীপ জ্বলছে। অসীমের আলো যখন আসবে তখন তাতে সে প্লাবিত হয়ে যাবে। তখন তার ভিতরে আবার সে আলো জেগে উঠবে। অসীমের ব্যাপ্ত

চেতনা যখন ঘনীভূত হয়—তখন চিৎকণারূপে আলো জন্মায়। অসীমার আলোর মাঝে আলোর একটি কণিকা। এই আমাদের সত্তা। বুদ্ধদেব বলতেন, আত্মদীপ। তিনি আত্মাকে মানতেন না—কিন্তু 'অহম্' মানতেন। আত্মদীপো আত্মশরণো ভব। নিজেকে হৃদয়ে দীপকণিকার মত ভাবনা করা। মন দিয়ে এই সংস্কার তৈরি করা—এটাই সাধনা।

১৩।। সেই দীপকণিকাতে যেন আমি জাগলাম। আমি সেই তিনি। সে 'অধূমক' জ্যোতির মতন। তিনি **ঈশানো ভূত-ভব্যস্য**, তিনি এই মুহূর্তে, আবার তিনি কালকেও। এই ভাব সমস্ত কর্মে ব্যবহারে বহন করে চলা। হৃদয়ে যে দীপ জ্বলছে সে তাঁরই আলো। সহজভাবে থাকলে নানা-র পার্থক্য থাকবে না, যেটি অবলম্বন করে আমাদের ব্যবহার চলছে। অহম্-এর লয় হয় কিন্তু ব্যক্তিত্ব যায় না। Individuality শাশ্বত। আত্মা শাশ্বত। অয়মাত্মা ব্রহ্ম। আমার যে আমি তার ভিতরে একটা তীক্ষ্ণতা রয়েছে। এই তীক্ষ্ণতা তাঁরই। নিজেকে আস্বাদন করার জন্যই তিনিই আমি হয়েছেন—যেটা eternal individualisation। সেটা আমার নয়। সেটা তাঁরই ব্যক্তিত্ব। তাঁর eternal personality-র অভিব্যক্তি মাত্র। যা বিরোধ তা অহম্-এর বিরোধ। 'অরের' মতন যখন কেন্দ্রে যাই, তখন দেখব সব persons একই Person। সে Impersonal, সেই eternally Personal আবার Multi-personal। এক তিনি বহু হয়েছেন। আমিও তিনি। এভাবে তিনি আজও আছেন, কালও আছেন।

১৪।। সিদ্ধচেতনার ব্যবহারে কি হয় সেটা বলা হল। দীপকণিকা অসীমের আলোতে ছড়িয়ে রয়েছে—দুটোয় কোন ভেদ নেই।

প্রাকৃত চেতনায় কি হয় সেটা এই শ্লোকে উপমা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে। একটা পাহাড়—দুর্গমস্থানে বৃষ্টি পড়লে জলের ধারা নানাদিকে বয়ে যায়। পাহাড়ের মত আমার উত্তুঙ্গ অহঙ্কার। ধারা নামে উপরে থেকে। বর্ষাকে অমৃতবর্ষণের সাথে ঋষিরা তুলনা করতেন। সে বর্ষাকে দুটো শক্তি—বৃত্র আটকে রাখত। একটা মেঘবৃত্র আর একটা অন্ধকারবৃত্র। তাকে দূর করে অবতরণ করায় তপঃশক্তি, ইন্দ্রশক্তি। এটি ঘটে অন্তরিক্ষ এবং দ্যুলোকের উপান্তে। তারপরে শুধু আলো। পার্থিব চেতনা—প্রাকৃত চেতনা—তাতে আগুন আছে। সে প্রথম উঠে অন্তরিক্ষে প্রাণচেতনার ভূমিতে। সেখানে বৃত্র মেঘরূপে দেখা দেয়। মেঘের মাঝে জল রয়েছে। কিন্তু মেঘ কৃপণ, সে জল দিতে চায় না। মেঘ যখন জল দিল না, তখন এল অনাবৃষ্টি, শুষ্কতা। হৃদয় মরুভূমি হয়ে গেল। রস হয়েছে অথচ চিত্তে নামছে না। তখন চাই বীর্যের ওজঃ শক্তি। সে না হলে রস নামে না। তাই ইন্দ্র বজ্রধর। বজ্র থেকে ওজঃ, যে ওজঃশক্তি মেঘের আবরণ বিদীর্ণ করে বজ্রাঘাত দিয়ে বিদ্যুৎ দিয়ে। বীর্য ও প্রজ্ঞাশক্তি দিয়ে যখন মেঘ বিদীর্ণ হয় তখন অমৃত প্রাণের ধারা নেমে আসে। এটা পর্জন্যশক্তি। সে যখন নেমে আসে তখন সমস্ত সবুজ হয়ে যায়। যে প্রাণ শুষ্ক হয়েছিল সে রসে প্লাবিত হয়ে যায়। এটা অন্তরিক্ষ। আর একটা image রয়েছে—সেখানে সূর্যের কল্পনা করা হয়েছে। সেখানে অন্ধকার বৃত্র। এই দুটো কল্পনা মিলে যায় গুরুপূর্ণিমার তিথিতে। তখন অন্ধকারের চরম পরাভব হয়। একদিকে longest day আবার পূর্ণিমার রাত, আলোর অভাব নেই। আমাদের দেশে tropical countries-এ ঠিক সেই সময়ে বর্ষাও নামে। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে দুটো এক হয়ে যেত। এইদিনে বুদ্ধদেব ধর্মচক্রের প্রবর্তন করেছিলেন।

আমরা এই সময় অম্বুবাচী পালন করি। আষাঢ় মাস। সমস্তকে অভিভূত করা হয়েছিল তাই আষাঢ়। দেবতারা অভিজিৎ। এই বর্ষা সব সময় হচ্ছে কিন্তু আমাদের অহঙ্কার যদি পর্বতের মতন থাকে, তাহলে সেগুলো বয়ে যায়। পর্বত জলকে ধরে রাখতে পারে না। হ্রদ হতে হবে। তখন উপরের ধারাবর্ষণ আমার মাঝে জমবে।

পর্বতে দুর্গমস্থানে বৃষ্টি হলে তার ধারা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি যারা **ধর্মান্ পৃথক্ পশ্যন্** নানাভাবে তাকে চিন্তা করে—তাদের ভাবনাগুলোও নানাভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এটা অবিদ্যাভূমি।

১৫।। যেমন **শুদ্ধ উদকে শুদ্ধ উদক** আসিক্ত ঢেলে দেওয়া হয়, **তাদৃগএব** তেমনি হয়ে যায়, যা ছিল তাই হয়ে যায়। তেমনি **বিজানতঃ আত্মা** জ্ঞানীর আত্মা ঠিক তেমনি হয়। শুদ্ধ উদকে শুদ্ধ উদক জলে জল মিলে যাচ্ছে। হৃদয়ের মাঝে তার প্রসাদ নামছে, দুই মিলে যাচ্ছে। গীতাতে আছে, 'সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।' সমস্ত প্লাবিত হয়ে যায়। আমার অবস্থা তখন উন্মুখ—চিৎ করা ঘটের মতন। অজ্ঞানীর অবস্থা পাহাড়ের মতন। যদি ঘটকে চিৎ করে রাখি, তাহলে ঘটেও জল, বাহিরেও জল, সমস্ত জলময় হয়ে যাবে। সংসারে থাকতে হলে এইভাবে থাকতে হবে। উপর থেকে ধারা বর্ষণ সব সময় চলছে। আমি রয়েছি ঊর্ধ্বমুখ ঘটের মতন। আমার মাঝেও জল ছিল। উপরের জল আসলে সে উপ্‌চে পড়ল। সারদাদেবী বলতেন, রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে প্রথম দেখাতেই তাঁর কিশোরী চিত্ত ভরা ঘটের মতন হয়ে গেল। বুকের মাঝে যেন একটা ভরা ঘট। অসীম এমনি করেই আমাদের পূর্ণ করে দেয়—কোনো কিছুই অপূর্ণ থাকে না। তার মাঝেই সবসময় আমাদের ঘটকে ডুবিয়ে রাখতে হবে। এর থেকে যদি বিচ্যুত হই, ভরা ঘটের স্তব্ধতা যদি ভেঙে দিই, তাহলে সেই হবে মৃত্যু।

কোথাও অভাব নেই। একভাবে সব পরিপূর্ণ। রূপের সাধনা ভাবের সাধনাকে এইভাব দিয়ে যদি করি, তাহলে সাধনা পূর্ণ হয়। তাকে পাইনি বললে চলবে না। এই ভাবনা করতে হয়—অসীম সমুদ্রের মতন তিনি রয়েছেন, ঘটের মতন আমরা তাঁর ভিতরে রয়েছি। এই কল্পনা যদি ধরে রাখতে পারি, তাহলে কৃচ্ছ্রসাধনার কোনো দরকার হয় না।

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।—এই ভরা ঘটের ভাব।

দুটো image, দীপকনিকা—অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ, আর একটা ভরা ঘট। এতেই সব হয়ে যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমবল্লী সমাপ্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় বল্লী

১।। আগের অধ্যায়ের অনুবৃত্তি। প্রথমে দেহের মাঝে আত্মবোধের কথা বলা হচ্ছে। আমাদের দেহ একাদশ দ্বারের পুরী। গীতাতে নবদ্বারের পুরী বলা হয়েছে। একাদশ ইন্দ্রিয়কে লক্ষ করে একাদশ দ্বার বলা হয়েছে। দর্শনে ইন্দ্রিয়ের কথা পরে এসেছে—আগে একাদশ প্রাণ বা একাদশ রুদ্রের কথা বলা হতো। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তারা প্রাণ। বেদে দেব আর প্রাণ বলা হয়েছে। সাংখ্যে ইন্দ্রিয় বলা হয়েছে। সাংখ্যে প্রাণের কথা নেই। ইন্দ্রিয়শব্দ ঋগ্বেদে আছে—ইন্দ্রের বীর্যই ইন্দ্রিয়। ইন্দ্র-চৈতন্য উজ্জ্বল চৈতন্যকে বোঝায়। চৈতন্যের শক্তি, সেই ইন্দ্রিয়। চৈতন্য ইন্দ্রিয় দিয়ে বেরোচ্ছে—এটা সাংখ্যের দৃষ্টি। এখানে একাদশ দ্বার বলে ইন্দ্রিয়কে mean করা হচ্ছে কি প্রাণকে—সেটা ঠিক বোঝা যায় না। একাদশ দ্বারের অর্থ একাদশ দ্বার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-যুক্ত পুরী বা একাদশ প্রাণ বা রুদ্রের দ্বারা অধিষ্ঠিত। রুদ্রেরা অন্তরিক্ষস্থান দেবতা, পুরী দেহ, পৃথিবী। তার মাঝে এই একাদশ ইন্দ্রিয় বা প্রাণ অন্তরিক্ষলোক। আর তার মাঝে চৈতন্য—সে দ্যুলোক। আত্মা অজ, তিনি জন্মান না। জন্মাতে দেখি কাকে? দার্শনিক পরিভাষায় জীবাত্মা হচ্ছে আত্মার প্রতিভূ reflection। সর্বত্র যে চৈতন্য—এ আত্মা তার একটা কণিকা। যখন দেহে বন্দী হল তখন জীব। এই দেহের থেকে বিমুক্ত সে শিব। আত্মার অমরত্বের অর্থ হচ্ছে শিবস্বভাবের অনুভব। আমরা শিবরূপে অমর। কিন্তু সে সম্বন্ধে আলোচনা করবার এখানে দরকার নেই। সেই অমর সত্তা—এই একাদশ দ্বারের পুরীতে আটকে পড়েছে। তার থেকে বিচ্যুত না হওয়া পর্যন্ত সে স্বরূপের উপলব্ধি হতে পারে না। আকাশ সর্বত্র আছে। এই আকাশের মাঝে একটা ঘট রয়েছে। ঘটের মাঝে ও বাইরে আকাশ রয়েছে। ঘটের মাঝে যে আকাশ সে ঘটরূপ হয়েছে, ঘটাকাশ হয়েছে। সেই জীব। তার বাস্তবিক স্বরূপ ঘট নয়—ঘটের মাঝে যে আকাশ সেই তার আসল স্বরূপ। ঘট যদি ভেঙে দিই তাহলে আকাশ আকাশের সাথে মিলে যাবে। ঘট ভাঙবার সময় অর্থাৎ দেহপাতের সময় যে উপলব্ধি হয় সেটা হচ্ছে বিদেহ মুক্তি বা নির্বাণ মুক্তি। কিন্তু এ উপলব্ধির আভাস ঘট থাকতেও আসে। সেটা জীবন্মুক্তি। ঘটের মাঝেই সেই অনন্ত আকাশের ভাব আসতে পারে। এটা নিয়ে অনেক তর্ক হয়েছে। অনেকে বলেন যে জীবন্মুক্তি পূর্ণমুক্তি নয়। ওটা মুক্তির আভাসমাত্র। কিন্তু যারা জীবন্মুক্তিতে বিশ্বাস করে, তারা বলে, শুধু আভাস কেন, সেখানে পূর্ণমুক্তির ভাব আসে। চেতনা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হতে আরম্ভ করে। প্রথমে যা মাটির দেওয়াল ছিল তা হাওয়ার দেওয়ালের মতো হাল্‌কা হয়, তারপর তা আলোর দেওয়াল হয়। তখন হয়তো সামান্য একটা আকাশের দেওয়ালের মতন পর্দা থাকে অথবা দুটো আকাশ এক হয়ে যায়।

হাল্‌কা হতে হতে চিন্ময় হয়ে যায়। সে বোধ ঘট থাকতেও হতে পারে। তখন অনন্তের বোধ দেহের মাঝে আসে। এই বোধে সঞ্জীবিত থাকা—এটাই জীবন্মুক্তি। তারপরে সূক্ষ্মতার বোধ মহাবিদেহমুক্তির বোধ আসে। ব্যোমতনু আকাশতনু। যখন দেহ পড়ে যায়, তখন ঘটাকাশ মহাকাশে ফিরে গেল। তফাৎ আগেও ছিল না, এখনও থাকল না। এটাই নির্বাণমুক্তি বা বিদেহমুক্তি। তাকে উজ্জ্বলতররূপে পাওয়া যেতে পারে ব্রাহ্মীস্থিতিতে, যার কথা গীতাতে বলা হয়েছে—এযা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমূহ্যতি। ভক্তির দিক থেকে দেখতে গেলে দেহ-প্রাণ-মন দিয়ে আমার যে গণ্ডি—তার ঘটাকাশের মাঝখানে তিনিই রয়েছেন। তার মাঝে আমি। আমার মাঝে তিনি। এই কথা এখানে সংক্ষেপে বলা হচ্ছে।

দেহরূপ পুরী যার একাদশ দ্বার প্রাণ বা ইন্দ্রিয়। এর মাঝে অধিষ্ঠিত যে সে অজ। আকাশ জন্মায় না। যে জন্মেছে, যে আবরণ ঘটেছে, সে দেওয়াল একদিন ভাঙবেই।

অবক্রচেতসঃ—যখন গণ্ডির মাঝে চেতনা আসে—তখন চেতনা বেঁকে যায়। ঘটের মাঝে আকাশ তার আকার বাঁকা। কিন্তু বাস্তবিক আকাশ তা নয়। তার মাঝে কোনো বক্রতার সীমা নেই। বক্রতা সঙ্কোচ। তার বৈদিক নাম হচ্ছে অংহঃ। তন্ত্রে যাকে বলেছে কুণ্ডলী। ঋগ্বেদের ভাব—চেতনার গতি যখন চারিদিকে কুণ্ডলী-বেষ্টন-সীমা রচনা করে তখন হয় প্রাকৃত গতি—ধূর্তি, ধ্বর—এঁকে বেঁকে চলা। ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে—জুহুরাণম্ এনঃ। পাপের বোধ এটা থেকেই হয়। সেটা যেন একটা কুণ্ডলিনী একটা ধূর্ততা, নিজেকে ঘিরে থাকা, বৃহৎকে না চেনা। যেখানে ধূর্তি নেই তা অধ্বর। যজ্ঞের অন্য নাম অধ্বর। যজ্ঞ হচ্ছে আত্মদান, স্বার্থহীন দান। তখন চেতনা দেবতার সাথে এক হয়। একাদশদ্বার পুরীর যে অজ তিনি জন্মাননি। যে জন্মেছে সে পুরমাত্র। পুরের মাঝে একটা বক্রতা দেখা দিয়েছে। বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়ের সঙ্কোচ, দেহের বাধা—এরাই বক্র। যিনি অজ তিনি দেহের মাঝেও অবক্র। যখন গুণের বিক্ষোভ শান্ত হয়—হৃদয়ে আকাশের ধ্যান করা, বাহিরের আকাশকে হৃদয়ে নিয়ে আসা—Infinite space-এর idea বহন করা—এই যখন হয়, তখন চেতনা অবক্র হয়।

চেতনা যখন সর্বত্র প্রকাশিত হয়, তখন এই অবস্থায় দেহে থাকা এবং না থাকা এক হয়ে যায়। তিনি **অনুষ্ঠায় ন শোচতি**। আর যখন দেহপাত হয়—তখন **বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে** হয়। যা ছিল তাই হল—এভাবকে জীবনে যদি বহন করি তখন দেহ প্রাণ ও মনের দেওয়াল স্বচ্ছ হয়ে যাবে। ভিতরে অবক্রচেতা আছে, সে আভাসের মাঝে তখন ভিতরে থাকা, তা বন্ধনে থাকা নয়। সব কিছুই তিনি হয়েছেন। বৃত্তিও তিনি—বক্রতাও তিনি। দেহপাতে সব বিশীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তখনও তিনি। যখন অবক্র অজচেতনা আছে তখন তাতে—একাদশদ্বার পুরীতে থাকলেও সে শোক করে না। আর যখন ছেড়ে দেয়—তখন মুক্ত হয়ে যায়। তিনি ছেড়েই রয়েছেন।

২।। এটা ঋগ্বেদের হংসমন্ত্র, সূর্যমন্ত্র (৪।৪০।৫)। তন্ত্রে হংসবতীর কথা আছে। হংস=সূর্য। বৈদিক ভাবনার সর্বত্রই দেখা যায় অধিদৈবত দৃষ্টিতে যে সূর্য, সে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আত্মা। যেমনি সূর্য বৃহৎ, তেমনি আত্মাও বৃহৎ। সে হংস যেমনি আকাশে তেমনি আমাদের দেহে। হংস মন্ত্র অজপা সোহহম্ মন্ত্র হয়ে যায়, এটা আমরা তন্ত্রে পাই।

তান্ত্রিকরা হংসের ব্যাখ্যা বর্ণমালা হিসেবে করেছেন। 'হং' একটা বীজ, 'সঃ' আর একটা বীজ। হং—হ আর একটা বিন্দু। সঃ হচ্ছে স—আর দুইটি বিন্দু। এক তত্ত্ব হং যখন নিজেকে দ্বিধা মনে করলেন, তখন 'সঃ' বিসর্গের সৃষ্টি হল। যেটা এক সেটাকে বিন্দু দিয়ে, অনুস্বর দিয়ে বোঝানো হচ্ছে। যে বিন্দু একটা point এ সংহত। এই একের দুই হওয়া—'বিসর্গ'। ব্রহ্মের মাঝে জগৎ সমাহিত ছিল, তাকে project করল—এটাই বিসৃষ্টি। যদি তাকে ভিতরে টেনে নেয় তখন প্রলয়। তান্ত্রিকরা বলেছেন 'হং' হচ্ছে শিব। হ-য়ের পরে যে সঃ—সেটা শক্তি। উষ্মবর্ণ—যাকে উচ্চারণ করতে গিয়ে তাপ হয়—সৃষ্টির তাপ। 'হ' উচ্চারণ করতে কোনো তাপ হয় না। আসে শুধু ব্যাপ্তির বোধ। হং-এর এক বিন্দু—সঃ এর দুটি বিন্দু। সৃষ্টির বীজ আর সৃষ্টি—বিসর্গ। এই হংসঃ।

মহাশূন্যের স্তব্ধতা আর রূপ, রস, গন্ধের জগৎ—তাকে পর্যায়ক্রমে শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে জোড়া হয়েছে। যখন শ্বাস নিচ্ছি তখন বাইরের শক্তিকে ভেতরে টানছি, এটা 'সঃ'। আর শ্বাস ছেড়ে দিচ্ছি, তখন হং, তখন প্রলয়। 'হকারেণ বহির্যাতি....।' জীব সর্বদা সোঽহং মন্ত্রকে জপ করছে। হংস শব্দের উচ্চারণ যদি বারবার করা যায় তাহলে সে সোঽহম্ হয়ে যাবে। চিৎশক্তির রূপ হচ্ছে, 'ওম্'। যদি 'স' আর 'হ' বাদ দিয়ে দিই—তাহলে 'ওম্' থেকে যাবে। 'হংস' জপের ভিতরে ওঙ্কারই উচ্চারিত হচ্ছে, তাকে অভিব্যক্ত করছে। ওঙ্কার নিত্যমন্ত্র, স্বভাবমন্ত্র। একবার প্রলয়, একবার সৃষ্টি। এটাই অজপা। আপনা থেকেই জপ হচ্ছে। এই সব অর্থ এখানে নাও থাকতে পারে। বৈদিক ভাবনায় হংস (swan) সূর্যকে বলা হতো। সে আকাশে রয়েছে। নীলাকাশ যে সমুদ্র তাতে সূর্যরূপী হংস রয়েছে। যেমনি সূর্য আকাশে চলেছে ঠিক তেমনি একটা হংস আমাদের হৃদয়ে নেমে আসছে। এটাই তাঁদের image।

হংস, পরমহংস যেন অনন্ত আকাশে সাঁতরে চলেছে। এই বৈদিক imageryটি যদি সাধনাতে follow করি, তখন এই পুরীতে বা হৃদয়ে বা ভ্রূমধ্যে বা মূর্ধায়—হৃদয়েই ধরা যাক— সেই হৃদয়ের চৈতন্যরূপী হংস সাতার কাটছে। এই হৃদয়ে আকাশবৎ যে বিস্তার রয়েছে, সেটাই হৃদ্যসমুদ্র। এই হংস কি রকম, তার বিবৃতি এই শ্লোকে দেওয়া হচ্ছে।

এই হংস **শুচিষৎ**। প্রত্যেক বিশেষণের পিছনে সৎ (=নিষণ্ণ) আছে। শুচি শব্দের অর্থ অগ্নি। আমার মাঝে যে আগুন জ্বলছে, তা আমার সমস্তকে— সমস্ত বক্রতা, মালিন্য ইত্যাদিকে নিঃশেষ করছে আর একটা প্রসাদ নির্মলতা আনছে। এই হংস তাই শুচিষৎ। সাধকের লক্ষণে বলা হয়েছে তাকে সমনস্ক সদাশুচি হতে হবে।

বসুঃ অন্তরিক্ষসৎ—এই হংস, যে শুচি—তাই অন্তরিক্ষে বসু হয়ে আছে। বসু—ধন, √বস্ ধাতু থেকে। √বস্—to shine যা থেকে বসিষ্ঠ হয়েছে—highest light। Persian বেহেস্ত্ এ থেকেই এসেছে। এই বসু যা shine করছে সে কে? সে সূর্য।

যিনি শুচিষত্ তিনি অন্তরিক্ষে বসু হয়ে আছেন। আমার মাঝে যিনি আছেন, তিনি বাহিরেও আছেন। আমার মাঝে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তাঁকে আমার হোতারূপে পাই। যজ্ঞে দেবতাকে যে আবাহন করে সে হোতা। নিজেকে যে বিসর্জন দেয় সেই হোতা। দুটি অর্থ মিশিয়ে দিয়ে তাকে আহ্বান করছি ও তার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিচ্ছি। বেদে অগ্নিকে হোতা বলা হয়। অগ্নিশিখা যেমন ওপরের দিকে উঠে লক্ লক্ করে, যেন কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে। সে যেন অসীমকে চায়। এই যে হোতা, আমার মাঝে যে অগ্নিশিখা সেই

বেদিষৎ। তিনি বেদিতে নিষণ্ণ, বেদিষৎ হোতা। যজ্ঞবেদির মধ্যস্থলে আগুন জ্বালানো হয়েছে। অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে দেহ বেদি, হৃদয় বেদির কুণ্ড। সেই কুণ্ডে আগুন জ্বলছে অভীপ্সার। এই হৃদয়রূপ বেদিতে তার জন্য যে অভীপ্সা আকুলতা তাও এই হংস।

অতিথির্দুরোণসৎ। দুরোণ=দ্রোণ (→প্রাকৃত ডোল)। কলস, যাতে সোমরস রাখা হতো। দুরোণ ইতি গৃহনাম, ঘর, গৃহকেও দ্রোণ বলা হতো। সোমকে বলা হতো অতিথি। অতিথির একটা অর্থ, এক তিথি যে কারও বাড়িতে থাকে না, কিন্তু সেটা ঠিক নয়। এটা এসেছে √অত্ ধাতু থেকে, তার প্রাকৃত অট্ তা থেকে পর্যটন। 'অত সাতত্যগমনে।' সব সময় যে চলে সেই অতিথি। নিত্য পথিক। আমার এই জীবচৈতন্য অতিথি। যে নিত্য চলছে সত্যের দিকে। সোমকে বলা হয় অতিথি। যজ্ঞ যখন করা হতো তখন সোমলতা দূর থেকে আনা হতো ও তাকে একটা ঘরে রাখা হতো। তাকে বলা হতো রাজ-অতিথি—Royal guest। আমাদের ভিতরের দিকে একটা সোমধারা, আনন্দের ধারা উপর থেকে অবিরাম ঝরে পড়ছে, চৈতন্যের সঙ্গে সোম মিলছে, এটা অগ্নিসোমতত্ত্ব। বেদ থেকে পরে তন্ত্রে এই ভাব এসেছে। প্রকৃতি সোম, পুরুষ অগ্নি। সোমতত্ত্ব Discent এর তত্ত্ব। অগ্নিতত্ত্ব Ascent-এর তত্ত্ব। দুটি ত্রিকোণের কল্পনা আছে, ঊর্ধ্বমুখী ত্রিকোণ অগ্নি, অধঃত্রিকোণ সোম। এই অগ্নিসোমতত্ত্বের মাঝখানে বিন্দু। আমাদের দেহেও তাই ঘটে। উপর থেকে প্রসাদ নামছে—সোম, আর নীচ থেকে অভীপ্সার অগ্নি, আগুন উজিয়ে উঠছে। দেহ সোমপাত্র, ধারা তাই অতিথি। যিনি হংস—তিনিই আমাদের দেহে নিত্য প্রবহমান সোমধারা। তাকে পরে সুষুম্না-ধারা বলা হয়েছে। সুষোমা নদীর নাম ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। তাকে কখনও সরস্বতী বলা হয়েছে। সে পর্বত-শৃঙ্গ থেকে সমুদ্রের দিকে চলেছে। শিরসি সহস্রের থেকে অনন্ত ব্যাপ্তির দিকে। অতিথি দুরোণসৎ-এর ভাবনাকে ভেঙে এই সব imagery তৈরি করা হয়েছে।

প্রথম বলা হলো যে হংস শুচিষৎ, এটা common term। তাই সূর্যরূপে বসু, অগ্নিরূপে হোতা, আর সোমরূপে অতিথি। পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরিক্ষে সূর্য আর দ্যুলোকে সোম। দেবতার তিনটি চোখের যে কল্পনা করা হয়েছে তাতে আশেপাশের দুটো চোখ, সে দুটি সূর্য আর চন্দ্র। মাঝখানে একটি চোখ, সেটি অগ্নি। এটা, যখন অধিভূত দৃষ্টিতে দেখি।

তাকে abstract ভাবে দেখা হচ্ছে নৃষৎ, বরষৎ, ঋতসৎ, ব্যোমসৎ। এখানে সাধকচেতনার চারটি পর্যায়ের কথা আছে।

নৃষৎ—যার মাঝে পৌরুষ রয়েছে। নৃ থেকে নর। নর শব্দের যাস্কে অর্থ দেওয়া আছে—'নৃত্যন্তি কর্মসু'। কর্মে যে নৃত্য করে সে-ই নর। এই etymology-র পিছনে অধ্যাত্ম ইঙ্গিত রয়েছে। নৃ সে, যে নৃত্যপরায়ণ। দেবতাকে নৃতু বলে কল্পনা করা হয়েছে। তাই শিব নটরাজ। নৃত্য হচ্ছে অঙ্গবিক্ষেপ, কেন্দ্রীভূত শক্তির বিচ্ছুরণ। নাট্যশাস্ত্রে বলে অঙ্গহার। দশভুজা মূর্তির পিছনে এইভাব রয়েছে। এটা আসলে শৌর্যমূর্তি। দশটি হাত হচ্ছে কর, কিরণ lines of energy। মাঝখানের পিণ্ড থেকে যেন বেরিয়ে আসছে। সর্বাঙ্গীণ বিচ্ছুরণ অঙ্গহার। সেই নৃত্য বা নরত্ব। শিব তাই নটরাজ। সাধনা করতে হয় শক্তি দিয়ে, উল্লাসের সঙ্গে। সাধনায় দুঃখবাদের স্থান নেই। পৌরুষ দিয়ে আনন্দের সঙ্গে বাধার সঙ্গে লড়াই করা। আমাদের মূর্তিগুলিতে আমরা তাই দেখি দেবতা অসুর ধ্বংস করছে। এইরকম মূর্তি ভারতে, তিব্বতে, চীনে সব জায়গায় আমরা দেখতে পাই। চীনে ও

তিব্বতে অসুরনাশের সময় দেবতার মুখকেও ভীষণ করা হয়েছে। কিন্তু ভারতে আমরা দেবতার 'প্রসাদসুমুখী' মূর্তি দেখতে পাই। এ ভাবনা বৈদিক। এটাই পৌরুষের তাৎপর্য, নরত্ব। সাধনায় প্রথমে শক্তির বিকিরণ করতে হয় আর তার ভিতরে প্রকাশ পাবে পৌরুষ এবং উল্লাস। এ পৌরুষের মাঝেও তিনি, সেই হংস রয়েছেন।

তিনি **বরসৎ**। 'প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'—এই ভাব। বর শ্রেষ্ঠ; তিনি বরণীয়, তিনি বর। নৃষৎ প্রথম অবস্থা, সাধকের অবস্থা। তারপর বরসৎ সিদ্ধের অবস্থা। তার মাঝেও তিনি, হংস রয়েছেন। যেমনি সাধকের মাঝে, তেমনি সিদ্ধচেতনাতেও।

তারপরে **ঋতসৎ**—আগের দুটির মাঝে ব্যক্তির কথা ছিল। ঋতসৎ এবং ব্যোমসৎ এর মাঝে বিশ্বচেতনার কথা আছে। ঋত হচ্ছে বিশ্বব্যাপী কর্মের ছন্দ; তা আমরা দেখি ঋতুপর্যায়ে, সূর্যের উদয়াস্তে, প্রকৃতির প্রত্যেক কর্মে, law of nature-এ সেই ছন্দে সমস্ত বিশ্ব সঞ্চালিত— ঋগ্বেদে তার অজস্র ব্যবহার দেখা যায়।

তার counterpart ব্যোম। বি-ওম; বিশেষরূপে ওম। ওম ঋগ্বেদে আছে। যাকে আমরা পরে ওঙ্কার বলি, সেটা ওম থেকে এসেছে। √অব্ ধাতু—আবিষ্ট করে থাকা, grace, রক্ষা করা। অবঃ আর ঊতি। অবঃ হচ্ছে তাঁর প্রসাদ grace আর ঊতি—তিনি যখন আমার মাঝে থেকে বিরুদ্ধশক্তিকে প্রতিহত করেন। দুটি যার মাঝে ক্রিয়া করছে—তিনি ওম। আকাশ বিশেষরূপে ওম—তাই আকাশকে বলা হয় ব্যোম। মহাশূন্যে ব্যোম। তার মাঝে যে প্রাণের স্পন্দন, যে ছন্দঃ সেই ঋত—এটা হবে সমগ্র দৃষ্টি। নৃষৎ, বরসৎ ব্যষ্টি-দৃষ্টি। নৃ থেকে বর, বর থেকে ঋত আর ঋত থেকে ব্যোম সমস্তের মাঝে প্রতিষ্ঠিত আছে সেই হংস।

এই চৈতন্য হংস সৌরচেতনা কী করে আবির্ভূত হন? তিনি অপ্ থেকে জাত হন। অপের ধর্ম তরলত্ব। সে প্রাণের প্রতীক। আপো বৈ প্রাণাঃ চেতনা যখন সাবলীল হয়, তখন অপের সৃষ্টি হয়। অপ্‌ই সবার মূল। পুরাণে কারণবারি—সমুদ্রের কথা বলা হয়েছে, তার থেকেই সেই হংসের আবির্ভাব হয়।

গোজা—পৃথিবী আর জ্যোতি দুটো অর্থ। গো—পার্থিব জ্যোতি। আধারে নিগূঢ় জ্যোতি। আমার অন্তর্নিহিত যে নিগূঢ় জ্যোতি, তাতেই তিনি আবির্ভূত হন। তারপরে 'অদ্রিজা' দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ছন্দের জন্য ঋতজা প্রথম রাখা হয়েছে। **অদ্রিজা** সোমকে বোঝায়। অদ্রি—যাকে দীর্ণ করা যায় না। যেমন শক্ত পাথর। সোম ছেঁচবার পাথরকে অদ্রি, গ্রাবা বলা হতো। এই পাথর থেকে যিনি জাত হন, তিনি অদ্রিজা। আমাদের মাঝেও ঠিক এমন করে পাষাণের আঘাতে সোম বাহির করা হয়, ঋগ্বেদে তার আভাস পাওয়া যায়। সেখানে বৃত্তির কাঠিন্যের-সঙ্কোচের কথা বলা হয়েছে। এই কাঠিন্য উৎপন্ন করা যেতে পারে। আধারের যে কোনো জায়গায় দুটি বিরুদ্ধ শক্তির চাপ উৎপন্ন হলে কাঠিন্য উৎপন্ন হয়। বিষয় বা বস্তুর সঙ্গে লড়াই করছি। তার সঙ্গে পেরে উঠছি না। এটা একটা পাষাণ, অধি-ষবণ ফলক। আর একটা ফলক হবে যখন সেই প্রতিরোধক শক্তির উপর আমার সঙ্কল্প—শক্তিকে কঠিন করে একটা চাপ দিই। তাহলে আমরা ঊর্ধ্বস্রোতা হই। তন্ত্রে একে সাধনাতে পরিণত করা হয়েছে। যোনিমুদ্রা একটা সঙ্কল্পশক্তি। যে বৃত্তির সঙ্গে লড়াই করব সেও অনড়, অটল। তাকে স্থির ও শান্তরূপে ধারণা করে তার উপর আমার সঙ্কল্পশক্তি চেপে দিলাম। এই চাপে ওই শক্তি বিলীন হয়ে সমস্ত

চেতনার ঊর্ধ্বগতি হয়। এটা আরেকভাবে করতে পারি। বিরুদ্ধ শক্তিকে আধারের কোনো জায়গাতে সংহত মনে করে উপর থেকে যেন চাপ নামছে। উদূখল এবং মুষলের উপমা দিয়ে ঋগ্বেদে এটি বোঝানো হয়েছে। আধারের মাঝে যে রস নিগূঢ়—তাকে উপর থেকে চাপ দিয়ে রসকে মুক্ত করে ঊর্ধ্বস্রোতা করার বর্ণনা ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। বিরুদ্ধ ভাব থেকে পালিয়ে যাওয়া নয়, শুধু চাপ দেওয়া এইটাই সোমলতা ছেঁচা। তন্ত্রে সুষুম্নাকে লতা বলা হয়েছে আর লতাসাধনার কথা আছে। তার স্থূল এবং সূক্ষ্ম দুটো অর্থ হতে পারে। সূক্ষ্ম অর্থ হচ্ছে সত্তার উপর চাপ দিয়ে রস বের করে তাকে ঊর্ধ্বস্রোতা করা। একদিকে সোম অন্ধস্, আবার সেই সোম ইন্দু। রসের ধারা যখন নিম্নগামী তখন সোম অন্ধঃ। ভোগবতী ধারা পাতালে অধোগামী। তাকে যদি পেষণ করি, তখন সেই ধারা হয় ঊর্ধ্বগামী। যোনিমুদ্রা যোগের চাপ। তখন কুণ্ডলিনী জাগে, তখন সোমধারা ঊর্ধ্বগামী হয়। √সু-এর অর্থ চাপ দেওয়া। সে ধারা যখন ভ্রূমধ্যে আসে, তখন উজ্জ্বল বিন্দুতে রূপান্তরিত হয়। এই বিন্দু থেকে সোম ইন্দু হয়। যে আনন্দ অধোগামী, সে ভোগবতী ধারা, গঙ্গার যে ধারা পাতালের দিকে যাচ্ছে। মর্ত্যে গঙ্গা জাহ্নবী। আর একটা উত্তর-ধারা গঙ্গা আছে। যেখানে গঙ্গা উত্তরবাহিনী সেখানে তীর্থে পরিণত হয়েছে। কাশীতে গঙ্গা উত্তরবাহিনী। এটাই সোমধারা। কাশীর অর্থ হচ্ছে প্রকাশ, শক্তি বা প্রজ্ঞা। প্রাণের স্রোত ঊর্ধ্বগামী হলে প্রকাশ বা প্রজ্ঞা আসে। মূলাধারে যে পৃথিবী তার থেকে ভ্রূমধ্যে নিয়ে গিয়ে আবার ভ্রূমধ্য ভেদ করে মহাশূন্যে নিয়ে যাওয়া। অদ্রিজা সোম, যে ইন্দুতে রূপান্তরিত হয়। আমাদের সোম সব-শক্তি, যে 'সব' থেকে প্রসব শব্দ হয়েছে, সে সব-শক্তি অদ্রি। বৌদ্ধরা তাকে বজ্র বলতেন। বজ্র হচ্ছে Diamond stone হীরা। যে দুর্ভেদ্য। 'শূন্যতা বজ্রমুচ্যতে'। শূন্যতায় আস্‌লে ভোগের প্রবৃত্তি বিলীন হয়ে যায়। এই অদ্রি থেকে, বজ্র থেকে তিনি আবির্ভূত হন।

ঋতজা—বিশ্বের যে ঋতচ্ছন্দ তার জ্ঞান হলে তিনি আবির্ভূত হন।

ঋতম্ বৃহৎ—আগের সমস্ত লক্ষণগুলো সংক্ষিপ্ত করা হচ্ছে। বৃহৎ ব্রহ্ম, তার শক্তি ঋত। সত্যের যে গতি সে ঋত। ওই হংস ঋতমবৃহৎ। ব্রহ্মরূপে স্থির আর ঋতরূপে স্ফুরন্ত dynamic। পরব্রহ্ম অবরব্রহ্ম। ব্রহ্ম এবং শক্তি অভেদ। সশক্তিক ব্রহ্মতত্ত্ব।

৩।। আত্মতত্ত্বের কথা বলা হচ্ছে। আগের দুটো মন্ত্রের একটিতে সহজ জীবনের মাঝে আত্মার উপলব্ধি কি করে করতে পারি, তার কথা বলা হয়েছে। ঘটাকাশ ও মহাকাশের মতন স্থিতি। ব্যবধান বলতে কিছু নেই। দ্বিতীয়টিতে তার ভিতরে হংসকে নিয়ে আসা হচ্ছে, বিশ্বরূপকে বিবৃত করা হচ্ছে। এর পরের শ্লোকে সাধনার সঙ্কেতগুলো দেওয়া হচ্ছে। **মধ্যে বামনমাসীনম্**—এই বামন অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ। দেহরথে রয়েছেন। এই বামনকে আদর্শ করেই জগন্নাথের রথের কল্পনা করা হয়েছে। এই যে মধ্যস্থিত বামনপুরুষ তাকে **বিশ্বে দেবা উপাসতে**। আধারের মাঝে একটা কেন্দ্রবিন্দু একটা nucleus রয়েছে। তার মাঝে সমস্ত চিৎশক্তি (বিশ্বেদেবাঃ তাকেই বলা হয়েছে) সংহত হয়েছে। একে আশ্রয় করে আমাদের জীবলীলা চলছে। প্রাণের দুটো গতি। একটি শুদ্ধপ্রাণ, আরেকটা অপান। প্রাণের ঊর্ধ্বগতি আর অপানের নিম্নগতি। অপানের শক্তি বিশ্বপ্রাণকে আকর্ষণ করে নামিয়ে আনছে, আর প্রাণ অপানের বন্ধনকে কেটে আবার উপরে শূন্যে চলে যাচ্ছে। এইরকম শ্বাস-নিঃশ্বাসের ছন্দ চলছে। যখন নিঃশ্বাসকে ছাড়ি, তখন সে প্রশ্বাস, প্রাণের

গতি হয়। আর যখন নিঃশ্বাস ভিতরে নিই তখন সে অপানের গতি। এ ভাবের একটা মন্ত্র ঋগ্বেদে আছে। সেখানে প্রাণ-অপানের মূলে যে শক্তি তাকে সর্পরাজ্ঞী—সাপের রানী বলা হয়েছে। তাকে অবলম্বন করে পরে কুণ্ডলিনী বিদ্যা দাঁড়িয়েছে। এই সর্পরানী 'অস্য প্রাণাদ্ অপানতী' (১০।১৮৯।২), অস্য অর্থাৎ সূর্যমণ্ডলই সমস্ত প্রাণের আধার। তার থেকে, সে মহাপ্রাণ থেকে সেই সর্পরাজ্ঞী অপান শক্তির দ্বারা আকর্ষণ করে প্রাণকে নীচে নামাচ্ছে। কিন্তু আমাদের আধার সে প্রাণকে ধরে রাখতে পারছে না। আবার সে বাহির হয়ে মহাপ্রাণে মিলিয়ে যাচ্ছে। এই প্রাণ অপানের ক্রিয়া অহরহ চলেছে। যখন শ্বাস নিচ্ছি তখন মহাশক্তিরই একটা শক্তিকে হৃদয়ে নামিয়ে আনছি। কিন্তু হৃদয়ে সে থাকতে পারছে না। সে শক্তি আবার মহাপ্রাণে লীন হয়ে যাচ্ছে। এই বামন, যিনি মধ্যস্থিত পুরুষ, অঙ্গুষ্ঠমাত্র, তিনিই প্রাণকে নামিয়ে আনছেন, আবার তিনিই তাকে উপরদিকে ঠেলে দিচ্ছেন। আমরা যদি এই ছন্দের অনুধ্যান করি তবে তার থেকে অজপা জপ বা অজপা যোগের ভাব পেয়ে যাই। বৈদিক প্রাণায়ামের মূলে এই কথা ছিল। আমাদের মাঝে যা ঘটছে তাকে দেখে যাওয়া, সহজভাবে তার অনুভব করা। এই যে অপান প্রাণকে নামিয়ে আনছে এই সঙ্কোচকে বলা হয়েছে মৃত্যুশক্তি। মৃত্যুশক্তি দিয়ে, সঙ্কোচ দিয়ে জীবনের সৃষ্টি হয়। তার থেকে আবার স্বভাবতঃ মুক্তি পেতে চাইছি। সে প্রকাশ পাচ্ছে প্রাণের ঊর্ধ্বগতিতে। শ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দের সঙ্গে হংসের গতিকে মিলানো হয়েছে তন্ত্রে। 'স' অপান। তাকে কেন্দ্রবিন্দুতে নিহিত করছে 'হ' মহাপ্রাণ। সেটা যখন চলে যাচ্ছে মহাশূন্যে—তখন মরণ। সমস্ত মিলিয়ে কল্পনাটা হচ্ছে আকাশে মহাশূন্যে হংস। সে মৃত্যুশক্তির আকর্ষণে আধারে নেমে আসছে বামনরূপে। সেখানে সঙ্কুচিত থেকেও তার ভিতরে মুক্তির একটা পিপাসা রয়েছে, সে তাকে মহাশূন্যে মিলিয়ে দিচ্ছে। এই জীবন মরণের দোলাই অস্তিত্বের রহস্য। যদি দুটোকেই গ্রহণ করতে পারি তবে সত্যকে পাব অখণ্ডরূপে। প্রাণশক্তি যেমন মহাশূন্যে নিয়ে যায়, তেমনি আবার তাকে আকর্ষণ করে নীচেও নিয়ে আসে। এইরকম উপরে ওঠা আর নীচে নামিয়ে আনা, এটাই ছন্দ। এই ছন্দের মাঝে একটা আবর্তন থাকে, এক জায়গাতে আবার ফিরে আসে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে, সমস্ত কিছুর একটা ছন্দ আছে। পৃথিবী, দ্যুলোক, নক্ষত্র সমস্তের মাঝে একটা দোলা চলছে। একবার বন্ধন আর একবার মুক্তি। তার পূর্বে সহজ অস্তিত্ব—শুধু থাকা। অন্যত্র তাকে বলা হয়েছে, 'কিম্ অত্র পরিশিষ্যতে'। এই দোলার ঊর্ধ্বে কী? কিছুই নেই, মহাশূন্য। এইভাবে যদি জীবনকে দেখতে পারি, তার পিছনে ফাঁকা, তার প্রতিষ্ঠা মহাশূন্য। আর তার মাঝেই নেতি ইতির দোলা চলছে। দোলাই হচ্ছে ঋত। যে সামনে আছে আর যে পিছনে আছে, যে বৃহৎ কিংবা শূন্য। একেই কখনও সৎ, কখনও অসৎ বলা হয়েছে। এই যে বিচিত্র দোলা। তাকে বলা হয়েছে অস্তি। তাতে নিজেকে স্বচ্ছন্দে ছেড়ে দিয়ে এই দোলাকে অনুভব করা, সেটাই এই সাধনার সিদ্ধি।

এই উপলব্ধির স্থান অঙ্গুষ্ঠপুরুষ। রথচক্রের সমস্ত অর নাভিতে এসে সংহত হয়, তেমনি বিশ্বদেবতা যিনি সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছেন তাঁর সমস্ত বিভূতি সংহত হচ্ছে এই বামনে। সাধনা হবে এইরকম। বাইরের সমস্ত কিছুকে এক কেন্দ্রে আকর্ষণ করা এবং তাকে শূন্যে তলিয়ে দেওয়া।

৪।। এখানে আরেকটা সঙ্কেত— জ্যান্তে মরা হয়ে থাকা। **শরীরস্থ দেহী কিন্তু তিনি**

বিস্রংসমান। তিনি যেন disintegrated হয়ে রয়েছেন। সমস্ত শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে—এই ভাবটি সবসময় ধরে রাখতে হবে। প্রাণ-অপানের যে যুগলধারা তার পিছনেও সমস্ত কিছুকে শিথিল করে দেওয়ার ভাব আছে। অস্তি থেকে নাস্তিতে যাওয়া। মধ্যদেহে যে অধূমক জ্যোতি, রথস্থ বামন, তার মাঝেও নিজেকে এইরকম ছেড়ে দেওয়ার ভাব আছে। সমস্ত বিশ্বের মূলেও এই তত্ত্ব আছে। আধুনিক বিজ্ঞানও বলছে একদিকে সমস্ত বিশ্ব আকার ধরে আছে, আবার অন্যদিকে সমস্ত জগৎ expand করছে। Theory of expanding Universe। এটাই বিস্রংসন। তার এক রূপ চিত্তের চাঞ্চল্যে দেখা যায়। মনের বৃত্তিকে আমরা স্থির করতে পারি না। চিত্তের এই চঞ্চলতাকে, ছড়িয়ে দেওয়াকে যদি সমগ্রভাবে দেখি, এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে যাচ্ছি, সেটাকে না দেখে বিষয়ের শেষে মনের শূন্য হয়ে যাওয়াকে যদি দেখি তাহলে সাধনার একটা সঙ্কেত পাই। চিত্ত চঞ্চল কেন? তার জন্য যদি মাথা না ঘামাই তাহলে এই চাঞ্চল্যেই মুক্তি পেতে পারি। এই হল বিস্রংসনের ভাব। জীবনেই মুক্তি। এই দেহের যখন মৃত্যু হবে তখন এমনি করে ঘটাকাশের আবরণ ভেঙে যাবে আর অবরুদ্ধ আকাশ মহাশূন্যে মুক্তি পাবে। এই মুক্তি এখানে প্রতিমুহূর্তে পাচ্ছি, যখন শূন্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলছি। তারপরে কী থাকছে? কিছুই থাকছে না। এটা আমাদের অস্তিত্বের একটা শাশ্বত সত্য।

ভোগের শেষে নির্বেদ আসে। একটা বেগ দেখা যায় আবার সেই বেগ শান্ত হয়। শান্ত হবার পর দেখছি—কিছুই থাকে না। সূর্য উঠল। আলো বাড়তে লাগল, ক্রমশ মধ্যগগনে উঠল, তারপর ঢলে পড়ল, সমস্ত বৃত্তি শূন্যে মিলে গেল। এই শূন্যে মিলিয়ে যাওয়াকে ঋষিরা বলতেন সূর্যের অস্তে গমন। অস্ত মানে আপন ঘর। তখন বরুণের মহারাত্রি এসে সমস্ত আবৃত করে দেয়। এমনি করে আমরা প্রতি জিনিসকে এক মুহূর্তে ধরছি, অন্য মুহূর্তে সে শিথিল হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। এটাকে নিয়েই বৌদ্ধদের ক্ষণভঙ্গবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের মূল কথা ছিল যে, ক্ষণগুলিকে, বিন্দুগুলিকে যদি ধর, তাহলে একটা ক্ষণের সঙ্গে আরেকটা ক্ষণের সম্বন্ধ আকস্মিক মনে হবে। যে ক্ষণে উৎপন্ন হচ্ছে তারপরের ক্ষণে শূন্যে মিলে যাচ্ছে। যদি এমনি করে ক্ষণে ক্ষণে মিলে যাওয়াকে অনুভব করি, তাহলে আসক্তি শিথিল হয়ে যায়, থাকে শুধু প্রশান্তি। তখন প্রপঞ্চ থেমে যায়। যে থাকে সে শান্ত, সুস্থ, শূন্য। একে নাস্তি অস্তি দুটোই বলতে পারি। সন্ধ্যার আকাশে যেন আলো নেমে যাওয়া। এই ভাব থেকে বৈরাগ্যসাধনার সূত্র পেয়েছি। আমরা বৈরাগ্যকে অপছন্দ করি। আজকাল বৈরাগ্যের সম্বন্ধে একটা বৈরাগ্যভাব উঠেছে। বৈরাগ্য কিছুই নয়, চেতনাকে শুধু মুক্ত রাখা—আকাশের মতো নির্মল। তার মাঝে অস্তিত্ব আসছে, ছায়া ফেলছে, আবার চলে যাচ্ছে। এইটিই নচিকেতার তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর। পিছনে যে একেবারে ফাঁকা এইটাই পরম সত্য। জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে এই বিস্রংসনের সাধনা, ভাবনা করা—মুহূর্তে মুহূর্তে শূন্যে মিলে যাচ্ছি। বস্তুত কিছুই থাকছে না, এটাকেই স্পষ্টভাবে অনুভব করা, এটাই বিদ্যা।

৫।। আগের কথা আরেক ঢঙে বলা হচ্ছে। এই যে প্রাণ-অপান, আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দ, এটাই বাইরের ব্যাপার। মানুষ প্রাণ-অপান দিয়ে বাঁচে না। অস্তিত্ব দ্বৈতের মাঝে নিহিত নেই। তার পিছনে আর কিছু রয়েছে। সেটা শূন্যতা, সেখানে কিছুই পরিশিষ্ট নেই। তাকেই অবলম্বন করে আমাদের অস্তিত্বের দোলা চলছে। থাকতে হবে সেই

ফাঁকাতে, শূন্যে; আর শূন্যের মাঝে তরঙ্গের মতন প্রাণ অপান চলে যাচ্ছে।

৬।। এইবার সাক্ষাৎভাবে যম নচিকেতার তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। সনাতন গভীর সত্যের কথা। মরণকে পেলে পর আত্মার কী হয়। **গুহ্যম্ ব্রহ্ম সনাতনম্**—ব্রহ্মের অর্থ বৃহতের চেতনা, আগে যাকে বলা হয়েছে ঋতম্ বৃহৎ। বৃহতের অর্থ চেতনার প্রসারণ। চেতনার সঙ্কোচ হল অপানের ক্রিয়া, মৃত্যুর ক্রিয়া। চেতনার প্রসারণ প্রাণের ক্রিয়া, অমৃতের ক্রিয়া। এই প্রসারণের মধ্যেই আমাদের যথার্থ স্বরূপ। চরম প্রসারণে সব নাস্তি হয়। এখানে শঙ্করদর্শন বৌদ্ধদর্শনে কীভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে দেখা যায়। প্রসারণের মাঝে অস্তির দিক রয়েছে। শঙ্করাচার্য এটির উপরেই জোর দিয়েছেন। কিন্তু তারপরে যে নাস্তিত্ব, তাকেই বুদ্ধদেব নির্বাণ বলেছেন। এই শূন্যতার মাঝে নিজেকে তলিয়ে দেওয়া। এটাই সনাতন ব্রহ্ম। প্রসারণের চরম অর্থ শূন্যতা। এই রহস্য গুহ্য। সহজে তার বোধ হয় না। মরণকে যখন আত্মা পায়, তখন তার কী অবস্থা হয়, তার direct answer সরাসরি উত্তর দেওয়া হচ্ছে। এখানে কোনো বিশেষ লগ্নে মরণকে পাওয়া এই কথা বলা হচ্ছে না। আমরা প্রতি মুহূর্তে মরণকে পেতে পারি। তার রূপ হচ্ছে পরম শূন্যতা। আর তাই আমাদের অস্তিত্বের আধার। চেতনার কোনো উপাধি নেই—তার সম্পর্কে সচেতন থাকা—এটাই বিদ্যার সাধনা। এই সাধনার ধারা হচ্ছে নেতি নেতি। বাইরে থেকে যা কিছু আসছে বা আসবে এবং ভিতর থেকে যা ফুটবে তার কারও সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছি না। নিজেকে বিবিক্ত রাখছি, বলছি এ নয়, এ নয়, নেতি, নেতি। কেনোপনিষদে একেই বলা হয়েছে, তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদম্ উপাসতে। যা তুমি সামনে দেখছ, মানুষ যাকে আঁকড়ে ধরছে, সে ব্রহ্ম নয়। চেতনার বাইরে থেকে ভিতর থেকে অনেক কিছু আসবে, সে সমস্তের পিছনে যে শূন্যতা রয়েছে তাকে যদি ধারণা করি তাহলে চিত্ত আসক্তিশূন্য হয়। তখনই অস্তিত্বের রসের উপলব্ধি করতে পারি। অস্তি-নাস্তির মিলন হয়। আর সেই মিলনের ভূমিকায় জীবনের দ্বন্দ্বকে তখন প্রক্ষেপের মতন মনে হয়। সামনে প্রাণ-অপানের দ্বৈতধারায় যে দোলা তার পিছনে একটা সত্তা রয়েছে তাকে অস্তিও বলতে পারি না, নাস্তিও বলতে পারি না। এটাই মরণ। সামনে যেটা সে জীবন। জীবন মরণের উপাশ্রিত। প্রতি মুহূর্তে মরণকে উপলব্ধি করতে পারি, যদি জীবনের পটভূমিকায় অনাসক্তিরূপে, শূন্যতারূপে মরণকে গ্রহণ করতে পারি।

৭।। মরণকে পাওয়া যেতে পারে তিনভাবে। একরকম পাওয়া প্রতি মুহূর্তে মরণকে পাওয়া। প্রতি মুহূর্তে সমস্ত কিছু শূন্যে মিলে যাচ্ছে, কোনো কিছুতে আসক্ত হচ্ছি না। আমরা মনে করি আসক্তির দ্বারা রস পাব, এটি অবিদ্যা। রস পাওয়া যায়—অনাসক্তির দ্বারা। ভোগের চিদ্ব্যাপার (চিন্ময় ভোগ), তার একদিকে নিরুপাধিক একটা অনুভব, যেখানে কিছুই নেই, রসের যোগান আসে সেখান থেকে। পিছনে যদি শূন্যতা না থাকত তাহলে সম্ভোগে রস পেতাম না। যখন শূন্যতাতে প্রতিষ্ঠিত হই, তখন যে রস বিষয়ে পাচ্ছি তাকে আমার মাঝে পাব—এটাই আত্মারামত্ব। মৃত্যু উপসেচন, মৃত্যু এক চাটনির মতন। রস তার মাঝেই রয়েছে, জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে, সম্ভোগের প্রত্যেক ক্ষণে যদি মৃত্যুকে বরণ করতে পারি। এই উপলব্ধি যতক্ষণ পাচ্ছি না, ততক্ষণ আমরা মরণকে পাই প্রাকৃতরূপে, সেটা মৃত্যুর অন্ধকারের দিক। এই শ্লোকের মাঝে তার কথা বলা হয়েছে। আত্মা যে পর্যন্ত এই শূন্যতার উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না সে পর্যন্ত তার দুটি

গতি হয়। একটা স্থাণুত্ব আর একটা শরীরত্ব। স্থাণুত্ব প্রদীপ নিভিয়ে দেওয়ার মতন। এখানে আমরা যাকে পুনর্জন্মবাদ বলি তার একটা নতুন ব্যাখ্যা পাই। আমাদের মাঝে একটা বিশ্বাস আছে যে জীবমাত্রের পুনর্জন্ম হয়, মানুষমাত্রের পুনর্জন্ম হয়। এ বিশ্বাসের পূর্ণ সমর্থন উপনিষদে পাওয়া যায় না। উপনিষদে তিনটি গতির কল্পনা আছে। পিতৃযান, দেবযান আর আরেকটি গতি যেটাকে তৃতীয়স্থান বলা হয়, তৃতীয় ভূমিতে অবস্থান। পিতৃযানে আবর্তের সৃষ্টি হয়। আমাদের চেতনা ঊর্ধ্বমুখী হয়, ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে। আবর্তগতি পিতৃযানের পথ। দেবযানে উৎক্রান্তি হয়। তখন চেতনা ঊর্ধ্বে উঠে যায়, পৃথিবীতে আর ফিরে আসে না। ঊর্ধ্বলোক থেকে ঊর্ধ্বলোকে তার গতি হয়। এইরকম পিতৃযান এবং দেবযান গতি তখন হয় যখন আমাদের আত্মসত্তা দানা বেঁধেছে, একটা শুদ্ধ অহমের আভাস আমাদের ভিতর জেগেছে, চিত্তসত্তা জাগ্রত হয়েছে। তখন পুনর্জন্ম বা উৎক্রান্তি সম্ভব। তা যদি না হয় অর্থাৎ আমাদের মাঝে অহম্ বা চৈত্যসত্তা সুস্পষ্ট আকারে না গড়ে উঠে থাকে তাহলে মৃত্যু সময়ে সমস্ত ভূতগুলি বিশীর্ণ হয়ে যায়। যে মূল উপাদান থেকে আধারের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে ফিরে যায়।

জায়স্ব, ম্রিয়স্ব ইতি তৃতীয়ং স্থানম্ (ছা ৫।১০।৮)। যেখানে সেই ভূতগুলো জন্মেছে সেখানেই আবার মরে যাচ্ছে। তাদের না সংসারগতি, না ঊর্ধ্বগতি। ভাষ্যকার এর ব্যাখ্যা করেছেন এবং উপনিষদেও বলেছে, যে সমস্ত ইতর প্রাণী চেতনার নিম্নশ্রেণিতে রয়েছে, তাদের বেলায় এই আইন খাটে। তাদের জন্মান্তর হয় না। বুদ্বুদের মতো তারা জন্মায় আর বুদ্বুদের মতো ভেঙে পড়ে। এই আইন মানুষের পক্ষেও খাটে। অনেক মানুষের চেতনা নিম্নস্তরে থাকে। কাঁচা আমির ভাব। ঊর্ধ্বে যাবার কোনো আকাঙক্ষা নেই। তাদের পুনর্জন্ম নাও থাকতে পারে। গাছের মাঝে যেমন অজস্র ফুল ধরে, প্রত্যেকের মাঝে ফল হবার সম্ভাবনা আছে কিন্তু আমরা দেখি অনেক ফুল ঝরে পড়ে। আর যা ফল হয় তাদের ভিতরেও সব পাকে না। সমস্ত ভূতবর্গকে নিয়েও এরকম ব্যাপার চলছে। জন্মান্তর হওয়া আমাদের পক্ষে একটা বিভীষিকার মতো মনে হয়। কিন্তু সবারই যে জন্মান্তর হবে একথা সত্য নাও হতে পারে। বরঞ্চ বলতে পারি জন্মান্তর তার হচ্ছে যে একদিন পাকবে।

আত্মার পরিপক্কতার জন্য জন্মান্তর আবশ্যক।—'ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় অত্রৈব প্রবিলীয়তে'—এই গতিই স্বাভাবিক। এটিই স্থাণুত্ব। যদি কোনো আত্মাতে শুদ্ধ অহমের উন্মেষ না থাকে, লোকোত্তরের পিপাসা যদি তার ভিতরে না জাগে, পরমাত্মার দ্বারা বৃত্ত না হয়ে থাকে, (যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ—যাকে তিনি বরণ করেন সেই তাঁকে পায়) তাহলে সে স্থাণুত্বকে পাবে। কিন্তু এই অগণিত ভূতের মাঝে কতকগুলো selected souls আগে থেকে marked (চিহ্নিত) থাকে। এরাই শেষ পর্যন্ত পাকবে। যারা এমন করে বৃত, chosen souls, তাদেরই জন্মান্তর হয়। তাদের জন্যই বলা হয়েছে **যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ**। যদি তাদের সাধনা এই জন্মে পূর্ণ না হয়ে থাকে তাহলে আবার তাঁরা পৃথিবীতে ফিরে আসেন এবং আবর্তনের পরে হয়তো তাদের উৎক্রান্তি হয়। অথবা পূর্ণজ্ঞান লাভ করে এখানেও লয় হয়ে যেতে পারে। তাহলে তারাও স্থাণুত্ব পাবে। তাহলে স্থাণুত্বের দুটি ধারা হল—একটা অজ্ঞানীর স্থাণুত্ব—যাদের মাঝে কোনো অভীপ্সা জাগেনি তারা বিশীর্ণ হয়ে যেখানে জন্মাচ্ছে সেখানেই লয় হয়, Return to elements। আর একটা প্রজ্ঞানীর স্থাণুত্ব। যাঁরা প্রজ্ঞা—ব্রহ্মকে লাভ করেছেন, তাঁরাও ভূতেভ্যঃ

প্রবিলীয়ন্তে—they also return to elements, কিন্তু তাঁরা চিৎস্বরূপ হয়ে চিৎবীর্য নিয়ে পার্থিব জগতে প্রবেশ করেন, পার্থিব শক্তির সঙ্গে এক হয়ে যান। তাতে পার্থিব চেতনা লাভবান হয়। পার্থিব চেতনাকে প্রজ্ঞানীর মৃত্যু এই ভাবে আবিষ্ট করে charge করে। কিন্তু অজ্ঞানীর মৃত্যুতে শুধু elements-এ ফিরে যায়।

আত্মার আর একটা স্থিতি হতে পারে। সেটা দুইয়ের মাঝামাঝি। যেমন প্রজ্ঞানীর স্থাণুত্বের দিক আছে, তেমনি অভিযানেরও দিক আছে। মনে হয় প্রজ্ঞানী সবার সঙ্গে মিলে গেল। বাইরের দৃষ্টিতে তিনি পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে তিনি পৃথিবীতে অগ্নিগর্ভা করছেন। আবার সেই সিদ্ধচেতনা মাঝখানেও দাঁড়িয়ে যেতে পারে, আর আবার পৃথিবীতে জন্ম নিতে পারে। যেমন অজ্ঞানীর সংসারগতি তেমনি এটা প্রজ্ঞানীর সংসারগতি। স্থাণুত্ব গ্রহণ না করে পার্থিব চেতনার উপর তার সত্তাকে অনুবিদ্ধ করা। এরা আধিকারিক পুরুষ। অধিকার সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তারা চিন্ময় স্থাণুত্ব লাভ করে না। গৌতমবুদ্ধকে সেইভাবে আধিকারিক পুরুষ বলা হয়েছে। নির্বাণ তাঁর করামলকবৎ হলেও তিনি তাকে গ্রহণ করেন নি।

বেশিরভাগ জীব স্থাণুত্ব প্রাপ্ত হয়। আর যারা বৃত তাদের পক্ষে দুটো গতি আছে। হয় তারা পিতৃযান ধরে ফিরে আসে অথবা দেবযানপথে তাদের উৎক্রান্তি হয়। এটাকেই প্রেতি বলা হত, যার থেকে 'প্রেত্য' হয়েছে—লোক লোকান্তরে গতি। ঋগ্বেদে অগ্নিকে প্রেতীষণি বলা হয়েছে। অগ্নির প্রেষণায় যেন আত্মাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। সেই জীবকে এক লোক থেকে অন্য লোকে অভিযান চালিয়ে নিয়ে যায়—ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ-মহঃ-জনঃ-তপঃ-সত্য—এমনি সপ্ত লোকের ভেতর দিয়ে অভিযান চলে। যদি এইরকম অভিযান এখান থেকেই জীব অন্তরে অনুভব করে, তখন তার দুটি গতি হয়। দেহপাতের পরে তার সত্য সত্তা চিন্ময় স্থাণুত্ব লাভ করে। যাজ্ঞবল্ক্য এই বলেছেন। অথবা আর এক প্রকারের সংসারগতি হতে পারে। তিনি এই স্থাণুত্ব লাভ না করে, মাঝখানে কোনো একটা লোক থেকে পার্থিব চেতনার 'পরে শক্তিপাত করতে পারেন। এইগুলি আত্মার মরণের পরে কি অবস্থা হয় তার বর্ণনা।

প্রথম শ্লোকে চিন্ময় স্থাণুত্বের কথা বলা হয়েছে। সেখানে জগতের কোনো হিতবাসনা থাকে না। জগতের সঙ্গে যখন চেতনা একাকার তখন তার হিত স্বভাবসিদ্ধ। চেতনা এবং সঙ্কল্প দুই-ই এক। এই অবস্থার অনুভব থাকা দরকার। এইটাই জগতহিতের ভিত্তি, শূন্যতার ভিত্তি। তারপরের শ্লোকে প্রজ্ঞানীর ও অজ্ঞানীর স্থাণুত্ব এবং তার আর একটি গতি, শরীরলাভের কথা বলা হয়েছে। সেটা দুপ্রকারের হতে পারে। বারবার জন্ম নিয়ে সংসারে আসে বা ঊর্ধ্বে থেকে দিব্যশরীর লাভ করে। এটাই একপ্রকারের অমরত্ব। চণ্ডীতে এই রকম অমরত্বের কথা আছে। সেখানে সুরথ রাজা সাবর্ণি মনু হয়েছিলেন। মনু একজন আধিকারিক পুরুষ। তিনি সমাধি বৈশ্যের মতন দেবীতে লয় হয়ে গেলেন না। এইগুলো মৃত্যুকে লাভ করার পরের গতিগুলি। **'যথাকর্ম যথাশ্রুতম্'**। স্থাণুত্ব দুইরকম হতে পারে। সংসার কিংবা উৎক্রান্তি নাও হতে পারে। এটা যথাকর্ম স্থাণুত্ব। আবার আর একটা স্থাণুত্ব আছে যার ভিত্তি শ্রুত, শ্রুতিলভ্য বিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান। এখানে কর্ম আর তত্ত্বজ্ঞানকে differentiate করা হয়েছে। যারা শুধু mechanical function of natureঅনুসারে কর্ম করে তারা মূল প্রকৃতিতে ফিরে যায়। আর যারা শ্রুতবান,

শ্রুতিসম্পন্ন তারা বিদ্যাযুক্ত স্থাণুত্ব লাভ করে, তারা earth-nature-কে charge করে।

৮।। মৃত্যুর কথা বলা হল। এবার জীবনের কথা। আমাদের প্রাকৃত-জীবন আর আধ্যাত্মিক জীবন দুইয়ের ভেদ নেই—এই কথা বৌদ্ধদর্শনে নাগার্জুনের সিদ্ধান্তে পাই। তিনি বলেছেন ভব আর নির্বাণ দুই-ই এক। আমরা দুই তরফেই ঝুঁকে পড়ি। এক সময়ে চাই সংসারকে, আবার এক সময় চাই ভগবানকে। যতক্ষণ দুটোকে মিলিয়ে নিতে না পারছি ততক্ষণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারব না। তিনিই নির্বাণ, তিনিই সংসার। জীবনের মাঝে মরণকে পাওয়া, মরণের মাঝে জীবনকে পাওয়া।

অহরহ যা ঘটছে, সিদ্ধচেতনায় তা প্রতিফলিত হয়। ঘুমের অবস্থা নিজের মাঝে অনুভব করেন, তেমনি জাগ্রত অবস্থাকেও অনুভব করেন। ঘুমন্ত অবস্থায় তিনি থাকেন যেন মায়ের বুকে ছোট্ট শিশু ঘুমিয়ে আছে, ঘুমিয়ে থেকেও যেন জেগে আছে। এটাই আত্মভাবের বিভূতির এক দিক। আবার যা ঘুমিয়ে রয়েছে তার প্রতি কোনো ধিক্কার নেই। প্রথম চরণে হচ্ছে প্রাকৃত অবস্থার বর্ণনা। জগতে সবাই ঘুমিয়ে আছে। তাদের মাঝে একজন জেগে রয়েছেন। জেগে থেকে তিনি কামনার জাল বুনে চলেছেন। তাঁরই দিব্যকামনা আমাদের চেতনায় প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। ঘুমের মাঝে তিনি স্বপ্নের জাল রচনা করে চলেছেন। সংসারে আমরা যা চাই, তা যেন তাঁরই চাওয়া। তিনি জেগে থেকে চাইছেন। আমরা ঘুমিয়ে থেকে স্বপ্নের ঘোরে চাইছি। তাই অশান্তি ঘটে আমাদের দিকে। ভুল আমাদের বিচারে। তাঁর বিচারে এই ভুলও সত্যিকারের চাওয়া। তিনি চাইছেন এই ভুল হোক। তখন একটি আঘাতে আমাদের ভুল ভাঙে। তখন আমাদের বিচারে যে সত্যকার চাওয়া সে জাগে। কিন্তু তাঁর কাছে ভুল এবং ভুল ভাঙা—দুই-ই সত্য। এইভাবে জগতকে দেখতে হয়। সব কিছু তাঁরই সঙ্কল্প, তাঁরই নির্মাণ। যখন তার থেকে বিচ্যুত হই, তখন কামনা আমাদের আঘাত করে। ভুল করি, আঘাত পাই, আবার জেগে উঠি। সমস্ত ঘটছে তাঁরই ইচ্ছায়।

তাঁর ইচ্ছা, তাঁর সত্য সঙ্কল্পের মাঝেই আমাদের কামনা, সঙ্কল্প রয়েছে। এই অনুভব যদি করতে পারি, তখন পাপপুণ্যের ভালোমন্দের দ্বন্দ্ব সব ethical (নীতিবোধের) দ্বন্দ্ব নষ্ট হয়ে যায়। কৌষীতকী উপনিষদে আছে, একটা অবস্থা আসে যখন অবিদ্যার সমস্ত গ্রন্থি বিদীর্ণ হয়ে যায়, সমস্ত কিছু সংস্কার সিদ্ধচেতনা নীচে থেকে ঝেড়ে ফেলে—তখন তার মাঝে প্রশান্ত অবস্থা আসে। আর কেন এ অন্যায় করলাম বা কেন এ ভালো কাজ করলাম না এরকম কোনো দ্বিধা থাকে না। পাপপুণ্য দুই-ই বিলীন হয়ে যায়। দুই-ই তার মাঝে লয় হয়ে যায়। এটা একটা dangerous philosophy (সাংঘাতিক দর্শন)। কিন্তু এটাই সত্য। এমন কোনো দেবতা নেই যার মাঝে শুধু ভালো আছে, মন্দ নেই। পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দ সবই তিনি। গীতাতে বলেছেন—মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে (১০।৮)। চণ্ডীতে আছে ভ্রান্তিরূপেও তিনি তেমনি চিতিরূপেও তিনি। মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ— গীতা। 'সর্বং খলু ইদম্ ব্রহ্ম' বলব আর শুধু ভালোর সঙ্গে তাঁকে জড়িয়ে দেব, এটা আমাদের দর্শনের মধ্যে নেই। পাপ পুণ্য সবই তাঁর মাঝে থাকে অথচ তিনি শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্। পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব যদি চলে যায় তখন সে ব্যক্তি কি পাপে অভিনিবিষ্ট হয়? তা হয় না। কর্ম তখন সুকৃত হয়, প্রবৃত্তি প্রেমের দিকে হয়, শুধু পাপের প্রতি কোনো বিদ্বেষ থাকে না। Law of mercy—কারুণ্যভাব। Christian Philosophy-তে (খ্রিস্টীয় দর্শন)

আংশিকভাবে এই mercy ভাব দিয়ে করুণা দিয়ে পাপপুণ্যের দ্বন্দ্বকে solve (নিরসন) করার প্রযত্ন হয়েছে। আমাদের দেশে এটা পরিপূর্ণরূপে সমাধান করা হয়েছে পাপপুণ্যের ঊর্ধ্বে গিয়ে। সমস্ত চলেছে পরম কল্যাণের দিকে। এ দৃষ্টি যদি গ্রহণ করি তখন Evil যাকে বলছি, পাপ, মাঝখানের একটা phase বা পর্যায়রূপে থাকে। যতক্ষণ জড় কিংবা অচেতন দশায় আছি ততক্ষণ পাপ-পুণ্যের বালাই নেই। মাটির ঢেলার কাছে কী পাপ কী পুণ্য? তেমনি দ্বন্দ্বাতীত হলেও পাপপুণ্যের ভাব থাকে না। দ্বন্দ্ব থাকে মাঝখানে। তখন পাপ বলব তাকে যখন চেতনা অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত। আর চেতনার প্রকাশের অভিযানের দিককে বলব পুণ্য। জৈনধর্মে একটা ধর্মাধর্মের সমালোচনা আছে—যেখানে গতি সেখানে ধর্ম। যেখানে গতি স্তব্ধ সেখানে অধর্ম। গতি কৈবল্যের দিকে, চেতনার প্রকাশের দিকে। যে সমস্ত কর্ম ওদিকে নিয়ে যায়, চিৎ প্রকাশের অনুকূলে, সেই ধর্ম। আর যেখানে ওদিকে গতি হয় না, গতি স্তব্ধ হয়, সেটা অধর্ম। পাপে চেতনার পূর্ণ প্রকাশ হয় না। এক সময় চেতনার পূর্ণ প্রকাশ ছিল না, সেই অপ্রকাশ চিত্তে যখন স্বপ্রকাশ জাগে তখন ক্ষণিক প্রকাশ আর ক্ষণিক অপ্রকাশ। এটাই মাঝখানের পাপপুণ্যের জগৎ। সিদ্ধচেতনাতে এ দ্বন্দ্ব নেই।

ছান্দোগ্য উপনিষদে পাপের লক্ষণ দেওয়া হয়েছে—যেখানে দ্বন্দ্ববোধ সেখানে পাপ। প্রাকৃতচক্ষু পাপ, কেননা সে ভালোমন্দকে দেখে। কিন্তু যে মুখ্যপ্রাণ অপহতপাপ্মা, সে তাকে অতিক্রম করে গেছে। যেমন একটা অশ্ম, পাথরের উপর মাটির ঢেলা ছুঁড়ে দিলে মাটির ঢেলা বিশীর্ণ হয়ে যায়, তেমনি চিন্ময় প্রাণকে যখন লাভ করে তখন পাপপুণ্যের দ্বন্দ্ব বিশীর্ণ হয়ে যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে, অশনায়া বৈ পাপ্মা—বুভুক্ষাই পাপ। কামনা বাসনা যতক্ষণ আছে, যতক্ষণ আপ্তকাম হইনি, ততক্ষণ পাপের অধিকার। এ দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে পাপপুণ্য নেই। তিনি যেন তাদেরকে কুক্ষিগত করে রেখেছেন। এটাই এখানে বলা হয়েছে। আমরা ঘুমিয়ে আছি। তিনিই সবার মধ্যে জেগে রয়েছেন।

যিনি জেগে আছেন তাঁর স্বরূপ কী?

তিনি শুক্রজ্যোতি। পাপ নেই পুণ্য নেই। সেই ব্রহ্ম, সে-ই অমৃত। তাকে কেউ অতিক্রম করে যেতে পারে না। সমস্ত লোক তার অধীন। জগতকে দেখতে হবে সেই পরমের অধীনরূপে। সমস্তই হচ্ছে তাঁর আদেশে। তিনি সমস্ত কিছুকে আবৃত করে ছাপিয়ে রয়েছেন। অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলম্। তিনিই মরণ, তিনিই শূন্যতা। তিনি তাঁর শুক্রজ্যোতি দ্বারা সমস্ত কিছুকে আবৃত করে রয়েছেন। এ ভাবনা দৃঢ় হলে বাসনাক্ষয় সহজ হয়।

সমস্ত লোক তাঁতেই আশ্রিত, ভূলোক থেকে সত্যলোক পর্যন্ত সবই তাঁর অধীন। যতক্ষণ মহর্লোকে পৌঁছই না, পাপপুণ্যের দ্বন্দ্ব থাকে। এ দ্বন্দ্ব ভূলোকে স্থূলরূপে, ভুবর্লোকে সূক্ষ্মরূপে আর স্বর্লোকে কারণ বা বীজরূপে থাকে। তারপর আলোর অভিযান। এ সমস্ত আলোর উন্মেষ—এসব লোক তাঁতেই শ্রিতাঃ, কিনা আশ্রিত। পাপপুণ্যকে sunspot, সূর্যকলঙ্কের মতো কল্পনা করতে পারি। সবই আলো, কিন্তু তার মাঝে সূর্যের কলঙ্কের মতো একটা কলঙ্ক দেখা দেয়। সেটা আলোরই কলঙ্ক। আমাদের দৃষ্টির যা কলঙ্ক, তা আলোরই। তার প্রয়োজন আছে। একটু কলঙ্ক না থাকলে সৃষ্টি হয় না। এটাই দ্বৈতভাবের বীজ। পাপের বীজও তাঁরই শক্তি। খুব ক্ষুদ্র অংশ, কিন্তু তাঁরই। অবিদ্যা বিদ্যারই একটা বিভূতি।

পাপপুণ্য সবই আমাদের কামনার পরিপাক। অকামনার মাঝে সব সমন্বয় করতে হবে। এইভাবেই থাকতে হবে।

৯-১১।। আগের শ্লোকে প্রত্যগাত্মার কথা Individual Self-realisation এর কথা বলা হয়েছে। এখানে বিশ্বাত্মকরূপে কীভাবে তিনি অধিষ্ঠিত আছেন, সেটা বলা হচ্ছে। তিনটি symbol দিয়ে বোঝানো হচ্ছে। অগ্নি, বায়ু, সূর্য। বৈদিক conception হিসাবে তাদের স্থান হচ্ছে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক। তাঁদের যে তিনটি চৈতন্য তাদের তাঁরা দেবতা বলতেন। সেগুলি হচ্ছে অগ্নি-চৈতন্য, বায়ুচৈতন্য ও সৌরচৈতন্য। অধিদৈবত দৃষ্টিতে তাঁরা অগ্নিদেবতা, বায়ুদেবতা আর সূর্যদেবতা। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অগ্নি হচ্ছেন দেহচেতনা, বায়ু প্রাণচেতনা, আর সূর্য মনশ্চেতনা। উপনিষদের হিসাবে এখানে মনশ্চেতনা বলতে ইন্দ্রিয়-মন না, কিন্তু বোধ। দেহ, প্রাণ এবং বোধ এই তিনটির symbol হচ্ছে—পৃথিবীর আলো অগ্নি, অন্তরিক্ষের আলো বিদ্যুৎ, বায়ু; আর দ্যুলোকের আলো সূর্য। আলো হচ্ছে চৈতন্যের symbol। এরা বিশ্বদেবতা। অগ্নির function হচ্ছে রূপ সৃষ্টি করা। সে রূপকৃৎ। বায়ুর function হচ্ছে প্রাণের স্পন্দন। আর সূর্যের চিৎপ্রকাশ। বিরাটরূপে ভাবনা করতে গেলে একই অগ্নি সব রূপ ধরছে। সেই বায়ুরূপ ধরছে। কিন্তু সূর্যের বেলায় রূপের কথা বলা হচ্ছে না। অগ্নি আর বায়ু সাংখ্যদৃষ্টিতে প্রকৃতিস্থানীয়। অগ্নি Material আর বায়ু Energy supply করছে। একজন উপাদান আর একজন শক্তি জোগাচ্ছে। সমস্ত উদ্ভাসিত হচ্ছে চৈতন্যে। সে-ই সূর্য। বিচিত্র উপাদানে গঠিত নানা রূপ, তার ভিতরে শক্তি রয়েছে। এই বিচিত্ররূপা শক্তিকে চৈতন্য উদ্ভাসিত করছে।

এই যে রূপের এবং প্রাণের এবং বোধের দেবতা—তাদের স্বধাম আছে। যেখানে জগত নেই সেখানে তারা আছে। জগত তাদের বিসৃষ্টি। তিনটি একই দেবতা। তিনটি ভূমিতে আলাদারূপে দেখছি। লোকোত্তরে রূপ, প্রাণ, চেতনা এক হয়ে রয়েছে। চৈতন্যতত্ত্ব প্রাণে স্পন্দিত হয়ে রূপ ধরছে। যতক্ষণ রূপ ধরেনি ততক্ষণ অসম্ভূত, হয়নি। তিনটি ওতপ্রোত হয়ে সক্রিয় হচ্ছে, সম্ভূত। কোনো পারম্পর্য নেই, তবে তত্ত্বের তারতম্য আছে। যুগপৎ একই তত্ত্ব রূপ, শক্তি এবং চেতনাতে নিজেকে প্রকাশ করছে। এই প্রকাশ যেমন একটা বিচ্ছুরণ তেমনি রূপ, প্রাণ, চেতনার সমাহার। যে অব্যক্ত সে ব্যক্ত হতে গিয়ে স্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। এটা তার মূল সঙ্কল্প। সোঽকাময়ত—অহং বহু স্যাং প্রজায়েয়, স তপোঽতপ্যত। অন্য উপনিষদে আছে—স তপস্তপ্ত্বা ইদম্ অসৃজৎ। প্রথমে শুধু সঙ্কল্প—বহু স্যাম্। তারপর নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, স একাকী নৈব রেমে। একা তাঁর ভালো লাগেনি তাই দ্বিধা হলেন। এক অংশ প্রকৃতি আর একটি তাঁর স্বরূপ। তিনি প্রকৃতির সঙ্গে মিলে জগত সৃষ্টি করলেন। এটা বিসৃষ্টি। বিসৃষ্টির দ্বিতীয় ধাপ। আত্মা হলেন ইদম্। এই ইদম্ সাংখ্যের অব্যক্ত প্রকৃতি—তাঁরই নিজেকে অস্বীকার করার মতো। যা শুদ্ধ চৈতন্য ছিল সে যেন নিজেকে অস্বীকার করে অচৈতন্যের একটা আবাস তৈরি করল। এখানে একটা polarity-র উদ্ভব। এক প্রান্তে আত্মা অপর প্রান্তে ইদম্, আত্মা থেকেই ইদম্। Spirit আর matter। এই যে ইদম্—তার মাঝে একটা ধর্ম নিহিত ছিল পুরুষকে serve করবার। পুরুষ যা তার কাছে চায় তাকে রূপ দেবার জন্য ইদম্ প্রস্তুত। যেন কুমোরের হাতের কাদার তাল। তাকে যে কোনো shape দিতে পারে। সঙ্কল্প নিহিত থাকবে কুমোরের মধ্যে। উপাদান তাকে রূপ

দেবার জন্য সাবলীল, plastic হয়ে থাকবে। যখন আত্মচৈতন্য দ্বিধা হয় তখন ইদম্-এর মাঝে চিৎশক্তির প্রবেশ ঘটে। কখনো তাকে প্রবেশ বলা হয়, কখনো আবেশ। এটা তার তৃতীয় step (ধাপ)। এখানে এই তৃতীয় step এর বর্ণনা আছে। প্রথম step হচ্ছে শুধু এক আত্মা আছে, একমেবাদ্বিতীয়ম্। ইদম্ তখন আত্মাতে সমাহিত। তারপর সেই আত্মার মাঝে কামনার স্পন্দন হল। কাম বা ঈক্ষা বা তপঃ। সোঽকাময়ত, তদ ঐক্ষত স তপোঽতপ্যত—এই তিনটির ব্যবহার পাওয়া যায়। এটাই আত্মার স্বরূপশক্তি। প্রথম পর্বে সে আত্মাতে নিগূঢ় ছিল—এটা অসম্ভূতির দশা। তারপর সেটা স্পন্দিত হল। এইরকম নিত্যস্পন্দন চলে। যখন কালাতীত দৃষ্টিতে দেখি, তখন ব্রহ্ম একদিকে নিত্য অসম্ভূত, অথচ নিত্য সম্ভূত। মহাকাশে দুটি বিভাব যুগপৎ। একদিকে তিনি হচ্ছেন অনন্তকাল ধরে, আর একদিকে তিনি হচ্ছেন না—অসম্ভূত।

আমাদের চেতনায় একটা শান্ত ভাব থাকে। তাকে ভূমিকা করে চেতনার বিচ্ছুরণ ঘটছে। মন কোথা থেকে আসছে? ভিতর থেকেই আসছে। অথচ ভিতরে সে অমনা, অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ ইত্যাদি। যা ব্যক্ত হচ্ছে তার মূলে আছে অব্যক্ত। ব্যক্ত ও অব্যক্ত যুগপৎ। এটা প্রথম ভূমি। যথার্থ অদ্বৈত ভূমি। বৌদ্ধেরা এটাকেই শূন্য বলতেন। কিন্তু এটা শক্তিগর্ভ শূন্যতা। পূর্ণকে নিজের ভিতরে ধরে রাখে শূন্য। এই শক্তি শূন্য থেকে বাহির হলে আত্মা ইদম্ হয়। ইদম্ বললে বুঝতে হবে জড়। চৈতন্যের বৈপরীত। যেমনি আদি চৈতন্যের মাঝেও সব কিছু অব্যক্ত, তেমনি আদি জড়ের মাঝেও সব কিছু অব্যক্ত। অব্যক্ত না বলে অরূপ বললেই ভালো হয়। দুটোই অরূপ। চৈতন্য স্বরূপতঃ অরূপ। চৈতন্য রূপকে প্রকাশিত করে, নিয়ন্ত্রিত করে। অথচ তা রূপাতীত তত্ত্ব। তেমনি জড়কেও অরূপ বলতে পারি, সুষুপ্তির সঙ্গে তার তুলনা করতে পারি। সে সমস্ত কিছুর উপাদান, উৎস, সর্বযোনি অথচ তার কোনো রূপ নেই। আত্মা আর ইদম্—এটা অরূপের polarity। চৈতন্য সর্বাশ্রয় অথচ অরূপ। আর জড় সর্বযোনি অথচ অরূপ। মহা-অন্ধকারের মাঝে একটা polarity দেখা দিয়েছে, এটাই সৃষ্টির আদি ঈক্ষণ। এই যে polarity, জড়ের ও চৈতন্যের মাঝে যে বিভঙ্গ, এটা নিত্যকাল ধরে সেই একের মাঝে আছে।

এক অরূপকে দ্বিধা হতে দেখি। এটা সুষুপ্তির অনুভব, এটা প্রজ্ঞান-ঘনতা। Psychologically সুষুপ্তির আনন্দ। তার দ্রষ্টা আমাদের আত্মা। ঘুমে মন থাকে না। অথচ স্মৃতি থাকে। মনের অতীত কোন শক্তি দিয়ে তার বোধ করেছিলাম এটাই বোধশক্তি। জাগ্রতে, স্বপ্নে, সুষুপ্তিতেও তিনি বোধ করছেন। বিষয়, প্রকৃতি হবে আনন্দ আর পুরুষ তাদের স্বরূপ। সে প্রজ্ঞানঘনতা। এটাই সৃষ্টির মূলে পুরাণী প্রজ্ঞা। সমস্ত কিছু তাতে বিধৃত। কিন্তু এখন পর্যন্ত অব্যক্ত। তারপর বাহিরে তার অভিব্যক্তি হয়, সেটাও তার আবেশে। আবেশ হচ্ছে তৃতীয় ধাপ, অগ্নির প্রবেশ, বায়ুর প্রবেশ এবং সূর্যের উদ্ভাসন।

এই যে সূর্য, সৌরচেতনা, সে আত্মারই চৈতন্যরূপ। এই সমস্ত কিছুকে উদ্ভাসিত করছে। তাকে প্রবেশ বা আবেশ না বলে তাকে উদ্ভাসিত করছে, বলা হয়েছে। যেখানে আবেশের কথা বলা হয়, সেখানে immanence বোঝায়। আর যেখানে উদ্ভাসন সেখানে transcendence বোঝায়—অনুস্যূত থেকেও আলাদা থাকছে। অগ্নিশক্তির যে আবেশ, রূপচৈতন্যের যে আবেশ, আর বায়ু বা প্রাণচৈতন্যের যে আবেশ, এই দুটোকে প্রকৃতি পর্যায়ে রাখতে পারি। কিন্তু দুটোই আবেশ, যুগপৎ। আর, সমস্তই চৈতন্যদ্বারা উদ্ভাসিত।

আবেশ এবং উদ্ভাসন—এটাই তাঁর charge। এটাই কাম বা ঈক্ষণ বা তপঃ। কামনা প্রথমে জাগে—তখন সে অব্যক্ত। কি চাইছি—তা সে জানে না। যেমন আমাদের মাঝে একটা অস্পষ্ট বাসনার ব্যাকুলতা জন্মায়। যখন কি চাই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তখন এটা ঈক্ষা, চোখে দেখা। যা চাই, তার রূপ চোখের সামনে ফুটে ওঠে। তারপরে তপঃশক্তির radiation, যাতে ঈপ্সিত ঈক্ষিত বস্তু রূপ নেয়। কাম, ঈক্ষা বা তপঃ এই তিনটিই চিন্ময়ী মহাশক্তি, মহাপ্রকৃতির স্বরূপ। সেটা আবেশরূপে ইদমের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এই ঈক্ষা কী? সেটা হচ্ছে বহু হওয়া। বহু স্যাম্। এই বহু হওয়া দুইপ্রকারে হতে পারে। যার একরূপ, তারই multiplication। এই রকমের অনন্ত পরমাণু। এটা পুরুষের বহু হওয়া। সাংখ্য এটাকে স্বীকার করেছে। আর একটা বহু হওয়া, সেটা প্রকৃতির বহু হওয়া। উদাহরণরূপে মানুষ অনেক রয়েছে কিন্তু সব মানুষ একরকম নয়, তাদের ভিতর অনেক বিচিত্রতা রয়েছে। এটা প্রকৃতির বিচিত্রতা। বিচিত্র আছে বলে—আমরা একটা থেকে আর একটাকে পৃথক্ দেখতে পারি। এই প্রত্যেককে আবিষ্ট ও উদ্ভাসিত করে রয়েছে একটা চিৎশক্তি। যখন পুরুষের দিক থেকে বহুত্ব দেখি তখন বহুত্ব শুধু সংখ্যায়। কিন্তু সব সরূপ। আর প্রকৃতির বহুত্ব বিরূপ। দুটোই বহু হওয়া—তার পিছনে কাম ঈক্ষা তপঃ, will vision and radiation-এর ব্যাপার রয়েছে। এটা একটা process এর through দিয়ে প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে হয়। আর এই processটা হয় কালে। একটা বীজ যে অঙ্কুরিত হয়, গাছে পরিণত হয় ও তার ফল হয়, এগুলো হয় কতকগুলি পর্ব হিসাবে। বীজ থেকে ফল পর্যন্ত একটা ইতিহাস, একটা কাল রয়েছে। সে ক্রমে ক্রমে বিকশিত হচ্ছে। এই পর্ব দিয়ে বহু ভাবের সৃষ্টি হয়, গুণগত তারতম্য হয়, পরে ক্রমগত তারতম্য দেখা দেয়।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতেও এইরকম ঘটে। কেউ এখনও সাধনা আরম্ভ করেনি। কেউ হয়তো চলতে আরম্ভ করেছে। কেউ মাঝখানে আছে। আবার কেউ পৌঁছে গেছে। কখনও সংঘর্ষ দেখা দেয়। কখনও সামঞ্জস্য দেখা দেয়। যদি ঊর্ধ্ব থেকে দেখতে পারি, তাহলে এইসব দেখা যায়। বিশ্বলীলার মূলে এই রূপবৈচিত্র্য রয়েছে। **রূপম্ রূপম্ প্রতিরূপো বভূব**। আর একটা জিনিষ আমরা দেখি। সেটা হচ্ছে রূপের বিচিত্র ক্রমিক অভিব্যক্তি। এক এক রূপ এক এক stageএ রয়েছে। সাংখ্যের দিক দিয়ে বলতে গেলে গুণ হিসেবে জাতিভেদ করতে পারি। গুণের সমাবেশ দিয়ে আলাদা আলাদা রূপ পেতে পারি। তাহলে তিনপ্রকারে বহুরূপ হল। একটা সংখ্যাগত বহুরূপ quantitative multiplicity। একটা গুণগত বহুরূপ qualitative multiplicity। আর একটা ক্রিয়াগত বহুরূপ functional multiplicity।

যখন আত্মা থেকে ইদম্ আলাদা হল—তখন ইদমের মাঝে বহুভবনের অর্থাৎ বহু হওয়ার একটা পরিকল্পনা plan সূক্ষ্মভাবে potentially দেখা দিল। উন্মুখ হয়ে রইল। তারপরে আসে charge, যাকে এখানে প্রবেশ বলা হয়েছে। মনুসংহিতায় তাকে বীজনিক্ষেপ বলা হয়েছে। আসীৎ ইদম্ তমোভূতম্ প্রসুপ্তম্ ইব সর্বতঃ। সব সুষুপ্তির অবস্থাতে ছিল। অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ। তাতে তিনি অপ্ কিনা জল সৃজন করলেন, আর তাতে বীজ জন্মাল। পুরুষ আর প্রকৃতি যুগপৎ। তখন সুষুপ্তির অবস্থা। তারপর একটা পুরুষ আর একটা প্রকৃতি— ভেদের আভাস যখন হল, সেটাই হল কামনা, ঈক্ষা বা তপঃ। তার থেকে উৎসারিত হল আপঃ, প্রাণশক্তি, মহাসমুদ্র যেন থৈ থৈ করছে।

আত্মানুভবের প্রতীক symbol অনন্ত ব্যাপ্তির ভাব। একটা গভীরতা আছে অথচ প্রকাশের জন্য একটা ব্যাকুলতা রয়েছে এটা আপঃ। পুরুষ যে সুষুপ্তিতে প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেটা আপঃ হয়ে গেল। তৈত্তিরীয় উপনিষদে এটাকে অম্ভঃ বলা হয়েছে। এটা হচ্ছে আলোর একটা তরঙ্গ। যেমন একটা nebula-র সৃষ্টি হয়। শক্তি এবং আলোর একটা তরঙ্গ। সে 'আপঃ'। তার মাঝে বীজম্ অবাসৃজৎ, তিনি চিৎবীজের একটা charge দিলেন। তদ্ অণ্ডম্ অভবৎ হৈমম্। সেটা থেকে সুবর্ণের অণ্ড তৈরি হল। এটাই ব্রহ্মাণ্ড। এই ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে বিচিত্র রূপ সমাহিত পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। সে ভূতকে রূপ দিতে গেলে, তার জন্য যে শক্তি লাগবে তা হচ্ছে—অগ্নি, বায়ু ও সূর্য। রূপ হল অগ্নি, বায়ু তাতে প্রাণশক্তি সঞ্চার আর সূর্য—চৈতন্য—তাকে উদ্ভাসিত করবে। এটা কিন্তু পর পর না, যুগপৎ হচ্ছে। তখন সে অগ্নি, বায়ু ও সূর্যকে দেখছি প্রতিরূপ রূপে। তারা হয়—প্রতিবিম্ব স্থানীয়। অগ্নি ও বায়ুর যে প্রবেশ সেটা হচ্ছে রূপের মাঝে একটা প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করা। যেমন অগ্নিশক্তি প্রথম সম্পূর্ণরূপে আধারে অনুপ্রবিষ্ট হল, কিন্তু আধারের ক্ষমতা নেই যে তাকে ধরে রাখবে। তখন তাতে পড়ল এক ছায়া। কোথাও স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট। এর থেকে গুণগত বৈচিত্র্য। যে অনুপ্রবিষ্ট হল, সে তার ideal-কে দেখতে পাচ্ছে। সেই প্রতিরূপ। অগ্নিচৈতন্য একটা আধারে খানিকটা অভিব্যক্ত হল, তখন একটা অস্পষ্ট চেতনা বা ভাব তার মাঝে জাগল যে ঠিক আমারই মতন একটা পূর্ণ অগ্নিশক্তি রয়েছে। সে পূর্ণ অগ্নিশক্তিকে সে দেখবে বাইরে। আমরা পূর্ণতাকে বাইরেই খুঁজি। আমাদের মাঝে চেতনা পরিপূর্ণরূপে বিকাশ পায়নি। অথচ বোধ বলছে—একটা পরিপূর্ণ চৈতন্য বাইরে রয়েছে এটাই immanence and transcendence ভাব। যদি যা খুঁজছে তা সে পেয়ে যায়, তাহলে সে দেখবে—একই আগুন। এক অথচ অনেক। একই রূপ অথচ তার অনেক প্রতিরূপ। পূর্ণতা এক, অপূর্ণতা বিচিত্র। পূর্ণতাই এক এবং সর্বব্যাপী একত্ব। এটা বৈদান্তিক একত্ব। কিন্তু প্রত্যেক আধারকে আশ্রয় করে যে তত্ত্ব রয়েছে সেও এক। এটা সাংখ্যের একত্ব। পুরুষ বহু কিন্তু স্বভাবতঃ ধর্মতঃ তারা এক। সংখ্যায় বহু, তাই সাংখ্য। সে বহু পুরুষ বস্তুতঃ এক, সর্বব্যাপ্তিতে এক। তার যে একত্ব সেটা বৈদান্তিক একত্ব। বেদান্ত হচ্ছে একপুরুষবাদী।

৯।। অগ্নি যেমন ভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে রূপে রূপে প্রতিরূপ হয়েছে তেমনি একই আত্মা সর্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে রূপে রূপে প্রতিরূপ হয়েছেন। এখানে রূপের symbol দিয়ে তত্ত্ব বোঝানো হচ্ছে। তাছাড়া প্রকৃতির বৈচিত্র্য বোঝানো যায় না। সমস্তই আত্মার ক্রিয়া। রূপগ্রহণ করবার ক্ষমতা হিসাবে তার প্রকাশ। তারতম্য থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেকের বোধে প্রতিরূপে একই ভাব ভেসে উঠছে। যেমন একটা বীজ অস্পষ্টভাবে অনুভব করছে যে আমি শুধু বীজ নই, আমার ভিতরে বনস্পতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এটাই অভীপ্সা। খণ্ডিতরূপ পূর্ণ হতে চাইছে। এই পূর্ণরূপ সে বাইরে খুঁজছে। তার আকৃতি তখন তাকে ছাপিয়ে উঠবে।

১০।। একই ধরনের শ্লোক। প্রথম অগ্নি, তারপরে বায়ু। অগ্নি, বায়ু ও সূর্য—সবটাই সেই আত্মারই শক্তি।

১১।। সূর্যচৈতন্যকে transcendent-এ রাখা হয়েছে। এটা তার নির্লিপ্ততা বোঝাচ্ছে। আলো সমস্তকে সৃষ্টি করে রূপান্তর ঘটাচ্ছে। আলোর একটা ধর্ম হচ্ছে

photosynthesis। সমস্ত জগৎ একটা আলোর ছটা। সে শুধু প্রকাশ করছে না, সে উপাদানও। অথচ সে নির্লিপ্ত।

সর্বলোকস্য চক্ষুঃ—সমস্ত লোক সূর্যকে দিয়ে দেখছে তা নয়। চক্ষু হচ্ছে দৃক্‌শক্তি, সাক্ষী। তিনি সর্বলোকের দ্রষ্টা। এইরকম ভাব কেনোপনিষদেও আছে। চক্ষু দিয়ে দ্রষ্টা দর্শন এবং দৃশ্য—এই তিনকে এক করা হয়েছে। সূর্য চক্ষু হয়ে সব লোককে দেখছে। তদ্‌ বিষ্ণোঃ পরম্‌ পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। সূর্যের দর্শন আমাদের চক্ষুদোষ দ্বারা লিপ্ত হয় না। আমরা সত্যকে খাটো করে, খণ্ড করে দেখি। তিনি দেখছেন সম্পূর্ণরূপে।

সর্বত্র ভগবৎ দর্শনের পিছনে এইভাব রয়েছে। আমাদের দৃষ্টি ভগবৎ স্বরূপকে পূর্ণরূপে দেখতে পারছে না। ভগবানের চোখে সবাই সমান। কিন্তু ভগবানকে সবাই সমানভাবে দেখে না। **লোকদুঃখেন**—জগতের দুঃখ থাকতে পারে, অবিদ্যাজনিত দুঃখ। তাকে সে জানছে না। সূর্য অবর্ণ হয়েও সবাইকে দেখছেন কিন্তু যাদের দেখছেন তারা সূর্যকে সেভাবে দেখছে না। কেউ বিচিত্ররূপে দেখছে, কেউ তার শুভ্ররূপকে দেখছে, কেউ তার অবর্ণ-রূপকে দেখছে—কেউ তিনটিকেই দেখছে। যে তিনটিকে দেখছে তার চক্ষু আর সূর্যের চক্ষু এক হয়ে যাচ্ছে। দর্শনদোষ আমাদের, তাঁর নয়। চিৎরূপ যখন আবিষ্ট হচ্ছে তখন চৈতন্য সমস্ত আধারকেই আবিষ্ট করছে। কিন্তু আমরা তাকে গ্রহণ করতে পারি না, এটাই খণ্ড দর্শন। আর তাঁর হল অখণ্ড দর্শন।

১২।। ১২-১৫ এই শেষের মন্ত্রগুলিতে ভাবনার স্তরগুলি বলা হয়েছে। ব্যক্তিতে তিনি যেভাবে প্রকাশিত হন, কামং কামং পুরুষং নির্মিমাণঃ—তারপরে সমস্ত বিশ্বে তার অভিব্যক্তি কিভাবে হচ্ছে সেটা বলা হল। তারপরে এখন এই দুটি ভাবকে মিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। জীবন্মুক্তির অভিব্যক্তি কী রকম হয়, জীবনে এবং বিশ্বে তাঁকে কীভাবে পাচ্ছি—সেটা দেখানো হচ্ছে। ঈশোপনিষদে আছে তিনি সমস্ত কিছুর অন্তরে এবং বাহিরে। বিশ্বরূপে তাঁর অভিব্যক্তি আর আমার মাঝে তাঁয় অবস্থিতি, আবেশ—দুটোই যুগপৎ। তিনি আত্মস্থ আমার মাঝে, অথচ তিনি বিশ্বব্যাপক। আবার তিনি বিশ্বোত্তীর্ণ। **একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা** immanent ভাবে। তিনি এক অথচ সর্বভূতে আছেন। তিনি বশী—তাঁর ঈশনার দ্বারা সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। এখানে যাঁকে বশী বলা হয়েছে তাঁকে অন্য জায়গাতে অন্তর্যামী বলা হয়েছে, পৃথিবীর অন্তরে থেকে তিনি পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। পৃথিবীকে তিনি জানেন—কিন্তু পৃথিবী তাঁকে জানে না। এমনি করে সবাইকে যিনি চালিয়ে যাচ্ছেন—তিনি বশী। ঋগ্বেদে বশীর কথা আছে অঘমর্ষণসূক্তে (১০।১৯০।২)। **একং রূপং**—একই রূপ তাঁর। তাকে তিনি বিচিত্ররূপে অভিব্যক্ত করছেন। সমস্তরূপের পূর্বে একরূপ আছে, এটা আমাদের অনুভূতিতেও আসে। যখন কোনো artist মূর্তির কল্পনা করে তখন আস্তে আস্তে বাইরের suggestionগুলি চলে যায়। ভিতর থেকে আর একটা মূর্তি দেখা যায়, মূর্তির ক্রমবিকাশ দেখা যায়। অবশেষে একটা শাশ্বত মূর্তিকে পাওয়া যায়। তখন যা থাকে সেটা একরূপ—তখন রূপ ও অরূপের সন্ধিস্থলে উত্তীর্ণ হই। এই একরূপকে যখন ছাড়িয়ে উঠব—তখন থাকবে অরূপ। রূপ ও অরূপের মাঝখানে আছে অপরূপ। সেটাই একরূপ। Jung তাঁর Animus-Animur theoryতে এই কথা অন্যভাবে বলেছেন। প্রত্যেকের মাঝে— প্রত্যেক নরনারীর মাঝে একটা আকর্ষণ অন্যোন্যের জন্য থাকে। সেটা যখন ভাবরূপে ফোটে,

তখন ব্যাকুলতা দেখা দেয়। বাইরে যে রূপ সেখানে তাকে পরিপূর্ণভাবে পায় না, তাই আভাসে মুগ্ধ হয়। এটা যেন রূপকথার রাজপুত্র এবং রাজকন্যার অন্যোন্যকে খুঁজে বেড়ানো। ঠিক এইরকম আমাদের লৌকিক চেতনাতেও ঘটে। এই রূপাভিসার অধ্যাত্মজগতেও সত্য। ইষ্টের যেরূপ বাইরে অবলম্বন করি, তাতে যত ভাব জাগাতে পারি, তত ইষ্টরূপ বদলে যেতে থাকে। বৈষ্ণবরা যাকে বলেন অন্তশ্চিন্তিত স্বাভীষ্ট রূপ। বৈষ্ণবরা নিজেদের প্রকৃতিরূপ মনে করেন। তখন ইষ্টের সঙ্গে সঙ্গে নিজের রূপও যেন বদলাতে থাকে। প্রথম অনুভব হয়, আমার অন্তরের ভাব সম্পূর্ণরূপে ফোটেনি, অথচ তার একটা আভাস পেয়েছি। সে আভাস ভাবের সাধনায় ক্রমে উজ্জ্বল থাকে। শেষে পরমা প্রকৃতি রাধা ভিতরে জাগেন, আর তার চোখে ইষ্টের রূপ নতুনভাবে জাগে। তখন বাইরে যাকে অবলম্বন করেছিলাম সে আর থাকে না। এটা যেমন ইষ্ট সম্বন্ধে হয়, তেমনি যারা গুরুকে ইষ্ট মনে করে, তাদের বেলাতেও। তারা নিজেদের ভিতরের স্বাভীষ্টরূপ পরিণত হয়, নিজের রূপ আর গুরুর রূপ মিলে যায়। অবশেষে যেটা শাশ্বতরূপ সেটা অপরূপ হয়। পরে সে অরূপ হয়ে যায়। নিজে যে একই রূপ—সে জগতে হয় বহুরূপ। অরূপ থেকে অনেক রূপ হয়—তা বলা হয়নি। অরূপ থেকে প্রথমে একটি—তারই এ বৈচিত্র্য। যে কোনো দেবমূর্তির একটি শাশ্বত ভঙ্গী রয়েছে concrete universal রূপ রয়েছে। ওটা ভাবের গাঢ়তায় পাওয়া যায়। শিল্পী যখন মূর্তি গড়ে, যত গাঢ়ভাবে যেতে পারে তত সে অপরূপকে দেখতে পায়।

তিনি **সর্বভূতান্তরাত্মা**, তিনি বশী আর তিনি একরূপ, অপরূপ, তাঁর থেকে বিচিত্ররূপকে প্রকট করছেন। এই যে তাঁর রূপের বিশ্বলীলা, তাকে অন্তরে অনুভব করছি। যিনি আমার আত্মস্থ, তিনিই বিশ্বে নিজেকে অভিব্যক্ত করছেন। আমরা অন্তরে তাকে বিন্দুরূপে অথবা পরিধিরূপে ভাবনা করতে পারি। যখন বিন্দুরূপে ভাবনা করি তখন তাতে একজনের স্থান হয়, অপরূপের স্থান হয়। এ ধারাটা ভক্তের। হৃদয়াসনে তাঁকে পাচ্ছি যিনি অপরূপ। এই একরকম আত্মস্থভাব। তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বিশ্বের সর্বত্র দেখছি। তখন আমাদের আত্মচেতনা বিশ্বব্যাপী। এটাই আত্মার পরিধিরূপ। দুটোকে মিলিয়ে যখন দেখছি তখন তাঁকে দেখছি চোখ বুজে হৃদয়ে, আবার চোখ মেলে বাইরে। আবার বাইরে যা দেখছি—সমস্তকে গুটিয়ে অন্তরে সে অপরূপকে দেখছি। এইরকম দুটো ভাব একসঙ্গে মিলে যেতে পারে। যখন দুটো মিলে যায় তখন ভাবলোকের উন্মেষ হয়। এটা সেই রাসচক্র। রাসচক্রের মাঝে যে মিথুনের লীলা তাতে প্রত্যেক মিথুনের একটা পূর্ণতা। জাগতিক মিথুনে এই পূর্ণতা আমরা দেখতে পাই না। যদি রাসচক্রের দৃষ্টি খুলে যায় তখন সে অনাদি মিথুনকে আমরা সান্ত মিথুনেও অনুভব করতে পারি। যেমন আমার অন্তরে তেমনি সবার ভিতরে তিনিই রয়েছেন। এইসবগুলি তাঁরই রূপোল্লাস। একরূপ—সে বহুধা হয়েছে। এই রূপদর্শনে জাগে সুখ। সেই সুখ শাশ্বত। এমনি করে আত্মস্থ হয়ে তাঁকে সর্বভূতের অন্তর্যামীরূপে যে দর্শন করে, তার সুখের শেষ থাকে না। সুখের থাকে না ওর, **তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্**।

১৩।। আগের শ্লোকে রূপসৃষ্টির দিক দেখানো হয়েছে। এখানে যেভাবে কামনার জগৎ গড়া হয়েছে, অথচ তার গভীরে তিনি নিত্য হয়ে রয়েছেন—সেই দিক দেখানো হচ্ছে। এই ভাবনার ফল আগেরটি থেকে ভিন্ন। আগে বলা হয়েছে শাশ্বত সুখ। এখানে

বলা হচ্ছে শাশ্বত শান্তি।

প্রথমে বলা হয়েছে তিনি **নিত্যঃ নিত্যানাম্ চেতনঃ চেতনানাম্**। অনেকে নিত্যোঽনিত্যানাং এভাবে বিভক্ত করে। তাদের বক্তব্য এই যে জগতের যা কিছু তা অনিত্য। তার ভিতরে তিনি নিত্যরূপে রয়েছেন। আমরা নিত্যো নিত্যানাং ভাবেও নিতে পারি, কেন না চেতনঃ চেতনানাং রয়েছে। ব্যাখ্যা দুভাবেই করা যেতে পারে। দুই-ই জগতের constituents। তাই পর্যায়ক্রমে দুটো ব্যাখ্যাই পেতে পারি। আগে অনিত্য ধরেই ব্যাখ্যা করা যাক। জগতের যা বিষয়, তা সব অনিত্য passing। একে একে অনিত্য হয়ে ফুটল অচেতন। আর তাকে আধার করে ফুটল চেতন। অনিত্য উপাদান—তাতে অচেতনার জগৎ—mechanical creation। তাতে ফুটল চৈতন্য। যদি বলি 'নিত্যো নিত্যানাং' তখন ব্যাখ্যা হবে ন্যায়দর্শনের অনুগত। তাতে পরমাণুবাদের কথা আছে। বলা হয়, যেমন আত্মা নিত্য তেমনি পরমাণুরাও নিত্য। এ ব্যাখ্যা বিশেষ সঙ্গত মনে হয়। ন্যায়ে যাকে পরমাণু বলেছে—উপনিষদে তাকে ইদম্ বলা হয়েছে। 'আত্মা' আর 'ইদম্' দুটোর একটা মিথুন। যাকে ইদম্ বলছি, বিশ্বের উপাদান এবং তার অভিব্যক্তি, সে বস্তুও নিত্য। আত্মা ও ইদমের মিথুন,—চিৎ ও জড়ের মিথুন। চিৎ নিত্য, জড়ও নিত্য।

আর একটা ব্যাখ্যা আছে—চিৎ আর শক্তি। চিৎ যেমন নিত্য, শক্তিও তেমন নিত্য। শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। শক্তির চরম প্রকাশজড়ত্বে। ন্যায়দর্শন বলছে, জড় পরমাণুগুলি নিত্য। মহাপ্রলয়ে যেমন চৈতন্য থাকবে, তেমনি জড় পরমাণুও থাকবে। যেমনি চৈতন্য থাকবে তেমনি শক্তিও থাকবে। শক্তির নিত্যতাকে বেদান্তে প্রবাহনিত্যতা বলা হয়েছে। যা আমাদের দৃষ্টিতে ক্ষণিক, কালের মাঝে অভিব্যক্তিতে যে ক্ষণিক, তার অন্তর্গূঢ় সত্তা কিন্তু শাশ্বত। এটাই সাংখ্যে অব্যক্ত-হতে-অভিব্যক্তি-বাদরূপে দাঁড়িয়েছে। সাংখ্যদৃষ্টিতে সমস্ত বস্তু সৎ। যখন দেখি, সে থাকছে না তখন আমাদের কাছে থাকছে না, আমাদের চেতনায় থাকছে না, কিন্তু তার সত্তার লোপ হয় না। যা আছে তা আছেই। কোথাও না কোথাও সে আছে। তবে সে আসে যায়। যেখানে সে মিলিয়ে যায় সেটা অব্যক্ত। সেখানে রূপ হারিয়ে যায় কিন্তু শক্তিরূপে সম্ভাব্যরূপে সে থাকে। অতএব সৎ থেকে সৎ। মীমাংসাদর্শনেও এইরকম মতবাদ আছে। তাঁরা বলেন আমাদের যে কোনো অভিজ্ঞতা সত্য। যখন ভুল দেখছি, তখনও সে সত্য। যখন আবার ভুল ভাঙছে শুধরাচ্ছে তখন সেটাও সত্য। এই দর্শনটা উপনিষদের spirit এর (ভাবধারার) অনুকূল। এক নিত্য চেতন পদার্থ ছাড়া কিছুই নেই। যখন অনিত্য মনে করি, সেটা নিত্যচেতনার একটা ভঙ্গী। সেও নিত্য, সেও চেতন। তবে যিনি মূলে, তিনি নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন। এটা তাঁর বিশ্বোত্তীর্ণ রূপ। সমস্ত বিশ্ব নিত্য চৈতন্যস্বরূপ। যা কিছু আছে, তার গভীরে পাই নিত্যস্বরূপ। সেখান থেকে কামনা উৎপন্ন হচ্ছে। তিনি কামনার বিধান করছেন। এটা তাঁর বিসৃষ্টির উল্লাস। তাঁর কামনা একদিকে রূপসৃষ্টির আবেগ, আর একদিকে রূপসংহরণের আবেগ। ঋগ্বেদে এই কথা আছে। তন্ত্রে এটাকে আরও পরিষ্কার করা হয়েছে। সমস্ত সৃষ্টির ব্যাপার একদিকে তাঁর উন্মেষ, আর একদিকে তাঁর নিমেষ। একবার প্রসার একবার সঙ্কোচ। হৃৎস্পন্দনের মতো। এটাই তাঁর কামনা। এই কামনার স্ফূরণ দেখতে পাই আমাদের প্রত্যেকের আধারে। আমরা একসময়ে বাইরে কিছু চাইছি, তখন ভাবকে বস্তুরূপে অভিব্যক্ত করছি। আবার সে বস্তু থেকে তাকে ভাবরূপে আহরণ করে অন্তরে

তাকে লয় করছি। এই লীলা সবকিছুতে, বহুতে, সমস্তে অভিব্যক্ত হচ্ছে। এটা তাঁর কামনার বিধান। অন্যত্র বলা হয়েছে তার অর্থের বা বস্তুর, বিষয়ের বিধান (ঈশ-৮)। এখানে কামনা, সেখানে কাম্য বস্তু। তাঁর কামনা একটা শক্তিস্পন্দন। তাতে সৃষ্টি আর প্রলয় হয়। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির দোলা। এই দোলার ওপারে শাশ্বতী শান্তি। আগের মন্ত্রে রূপোল্লাসের কথা। এখানে রূপোল্লাস থেকে অরূপে যাবার সঙ্কেত রয়েছে। এইভাবে তাঁকে অনুভব করতে হবে। তিনি যখন আত্মস্থ—তখন অন্তর্জগতে একদিকে নিত্য চেতন, আর একদিকে কামনায় স্পন্দিত। আবার সমস্ত কামনা লয় হচ্ছে সেই নিত্য চৈতন্যে। সমস্ত বিশ্বও তাই। এই দুটি ভাবকে যদি যুগপৎ ধারণ করতে পারি তাহলে এই কামনার স্পন্দনের উর্ধ্বে নিস্পন্দ শান্ত অবস্থার অনুভব আমরা পাই। দুটোকে যদি মিলিয়ে নিই তখন অনুভব এইরকম দাঁড়ায়—একটা অমেয় প্রসন্নতার ভূমিকায় শাশ্বত সুখের উল্লাস—প্রশান্ত মহাসমুদ্রের বুকটা সামান্য একটু আন্দোলিত হচ্ছে। 'হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্যশ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ' (কুমারসম্ভব) এটাই জীবন্মুক্তের সম্ভোগ।

১৪।। এখানে যম যেন আত্মস্থ হয়ে কথা বলছেন। কেউ কেউ মনে করেন, এটা যম নচিকেতা উভয়ের উক্তি। কিন্তু তা মনে হয় না। উপনিষদের গোড়াতে এই কথা বলা হয়েছিল—আশ্চর্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা। আশ্চর্যোজ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ। এই তত্ত্ব এমন অনির্বচনীয় যে বক্তা কখনো কখনো আশ্চর্য হয়ে যায়, স্তব্ধ হয়ে যায়। অনির্বচনীয়কে যেন বলতে পারছে না। যমের এখানে এই অবস্থা। সে যেন বলছে—এই যে বর্ণনা করলাম, রূপোল্লাস আর কামনার উর্ধ্বে যে শাশ্বত শান্তি—তার বর্ণনা করা যায় না। তাই তিনি **অনির্দেশ্যং পরমং সুখং**। তিনি শূন্যতা, তিনি রিক্ততা, তিনি মৃত্যু তিনিই পরম সুখ। এই উপনিষদে অন্যত্র বলা হয়েছে, আকাশের বুকে তিনি প্রাণের স্পন্দন। এক পরম শূন্যতা, সে সপ্রাণ। নিগূঢ় স্পন্দন তাতে রয়েছে। সে নিগূঢ় স্পন্দন কাঁপতে কাঁপতে এই বিচিত্র জগৎরূপে বেরিয়ে এসেছে। এই তার অনির্দেশ্য পরমসুখরূপ। যখন তার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করান, তাকে মনে হয়—'তদ্ এতৎ' যিনি তদ্, indescribable, তিনিই এতদ্। তারপরে এই ভাবকে গাঢ় হতে গাঢ়তর করে যম বলছে—কিভাবে তাকে বলব? সে কি আছে না নেই? সে ভাতি না বিভাতি?

কে বলতে পারে? **কথং নু তদ্ বিজানীয়াম্**। কেমন করে জানব?—**কিমু ভাতি বিভাতিবা**। একটা ভাতি— তার চরম ভাতি। সে অনির্দেশ্য, অব্যক্তরূপে তার প্রকাশ হয়। অব্যক্ত জ্যোতি সে ভাতি, আর ব্যক্ত জ্যোতি সে বিভাতি। বেদের ভাষায়—বারুণী রাত্রি আর মৈত্রম্ অহঃ। বারুণী রাত্রি অব্যক্ত আলো আর মিত্রের দিন সে আলোর অভিব্যক্তি। কি করে বলব তিনি অন্ধকার না আলো। বৌদ্ধ দর্শনে আমরা পাই, নির্বাণের উপান্তে উঠে চেতনা বলছে, নৈব সংজ্ঞা নৈব অসংজ্ঞা। একদিকে সবকিছু আছে, আর একদিকে কিছুই নেই। একটা দ্বিধা ভাব যেন থাকে। ঋগ্বেদে নাসদীয় সূক্তে এই ভাব পাওয়া যায়। সমস্ত যেন একটা অব্যক্তের রহস্য। তার সমাধান কারুর কাছেই হয়নি। সোঽঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ। তিনি কি জেনেছেন? অথবা তিনিও হয়তো জানেন না। বুদ্ধির যেখানে পরাভব ঘটে। সে বলে জানি না। আবার বোধ জাগে, তখন মনে হয় জানি। কী জানি, সেটা কিন্তু বলতে পারি না। কেনোপোনিষদে এই রকম উক্তি রয়েছে। এর সমাধান শেষ শ্লোকে দিচ্ছেন।

১৫।। যেখানে গিয়ে আমরা পৌছব সেখানে সূর্য আলো দেয় না, চন্দ্র তারা আলো দেয় না, বিদ্যুৎ আলো দেয় না—আগুন কোথা থেকে আলো দেবে? অথচ একটা আলো রয়েছে—যার আলোতে সবাই অনুভাত হচ্ছে, সবই আলোকিত হচ্ছে। এটাই নচিকেতার প্রশ্নের শেষ উত্তর।

পাঁচটি আলোর কথা বলা হয়েছে। বৈদিক ঋষিদের ভাবনা অনুসারে পরপর তাদের এভাবে সাজানো যায়—অগ্নি ভূলোকে, অন্তরিক্ষলোকে বিদ্যুৎ, তারপরে দ্যুলোকে সূর্য, তারই উজানে স্বর্লোকে চাঁদের আলো। তার ওপারে নক্ষত্রের আলো। শেষে আর কিছুই নেই। অগ্নি আলো অর্থাৎ পার্থিব চেতনা—অরণি মন্থন করে যে আগুন পাই। বিদ্যুতের আলো প্রাণচেতনা—সেখানে বৃত্রাঘাতের পর্ব আসে। মেঘকে বিদীর্ণ করবার সময় বিদ্যুৎ চমকায়। আগে বিদ্যুতের ঝলক—তারপরে মেঘের গর্জন। তারপরে প্রসাদের ধারা আমাদের উপর ঝরে পড়ে। বিদ্যুতের আলো হচ্ছে—flash of intuition। অগ্নিমন্থনে self-effort রয়েছে। উপনিষদে বলেছে বলক্রিয়া। অন্তরিক্ষলোকে পরমতত্ত্ব ঝলসে ওঠে, flash করে। আয়াস রয়েছে, কিন্তু জ্ঞান flash করে। কেনোপনিষদে আছে, বিদ্যুতো বদুতদ্ আ ন্যমীমিষদ্ আ। যেমন বিদ্যুৎ ঝলক দিয়ে উঠল—তারপরে নিমীলিত হল, চোখ বুজল, তেমনি অভীপ্সা যখন প্রাণ ভূমিতে উত্তীর্ণ হয়, তখন যেটা পাই সেটা flash এর মতন, ঝলকের মতন পাই, তখনই সে হারিয়ে যায়। তখন তাকে আবার পাবার জন্য খোঁজাখুঁজি চলে। এই জিনিসটা মরমিয়ারা mystics-রা প্রায়ই অনুভব করেন। ভাগবতেও আছে, রাত্রির যে জ্যোতি তাতে অন্ধকার বাধিত হল। রাত্রির অন্ধকার সেই এখানে আলো। দিনের আলো সে অন্ধকার। রাত্রির আলো অব্যক্ত আলো, সত্য আলো। দিনের আলো তার ছায়ামাত্র।

একটা পরম শূন্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হল। যে অব্যক্ত জ্যোতি, শূন্যতা থেকে জগৎটাকে দেখলাম, এটাই বৌদ্ধ দর্শন। শঙ্করাচার্য যেটাকে দেখেছেন, সেটা এই ব্যক্ত অংশটুকু। তার ওপারে অসৎ। অসত্যের কথা শুধু বৌদ্ধেরা বলেছে তা নয়। উপনিষদেও অসত্যের কথা আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, যারা অসৎ বলে তারা অসৎ হয়। Negative experience অসত্যের অনুভবকে যদি ভিত্তি করি, আর positive experience-কে তার অভিব্যক্তি মনে করি তাহলে পূর্ণ দেখা হয়। মৃত্যুকে ভয় করলে চলবে না—এটাই জীবনের উৎস। পরম শূন্যতা থেকে পূর্ণতা উপচে পড়ছে। উপনিষদে যখন বলা হয় 'তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথাঃ' তার অর্থ এই যে যদি মূলে শূন্য থাকে তখনই এখানকার পূর্ণতাকে সম্ভোগ করতে পারি। অবিদ্যা দিয়ে যদি মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারি—তাহলে বিদ্যা দিয়ে অমৃতের উপভোগ করতে পারি। তখন দেখি মৃত্যু থেকে জীবন উৎসারিত হচ্ছে।

নচিকেতার 'প্রেতে বিচিকিৎসা' প্রশ্নের উত্তর যম এই দিচ্ছে যে একদিকে কিছুই থাকে না, আর থাকে না বলেই সব থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয়বল্লী সমাপ্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়
তৃতীয় বল্লী

১।। ব্রহ্মকে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে অশ্বত্থবৃক্ষরূপে। তিনটি কল্পনা আছে—ব্রহ্মবৃক্ষ, সংসারবৃক্ষ, দেহবৃক্ষ—আমরা যে যেভাবে দেখি—Transcendental, Universal, Individual।

এই বৃক্ষের রকমারি আছে। বৈদিক কল্পনায় আছে অশ্বত্থবৃক্ষ। প্রাচীনকালে কোথাও কোথাও ডুমুরগাছের কল্পনা আছে, উদুম্বরবৃক্ষ। এই গাছটিকে বলা হয়েছে বারুণ বৃক্ষ, বরুণের গাছ। বৌদ্ধেরা এটাকে বোধিবৃক্ষ বলতেন। সে গাছটা হচ্ছে ন্যগ্রোধ (তু, নৈচাশাখ ঋ ৩।৫৩।১৪) বটগাছ, যার ঝুরি নামে। একটা গাছ থেকে অনেক গাছ হয়েছে, শেষে জঙ্গল হয়েছে। সেই বোধিবৃক্ষকে ব্রহ্মবৃক্ষ বলা যায়। ভাগবতেও বৃক্ষের কল্পনা আছে, সে বৃক্ষ কদম্ববৃক্ষ। অথর্ববেদে একটা শিশু গাছের কথা আছে, শিংশপা। এসব একই জিনিষ, অশ্বত্থ, বট, ডুমুর, শিশু আর কদম। গীতাতে এই অশ্বত্থকেই সংসারবৃক্ষরূপে বর্ণনা করা হয়েছে আর দেহবৃক্ষের বর্ণনা বৌদ্ধতত্ত্বে পাই। মহাযান বৌদ্ধদের শাস্ত্রে অনেক জায়গায় এর বর্ণনা আছে। সমস্ত বর্ণনাতেই একটি কথা লক্ষণীয় যে গাছটি ওলটানো রয়েছে। **উর্ধ্বমূল, অবাক্‌শাখ**। মূল তার উপরের দিকে আর ডালপালা ছড়িয়ে রয়েছে নিচের দিকে। সমস্ত গাছের ছবিটা হবে, নিচের দিকে শাখাপ্রশাখার বিস্তার, তেমনি উপরের দিকে অনেক মূল, উপমূলের বিস্তার। গাছের কাণ্ডটা ঠিক মাঝখানে, মুঠোর মাঝে ধরবার মতো। নিচের দিকে যে বিস্তার আর উপরের দিকে যে বিস্তার দুটোই স্বরূপতঃ এক। উপরের দিকে যে বিস্তার সেটা চৈতন্যে আর নিচের দিকে সেটা জড়ে। কিন্তু চিৎ-জড়ে কোনো তফাৎ নেই। উপরের প্রতিবিম্বই নিচে পড়েছে, এইভাবে জানতে হবে। এই কথা আগেই বলা হয়েছে। যা এখানে তা ওখানে, যা ওখানে তা এখানে। যা বিশ্বোত্তীর্ণ, তাই বিশ্বাত্মক। এই বিশ্বাত্মক শাশ্বতের মাঝে বিশ্বোত্তীর্ণের আবেশ রয়েছে। যখন এটাকে দেহবৃক্ষরূপে দেখছি তখন লক্ষ করতে হবে স্নায়ুতন্ত্রকে nervous system-কে। এই বৃক্ষের একটা বর্ণনা অন্যরূপেও বেদে আছে। উর্ধ্ববুধ্ন অর্বাক্‌বিল। বুধ্ন কথাটা শ্লিষ্ট—একসঙ্গে দুটো অর্থ বহন করছে। মৌলিক অর্থ হচ্ছে বোধ। একই ধাতু থেকে এসেছে বুধ্ন। যেমন √যত্ ধাতু থেকে যত্ন, √প্রচ্ছ্ ধাতু থেকে প্রশ্ন। তেমনি √বুধ্ ধাতু থেকে বুধ্ন, বোধ। আবার বুধ্ন বলা হয় একটা কিছুর তলাটাকে। যেমন হাঁড়ির তলাটা হল বুধ্ন। European-রা মনে করেন fundus কথাটা আর এই বুধ্ন কথাটা এক। এই fundus থেকে fundamental। আধারকে বলা হয়েছে উর্ধ্ববুধ্ন—তার তলার দিকটা উপরে। ফাঁকা শূন্য হাঁড়িকে উল্টে দিলে যেমন হয়। সবটাই

আমাদের এই মাথার বর্ণনা। মাথাটা যেন একটা হাঁড়ি উল্টে রাখা হয়েছে। তার তলা যেটাকে উল্টে দেওয়া হয়েছে সেখানেই সমস্ত বোধশক্তি রয়েছে। Brain থেকে উপরের দিকে, আর নিচের দিকে সেই ছিদ্রগুলি রয়েছে যাদের অন্যত্র 'সুষির' বলা হয়েছে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার। উপরে যে বোধ রয়েছে হাঁড়ির তলাতে, সেই বোধই ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়ে বিকীর্ণ হয়। এই বর্ণনা পরে আমরা উপনিষদে অন্যত্রও পাই—যখন না কি সপ্তদ্বারের কথা বলা হয়েছে কিংবা সপ্তর্ষি অগ্নির কথা বলা হয়েছে। সমস্তটাই হচ্ছে মাথাটা কেটে নিলে পর গলাশুদ্ধ মাথাটার যে চেহারা হয় তারই বর্ণনা। সাতটা ইন্দ্রিয়দ্বার হল দুটি চোখ, দুটি কান দুটি নাক আর মুখ। এর থেকেই ব্রহ্মের দ্বারপালের কথা হয়েছে। দুটি চোখ দিয়ে তাঁকে দেখতে পারি, দুটি কান দিয়ে তাঁকে শুনতে পারি, সূক্ষ্ম প্রাণ দিয়ে তাঁকে অনুভব করতে পারি। বাক্ দিয়ে তাঁকে পাই। এটা হল সপ্তাগ্নি। কোথাও কোথাও অগ্নির সপ্ত জিহ্বা। সমস্তের মূলটা রয়েছে আমাদের মস্তিষ্কে। এটা হল হাঁড়িটা উল্টে রাখা। এই হাঁড়ির ছবিটা খুব সুন্দর দেখা যায় পুরীতে সমুদ্রতীরে। যখন সূর্যোদয় হয়, তখন সেটা ঠিক সেই উল্টানো হাঁড়ির আকার ধারণ করে আর তার সেই উপরের অংশটা, যেটা বুধ্ন তার উপর সূর্যের আভা পড়ে অদ্ভুত একটা শুভ্রবর্ণ নেয়, ঝকঝক করতে থাকে। এই থেকে উপমা নেওয়া হয়েছে কিনা জানিনা, তবে দেখলে ঠিক সেই 'ঊর্ধ্ব-বুধ্ন-অর্বাক্-বিল'-এর কথাটা মনে পড়ে। কথাটার ইঙ্গিত ঋগ্বেদেও রয়েছে। চেতনার একটা মূল রয়েছে। সেই মূল চেতনা থেকে ক্ষরবৃত্তিগুলি নিচের দিকে নেমেছে। উপরের যে চেতনা সেটা অক্ষর, সেটা ক্ষরিত হয় না। তবে আমাদের এই গলাকাটা অবস্থাটা অক্ষর এবং ক্ষরের সমাবেশ। মনে হয় এইটাই সেই মূল কল্পনা। তার কল্পনাটা দাঁড়াল, যে সমস্ত কন্দমূল গাছ রয়েছে bulbous—তাকে উল্টে দিলে যেমন হয়। আমাদের nervous system-এর চেহারাটাও ঠিক তেমনি। Brain একটা bulb বা গুটির মতো। সেই গুটি থেকেই নেমে এসেছে central nervous system, সুষুম্নাতনন্তু আর তার থেকে বেরিয়ে এসেছে অন্যান্য সমস্ত নাড়ির জাল। এটাকে জালই বলা হতো, যার থেকে যোগীরা 'জালন্ধর' শব্দটাকে বের করেছেন। এই সমস্ত জালটাকে ধরে রেখেছে উপরের সেই bulb.

এটাকে অশ্বত্থরূপেও আমরা কল্পনা করতে পারি, যদি ধরি সেই bulb-এর কতকগুলি মূল চলে গিয়েছে উপরের দিকে। এইভাবে সমস্ত দেহটাকে বৃক্ষরূপে কল্পনা করা বৌদ্ধ যোগশাস্ত্রেও অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। একটা মানুষ দাঁড়িয়ে থাকলে পর তার হাত-পা শাখার মতো নিচের দিকে নেমে আসছে, আর মূলটা হয়েছে মাথা, এরকম কল্পনাও আসে। এই বৃক্ষ সম্বন্ধে কল্পনা বেদ থেকে আরম্ভ করে পুরাণের যুগ পর্যন্ত শাস্ত্রে ছড়িয়ে আছে নানাভাবে। এখানে গাছটাকে বলা হয়েছে অশ্বত্থ গাছ। গীতাতে আছে, গাছের মাঝে আমি অশ্বত্থ। অশ্বত্থটাকে সব গাছের সেরা বলা হয়েছে কেন, তা ঠিক বোঝা যায় না; খুব সম্ভবত অশ্বত্থ বিরাট গাছ বলে। বৌদ্ধেরা কিন্তু অশ্বত্থকে না নিয়ে বটের কল্পনা নিয়েছেন। যদিও এখন দেখি বোধিবৃক্ষ যেটা সেটা বটগাছ নয়, সেটা অশ্বত্থ গাছ। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রে সেটাকে বলা হয়েছে ন্যগ্রোধ। 'ন্যগ্রোধ' পদের অর্থ 'ন্যক্' নিচের দিকে যার 'রোধ' শাখা-প্রশাখাগুলি বিস্তৃত। ন্যগ্রোধের কল্পনাটা আবার ঋগ্বেদেও আছে, সেখানে কতকটা এই নাড়ীতন্ত্রের আভাসগুলি পাওয়া যায়। সাংখ্যে বলা হয়েছে

নীচীন-শাখ, যার শাখাগুলি নিচের দিকে। শাখা বলতে বটগাছের এই ঝুরিগুলি। এখন বটের কল্পনা আমরা ছেড়ে দিলাম। অশ্বত্থের কথা বলা হচ্ছে। অশ্বত্থকে ব্যাখ্যা করা হয়, যেমন গীতাতে বলা হয়, সংসারবৃক্ষই অশ্বত্থ। অশ্বত্থ কে? যা নাকি আগামীকাল পর্যন্ত থাকবে না। অ-শ্ব-ত্থ, সেই অশ্বত্থ। এ ব্যাখ্যাটা ঠিক না। আসলে শব্দটা এসেছে অশ্ব-ত্থ থেকে। যেমন আর একটা শব্দ রয়েছে, অশ্বত্থামা। যা নাকি অশ্বে স্থিত—তাই অশ্বত্থ। অশ্বকে ঋগ্বেদে বলা হয়েছে ওজঃশক্তি, ইন্দ্রশক্তি। ওজঃশক্তি হচ্ছে যেকানে প্রাণ আর চেতনার সমন্বয় ঘটেছে সেই শক্তি। আমাদের দেহের মাঝে সূক্ষ্ম প্রাণশক্তিই হচ্ছে ওজঃশক্তি—অধ্যাত্মদৃষ্টিতে। আমরা দুটি পশুর দেখা পাই বেদে। একটি অশ্ব আর একটি গো। গো হল জ্যোতি। অশ্ব হল প্রাণ। একটি যে পরম অশ্ব আছে, তার বর্ণনা ঋগ্বেদে আছে। তাকে বলা হয়েছে দধিক্রাবা। পুরাণে আমরা তাকে পেয়েছি উচ্চৈঃশ্রবারূপে। উচ্চৈঃশ্রবা শব্দের অর্থ হয়, যা নাকি খুব জোরে চিৎকার করছে loud-neighing। কিন্তু প্রকৃত অর্থ তা নয়। শ্রবঃ হচ্ছে শ্রুতি। আকাশের যে স্পন্দন তার জ্ঞান হচ্ছে শ্রবঃ। উচ্চৈঃশ্রবা হচ্ছে যে এই পরমশ্রুতিকে শ্রবণ করে। যেমন উপনিষদের গোড়ায় আমরা পেয়েছিলাম 'বাজশ্রবা'। এরকম 'সত্যশ্রবা'। এরকম 'শ্রব' দিয়ে অনেক শব্দ আছে। এই উচ্চৈঃশ্রবাকে পুরাণে কল্পনা করা হয়েছে ইন্দ্রের বাহনরূপে—ইন্দ্র-শক্তির বাহন যে প্রাণচৈতন্য।

ঋগ্বেদে যেখানে 'দধিক্রাবা' বলা হয়েছে সেখানে বর্ণনা থেকে মনে হয় সেটা sun-horse। অর্থাৎ সূর্যের মাঝে যে প্রাণশক্তি রয়েছে এটি হচ্ছে অশ্ব। একটা দুর্ধর্ষ অশ্বের বর্ণনা রয়েছে বৃদারণ্যক উপনিষদে শুরুতেই। সেখানে বলা হয়েছে, এই অশ্ব সমস্ত ভুবনে ব্যাপ্ত। অর্থাৎ অশ্বের cosmic রূপ। এই যে যজ্ঞ-অশ্ব, তার শির হচ্ছে ঊষা, তারপর সমস্ত দেবতাকে তার সর্বশরীরে সংযোগ করা হয়েছে। তিনটি যজ্ঞের কথা আমরা পাই ঋগ্বেদে, যাদের যজ্ঞের type বলা যেতে পারে। একটা অশ্বমেধ, একটা গোমেধ, একটা পুরুষমেধ। তার মধ্যে অশ্বমেধের বর্ণনাটাই বিস্তৃতরূপে পাওয়া যায়। সবটাই মনে হয় symbolical প্রতীকী। পুরুষমেধের বর্ণনাও আছে। মেধ শব্দের অর্থ হচ্ছে অনুপ্রবিষ্ট, মন্+ধা অর্থাৎ চিত্তকে সমাহিত করা। সমাহিত একাগ্র চিত্তের অনুপ্রবেশ হয় তত্ত্বের মধ্যে। প্রথম আমরা অনুপ্রবেশ করি অশ্বশক্তিতে, প্রাণশক্তিতে। তারপরে গোশক্তিতে, চিৎশক্তিতে। সবার শেষে পুরুষশক্তিতে, ব্রহ্মশক্তিতে। এই পুরুষ থেকেই বেরিয়ে এসেছে গো এবং অশ্ব। ক্ষত্রিয় করবে অশ্বমেধ। ব্রাহ্মণ করবে গোমেধ। আর যিনি ভাগবত তিনি করবেন পুরুষমেধ। সেই যে যজ্ঞ সেটা নারায়ণের যজ্ঞ, শতপথব্রাহ্মণে এটার বর্ণনা আছে।

তাহলে আমরা বলতে পারি বিশ্বপ্রাণ যেটা, সেটা হল অশ্ব, সেই অশ্বে যা নাকি স্থিত সেটা হল অশ্বত্থ। উদ্ভিদকে প্রাণ বলে কল্পনা করা হতো এটা বেদে আছে। যেমন পশু প্রাণ, তেমনি উদ্ভিদও প্রাণ। তাহলে tree worship বৃক্ষপূজা—এটা বস্তুত প্রাণের পূজা। আমরা বৃক্ষপূজা করি নানাভাবে। রবীন্দ্রনাথের বনবাণীতে এর এক ধরনের পরিচয় আছে। যখন ব্রহ্মকে আমরা প্রাণরূপে দেখছি তখন তিনি অশ্বত্থ। একটা চৈতন্যমূল, সেটা সংহত হয়েছে একটা কাণ্ডে। তারপর সেটা সংসাররূপে নানা শাখা উপশাখায় ছড়িয়ে পড়েছে। এই হলেন ব্রহ্মবৃক্ষ বা অশ্বত্থরূপে পুরুষ। এখানে তাঁকে বলা হয়েছে, তিনি সনাতন। সমস্ত লোকগুলি তাঁতেই আশ্রিত। সপ্তলোক তাঁতেই। যদি এই অশ্বত্থকে

দেহ-বৃক্ষরূপে কল্পনা করি তাহলে সপ্তলোক দেহে হবে সপ্তচক্র। কেউ এই অশ্বত্থকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। এটা all-comprehensive। যেমন ঋগ্বেদে বলা হয়েছে 'স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা',—সমস্ত ভূমিকে তিনি আবৃত করে রেখেছেন। তার ওপারে আর কিছু নেই।

এখানে দুটি বিশেষণ দেওয়া হয়েছে এই ব্রহ্মবৃক্ষের। একটি হচ্ছে শুক্র, আর একটি অমৃত। শুক্র অর্থাৎ শুক্ল, শুভ্রজ্যোতি; তিনি চিন্ময় আর অমৃত অর্থাৎ আনন্দ।

২।। তারপরে এই অশ্বত্থের বা ব্রহ্মবৃক্ষেরই বর্ণনা করা হচ্ছে, symbolটাকে ছেড়ে দিয়ে। বলা হচ্ছে এটা প্রাণ। ব্রহ্ম সম্পর্কে দুটি মুখ্যবাদ পাওয়া যায় উপনিষদে—একটি আকাশবাদ, আর একটি প্রাণবাদ। আকাশবাদ যেটা সেটাই পরে develop করেছে নির্গুণ ব্রহ্মবাদে। আর প্রাণবাদ ব্রহ্মশক্তিবাদে বা সগুণব্রহ্মবাদে। আকাশ শিব, প্রাণ শক্তি। কিন্তু দুই-ই এক; শক্তি—শক্তিমানে কোনো ভেদ নেই। যখন আমরা ভেদ করি তখন আমরা পাই শঙ্করের নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ। আর যখন ভেদ করি না তখন রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। অথবা ভেদাভেদবাদ। শঙ্কর দ্বারা প্রভাবিত যে বেদান্ত সেখানে দুটিতে ভেদ করা হয়েছে। আর তন্ত্রে সে দুটিকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওটা হচ্ছে সিদ্ধির কথা। উপনিষদে দুটিকে মেলানোই রয়েছে।

এই যে শুক্র, অমৃত ব্রহ্ম, তিনি প্রাণস্বরূপ। সেই প্রাণে সবকিছু কাঁপছে, **এজতি নিঃসৃতম্**—কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে আসছে।

যে নিস্তরঙ্গ ব্রহ্ম, তারই মাঝে কম্পন উঠছে, স্পন্দন হচ্ছে। এই স্পন্দনটাই প্রাণ। ছান্দোগ্য উপনিষদে এটাকে বলা হয়েছে ব্রহ্মক্ষোভ। তাঁরা একটা উপমা দিয়েছেন—সকালবেলার সূর্য। তার দিকে তাকিয়ে দেখলে দেখবে যে আলো তার মধ্যে টলমল করছে। এটাই সেই আদিত্যের শুক্লভাতি। বলছেন, দৃষ্টিকে যদি আরও গভীর কর, তার পিছনে দেখবে একটা পরঃকৃষ্ণ অন্ধকার। সেই অন্ধকারের বুকে এই শুক্লভাতি টলমল করছে। এটা ব্রহ্মক্ষোভ বা স্পন্দ। আর পিছনের যে অন্ধকার সেটা মহাকাশ মহাশূন্যের বুকে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। আবার সেই তত্ত্ব। একটা ইতি একটা নেতি। আর বলা হয়েছে—সেই হিরণ্ময় পুরুষ যিনি, তিনি ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে রেয়েছেন। তাঁর সম্মুখ দিকটা শুক্লভাতি, আর পিছন দিকটা পরঃকৃষ্ণ অন্ধকার। সেই ভাবটিই পরে পুরাণে কল্পনা করা হয়েছে—বিষ্ণুর নীল শরীর আর তাঁর বুকে কৌস্তুভ জ্বলছে। এটা হচ্ছে সমস্ত জীবাত্মার সমষ্টি। কাজেই এই যে সূর্যের টলমলরূপ আর বিষ্ণুবক্ষে কৌস্তুভ, দুটিই হচ্ছে প্রাণের রূপ। এই প্রাণের ক্ষোভ বা ব্রহ্মক্ষোভ, তার থেকে সমস্ত কিছু বেরিয়ে এসেছে। এটাই **প্রাণে এজতি নিঃসৃতম**। এই তত্ত্বকে যদি জানি, অনুভব করি তাহলে আমরা মহাপ্রাণকে লাভ করব আর মৃত্যুকে অতিক্রম করব। আমরা সব সূর্য থেকে বেরিয়ে এসেছি। সূর্য থেকে আমরা নিজেদের আলাদা মনে করছি, আমাদের বিচ্যুত মনে করছি, এটাই অবিদ্যা। তাঁদের ভাষায় 'অংহস্' চেতনার সংকোচ। যদি নিজেকে বৃহৎ করতে পারি তাহলে সূর্য হয়ে যেতে পারি। যদি ভাবনা দ্বারা এই চেতনাকে সূর্যের মতো ভাস্বর করি, তাহলে যখন দেহটা খসে যাবে তখন আমার চেতনা সূর্যের সঙ্গে মিলে যাবে। আমি থাকতে পারি, মরতে পারি, আবার জন্মাতে পারি। কিন্তু সূর্য চিরকালই রয়েছে। যদি সেই চিরন্তন সূর্যের সঙ্গে আমি এক হয়ে যাই—জীবনে এক হব বোধের দ্বারা, আর মৃত্যুতে

এক হব স্বরূপে, তাহলে—অমর হব। এটাকেই আগে 'শুক্রম্ অমৃতম্' বলা হয়েছে। আর এই যে সূর্য এ প্রাণস্বরূপ। তাহলে আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণকে ছেড়ে সেই মহাপ্রাণকে পাব, এই ভাবনা আমরা বেদের বহু জায়গায় পাই। এই একরকম অমৃতত্বের ভাবনা। আমরা এখন abstract ভাবে ভাবনা করি Immortality-র spiritually বা psychologically। তাঁদের ভাবনা ছিল physical ভাবনা। ঋগ্বেদে আছে ঋষিকা অপালার সূর্যত্বক্ হওয়ার কথা। অর্থাৎ জীবন থাকতেই তাঁর ত্বক্ সূর্যের মতো হয়ে গিয়েছে। যে সূর্য ভিতরে রয়েছে তাতে সমস্ত আধারও সূর্যের মতো হয়ে গিয়েছে, complete transformation। এই অমৃতত্ব, এটাই physical immortality। তাহলে সমস্ত ভাবনাটি হচ্ছে—যে মহাপ্রাণকে আমরা মহাশূন্যে প্রত্যক্ষ দেখি সূর্যরূপে, তার থেকে কেঁপে কেঁপে রশ্মিগুলি বেরিয়ে আসছে, তাই এই জগৎরূপে বেরিয়ে এসেছে। যদি সেই প্রাণকে অধিগত করতে পারি ভাবনার দ্বারা, তাহলে এই সূর্যের মতো আমরা অমৃত হব, দিব্য প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হব। জীবনে সেটা হতে পারি ভাবের দ্বারা আর মরণে যথাযথরূপে। এরপরে আর একটা ভাবনা আছে। সূর্যদ্বার ভেদ করে আকাশে লয় হয়ে যাওয়া। এটা হচ্ছে বৌদ্ধ নির্বাণ। তাঁদের ভাবনা এই ছিল যে ঈশ্বর, প্রভৃতি কল্পনা না করে শুধু যা নাকি হয়ে আসছে, যা ঘটে আসছে তারই মাঝে শাশ্বত সত্তাকে আবিষ্কার করা। আর লোককল্পনা নয়, শুধু আকাশের মাঝে সূর্যের কল্পনা। আমরা সমস্ত তাঁর সঙ্গে বাঁধা। যদি আমাদের উৎক্রান্তি হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত সূর্যই হয়ে যাই। সেই সূর্য বাইরের দৃষ্টিতে physical স্থূল, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে চিন্ময়। এটা অধিদৈবত ভাব। যেমন আমাদের দেহ বাইরের দৃষ্টিতে physical কিন্তু সেটা ভিতরে যেন প্রাণ ও চেতনা দ্বারা দিগ্ধ। দিগ্ধ মানে আলিপ্ত, beasmeared।

এখানে একটা ভয়ের কথা বলা হয়েছে। এটা সেই যাকে আমরা বলি সম্ভ্রমবোধ awe অর্থাৎ কোনো Sublime বা মহিমময় প্রকৃতির সামনে চেতনায় যে অভিভূত ভাব আসে তাকে mean করা (বোঝানো) হয়েছে। এটা কিন্তু লৌকিক ভয় নয়। তাঁকে ভয় করি এই জন্য যে তাঁকে দেখি তিনি বিরাট। আমরা 'থ' হয়ে যাই। এই 'থ' হয়ে যাওয়াটা হচ্ছে ভয়। এই যে বিরাট তার একটা ঋতচ্ছন্দ রয়েছে। সেই ঋতচ্ছন্দ একটা প্রশাসন। উপনিষদে সর্বদা ব্যবহার করা হয়েছে এই প্রশাসন শব্দ। সেটার অনুবর্তন আমাদের সবাইকে করতে হয়। সাধ্য নাই যে তাকে অতিক্রম করে যাব। যদি অতিক্রম করতে চাই তাহলে তিনি বজ্র হয়ে আমাদের মাঝে নেমে আসবেন। এই প্রশাসন যাঁর হাতে, উপনিষদে তাঁকে 'অক্ষর' বলা হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য-গার্গী-সংবাদে আছে 'এতস্য অক্ষরস্য প্রশাসনে' সেই অক্ষর সত্যের প্রশাসনে সমস্ত কিছু দিগ্ধ—ঋতের ছন্দে। একে অতিক্রম করতে গেলেই বাধা আসে বা বজ্রশক্তি জেগে ওঠে।

৩।। পাঁচটি দেবতার কথা বলা হচ্ছে—অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, সূর্য ও মৃত্যু। এর মাঝে চারটি আমাদের পরিচিত দেবতা। ঋগ্বেদে অনেকস্থানে তাদের উল্লেখ রয়েছে। অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা, পৃথিবীর জ্যোতি। বায়ু অন্তরিক্ষ-জ্যোতি বা প্রাণের জ্যোতি। আর ইন্দ্র শুদ্ধ মনের জ্যোতি। আর ঊর্ধ্বে সূর্য, অখণ্ড চৈতন্য। আর সূর্যের ওপারে মৃত্যু, অন্ধকার। অগ্নির যেমন ছন্দ রয়েছে তেমনি বায়ু, ইন্দ্র, সূর্য, মৃত্যুরও। কিন্তু সমস্তই সেই প্রাণের প্রশাসন। চেতনার একটা ভূমি থেকে আর একটা ভূমিতে আমরা উত্তীর্ণ হই। যখন মৃত্যুকে পাই—মৃত্যু সেই অব্যক্ততত্ত্ব। অগ্নিতত্ত্ব থেকে শুরু অর্থাৎ অভীপ্সা থেকে শুরু। আর তার

সারা হচ্ছে মৃত্যুতে, মহাশূন্যতাতে। এখানে একটি অদ্ভুত বর্ণনা peculiar expression **মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ**। মৃত্যু কোনো static স্থির, স্তব্ধ অবস্থা নয়, ওটা হচ্ছে প্রধাবন। সেই মৃত্যুর প্রধাবন দুদিকে আছে। একদিকে মৃত্যুর প্রধাবন এই সংসারে। তার বর্ণনা ঋগ্বেদেও পাওয়া যায়। সংসারে সমস্ত কিছুই মৃত্যুর দ্বারা স্পৃষ্ট। আমরা যতই ব্রহ্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছি, মৃত্যু পিছনে পিছনে ধাওয়া করছে। ধরছে আবার সেই মহাশূন্যে ফিরিয়ে নিচ্ছে। এই হচ্ছে মৃত্যুর একটা ধাবন। আর একটা মৃত্যুর ধাবন হচ্ছে যখন আমরা সূর্যমণ্ডল ভেদ করি, সূর্য পার হয়ে যাই, সূর্যকে অতিক্রম করি। তখন মৃত্যুর প্রধাবন সেই মহাশূন্যে চিৎশক্তির ঊর্ধ্বগতির দিকে। অশ্বত্থবৃক্ষের যে মূল, উপমূল তাকে আশ্রয় করে মহাশূন্যে চেতনার বিকিরণ। দুটিতে মিলে অস্তিত্বের পূর্ণতা। এটাকে psychologically এইভাবে বোঝানো যায়—শূন্যের মাঝে একটা শক্তি রয়েছে, যা কেবলই গহন থেকে গহনে আমাদের আকর্ষণ করছে। এটাকে পুরাণে বলা হয়েছে সঙ্কর্ষণ শক্তি, দিব্যশক্তি, বাসুদেবের দ্বিতীয় ব্যূহ। এই সঙ্কর্ষণের টানটাই হচ্ছে মৃত্যুর সেই ঊর্ধ্বগ প্রধাবন। সমস্তই অক্ষরের প্রশাসনে হচ্ছে।

৪।। এখানে আর একটা অদ্ভুত কথা বলছে। **ইহ চেদসকদ্ বোদ্ধুম্ প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ**। শরীরের বিস্রংসমান হওয়া, disintegrated হওয়া। এই শরীরের disintegration-এর পূর্বে যদি কেউ এ প্রাণতত্ত্বকে জানে তাহলে **স্বর্গলোকে শরীরত্বায় কল্পতে**। এই বিসৃষ্টির যে সমস্ত লোক তাতে সে শরীর নিয়ে উৎপন্ন হয়। এ হচ্ছে immortality-র আর একটা conception। সাধনা আরম্ভ করতে হয় দেহ দিয়ে কিন্তু এ দেহ থাকবে না। দেহপাতের পূর্বে যদি এই প্রাণতত্ত্ব অধিগত করতে পারি, এই অশ্বত্থবৃক্ষের ভাবনা দ্বারা, বা এই সূর্যমণ্ডলের ভাবনা দ্বারা, তাহলে এই দেহ ছেড়ে যখন সৌরদেহ লাভ করব, তখন আবার আমার থেকেই দেখব অনন্ত শরীরের বিসৃষ্টি। তাহলে আমাদের মধ্যে যে কল্পনা রয়েছে যে অশরীরত্ব লাভ করাই মুক্তির লক্ষ্য, বিদেহ হওয়া—এই কল্পনা তার বিপরীত। বিদেহত্ব লাভ করা এটাকে আমরা জানি মুক্তির লক্ষ্য। বিদেহ হওয়া অর্থাৎ দেহ থাকবে না। কিন্তু আর একটা সম্ভাবনা possibility-এর ভিতরে রয়েছে যে সর্বদেহ হব। বিদেহ হওয়া এবং সর্বদেহ হওয়া, দুইয়ের মাঝে কোনো বিরোধ নেই। যিনি বিদেহ, তিনিই আবার সর্বদেহ। তিনি সমস্ত ঘটের অতীত, আবার তিনিই ঘটে ঘটে। যদি তাঁকে জানি তাহলে যেমন নাকি বিদেহ হতে পারি, তেমনি আবার সর্বদেহও হতে পারি। আমরা এখন মুক্তির দুটো কল্পনা করি—একটা জীবন-মুক্তি আর একটা বিদেহমুক্তি। কল্পনা করি যে বিদেহমুক্ত দেহপাতের পর বিদেহ হয়ে যান। এখানে আর একটা সম্ভাবনা বা possibility-র কথা বলা হচ্ছে যে তিনি বিদেহ হয়ে সর্বদেহও হতে পারেন। তিনি ব্রহ্মকায় হয়ে যান। এটাই হল **সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে**। সর্গ সৃষ্টি। যে সমস্ত লোক-সৃষ্টি হয়েছে, তার মাঝে যত শরীর সে সমস্ত শরীর তিনিই হন। অর্থাৎ উপনিষদের ভাষায় তিনি বিরাট হিরণগর্ভ ঈশ্বর হন, বিশ্বাত্মা হন। এটা তাহলে গোড়া থেকে যে প্রাণের উপাসনার কথা বলা হয়েছে সেই প্রাণের উপাসনা। অর্থাৎ শরীরপাতের পর ব্রহ্মক্ষোভ কিংবা প্রাণব্রহ্ম, যার সঙ্গে তিনি এক হয়ে যান। মৃত্যু পিছনে background পটভূমি হয়ে থাকে। এও মুক্তি।

৫।। আগের মন্ত্রটিতে বলা হয়েছিল, সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে। সর্গলোক

অর্থাৎ সৃষ্টিতে যে সূক্ষ্মলোক রয়েছে তাই। বলা হয়েছিল যে দেহ থাকতেই যদি তত্ত্বজ্ঞান হয় তাহলে সৃষ্টিতে যে-সমস্ত সূক্ষ্ম লোকপরম্পরা রয়েছে তার মাঝে শরীরের উত্থান হয়। এই মতবাদেরই একটি ভাবনা নিয়ে নাথ সম্প্রদায়ের পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডের মতবাদ প্রচলিত হয়েছে। আমরা চলিত কথায় বলি যা আছে ভাণ্ডে, তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে। সমস্ত জগৎটাকে এই আত্মসত্তাতে অন্তর্ভুত করা যেতে পারে। তখন এই দেহই ব্রহ্মপুরূপে রূপান্তরিত হয়।

সপ্তলোকবাদ প্রচলিত আছে। সেটা এঁরা সাতটা চক্র দিয়ে বুঝিয়েছেন—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা, সহস্রার। সপ্তলোক—ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য। অন্যত্র লোকগুলিকে চেতনার দিক থেকে বোঝানো হয়েছে। যেমন, অন্নময় চেতনা বা অন্নময় পুরুষ, অন্নময় কোষ। প্রত্যেকটি কোষে একটি করে পুরুষ রয়েছে, যেমন প্রাণময় ভূমি, মনোময় ভূমি, বিজ্ঞানময় ভূমি, আনন্দময় ভূমি। তারপরে সেই আত্মা। এই চেতনার ভূমির কথা বিশেষ করে বলা হয়েছে তৈত্তিরীয় উপনিষদে। অন্ন, প্রাণ, মন এই তিনটির সঙ্গে আমরা কতকটা পরিচিত। চৈতন্যের দিক থেকে যদি দেখি, তাহলে বলব যেখানে চেতনা জড়, আচ্ছন্ন, অবসন্ন সেটা হচ্ছে আমাদের অন্নময় কোষ। এটা প্রাকৃত ভূমি। (অপ্রাকৃত অন্নময় ভূমিও আবার আছে)। যেখানে চৈতন্যের মোহ চাঞ্চল্য আছে অথচ রসাস্বাদনেরও একটা সুযোগ সামর্থ্য আছে, সেটা হচ্ছে প্রাণভূমি। যেখানে চেতনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেটা মনোময় ভূমি। যেখানে চৈতন্য শুদ্ধ হল সেটা বিজ্ঞানময় ভূমি। সেটাই আরও বেশি আনন্দের প্রকাশ হবে। তারও ওপারে উপনিষদ স্থাপন করেছেন আত্মাকে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদেই আছে আনন্দ-মীমাংসা। সমস্তকে দেখা হয়েছে সেই আনন্দের দিক থেকে। তাকে এইরকমভাবে বর্ণনা করবার চেষ্টা করা হয়েছে যে প্রথম মানুষের ভূমি, মনুষ্যভূমি—সেটা আমাদের এই প্রাকৃত ভূমি, যার মাঝে অন্নময় চেতনা, প্রাণময় চেতনা, মনোময় চেতনা এইগুলি স্পষ্টভাবে তো আছেই, বিজ্ঞানময় চেতনা ও আনন্দময় চেতনারও আভাস আছে। আত্মচৈতন্য আছে। এরপর বলা হয়েছে গন্ধর্ব-চেতনার কথা। তাতে মনুষ্য-গন্ধর্ব, দেবগন্ধর্ব—এই দুটি ভাগ করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে পিতৃচেতনার কথা। তারপর দেবচৈতন্য। চার ভাগ করা হল। চারটি লোক পার হলে বলা হয়েছে ব্রহ্মলোক। এখানেও বলা হচ্ছে, গন্ধর্বলোক, পিতৃলোক আর শেষে ব্রহ্মলোকের কথা। তাতে অনুভবের প্রকার কীরকম হয়, উপমা দিয়ে বোঝানো হয়েছে। সেটা যেমন আদিতেও রয়েছে, তেমনি অন্তেও রয়েছে। প্রথম নিজের মাঝে আত্মার সুস্পষ্ট অনুভব। তারপর সেই অনুভবের ব্যাপ্তি হবে। অবশেষে সেই অনুভব সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে যাবে। তখন আমরা চৈতন্যের এই তিনটি ক্রম পাই। আত্মচৈতন্য বিশ্বচৈতন্য এবং লোকোত্তর চৈতন্য। এই ক্রমটা খুব সহজ। প্রাকৃত জীবনেও আমরা দেখি আত্মচৈতন্য যতই স্পষ্ট হতে থাকে, এবং তারই আলোকে স্পষ্ট করে যতই জানি, কিংবা প্রাকৃত ভাষায় বলতে পারি যে আমার personality যত grow করে, ততই আমার সেই জগৎটারও পরিধি বাড়তে থাকে, তার সঙ্গে আমার সম্পর্কও নিবিড় হয়। এটাই হবে আত্মচৈতন্যের বিশ্বচৈতন্যে ব্যাপ্তি। তারপর এই আত্মচৈতন্য এবং বিশ্বচৈতন্যের উজানে তৃতীয় চৈতন্যের সাক্ষাৎ পাই, যেটা পৃথিবীকে ধরে রয়েছে, অর্থাৎ আমাকে এবং আমার জগৎকে ধরে রয়েছে। তাকে ঈশ্বর বলি, ব্রহ্ম বলি। এইগুলি হবে scheme। প্রথম বলছেন, এই চৈতন্যের যে

অনুভব হয় সেটা আত্মাতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে হয়। একটা উপমা দিয়ে বলছেন, **যথা আদর্শে তথা আত্মনি**। যেমন আয়নার মাঝে ছবিটা খুব স্পষ্ট হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি তত্ত্বের অনুভব আত্মাতে স্পষ্ট হয়ে পড়ে। এই দিয়ে সাধনা আরম্ভ করছি। নিজের মাঝে নিজেকে খুব স্পষ্টরূপে অনুভব করব, নিজের একটা কেন্দ্র খুঁজে পাব, একটা স্থিতি। এমন একটা ভূমি যেখান থেকে সমস্ত কিছুকে প্রশাসন করতে পারি। সোজা কথায় সেটা বলা যায়, আপনাতে আপনি থাকা। একটা আত্মকেন্দ্র, জগৎটা তার বাইরে, তার পরিধিতে রয়েছে। এটা হয় অন্তরাবৃত্ত দৃষ্টির দ্বারা, আবৃত্তচক্ষুতার দ্বারা, যার কথা উপনিষদের গোড়াতেই বলা হয়েছে। প্রথম আমরা বাইরে দেখি, জগৎটাকেই দেখি, সে জগতের যে সমস্ত কথাবার্তা, সেখান থেকে যে সমস্ত ধাক্কাগুলি আসে তাকে আমরা বড় মনে করি। তখন আমরা আত্মসচেতন হই। সচেতন, কিন্তু নিজের সম্পর্কে যে বোধ সেটা স্পষ্ট নয়। বাইরের বোধের সঙ্গে সেটা জড়িয়ে থাকে। সাংখ্য তাকে বলেছেন, অবিবেক্-দশা। তখন আমাদের সমস্ত চেতনার বিস্তার থাকে বাইরে। ক্রমশ এই বাইরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার ভাবটাকে আমরা কাটিয়ে উঠি। অন্তর্মুখ হই। আবৃত্তচক্ষু হই। তখন আসে বিবেক। আত্মচৈতন্য ক্রমে স্পষ্ট হয়। লোকব্যবহারে প্রতিমুহূর্তেই অন্তরাবৃত্ত হয়ে আমরা আত্মচৈতন্যকে স্পষ্ট দেখতে পারি, আবার বিযুক্ত হয়ে ধ্যান দ্বারাও স্পষ্ট দেখতে পারি। তাতে যে-বোধ জাগে সে বোধটা দর্পণে ছায়া পড়বার মতো অত্যন্ত স্পষ্ট হয়। সেই দর্শনে আমাদের চিত্তদর্পণে আত্মানুভবের স্পষ্ট ছায়া পড়বে। এই স্পষ্ট অনুভবের চরমসীমা হচ্ছে একটা অত্যন্ত গাঢ় অস্তিত্বের বোধ। এখন এই বোধটাকে কেন্দ্র করে লোকোত্তর চেতনার বিস্তার হতে থাকে। অর্থাৎ আমারই মাঝে চৈতন্যের কতকগুলি ভূমি প্রকাশ হয় এবং আমাদের প্রাকৃত জীবনে এই ভূমিগুলির প্রভাব পড়ে।

প্রথম ভূমি বলা হবে গন্ধর্বলোক। এখানে ক্রমটা orderটা ঠিকমতো দেওয়া হয়নি ছন্দের খাতিরে। গন্ধর্ব ভূমিটাকে আমরা বলতে পারি প্রাণভূমি। তার উপর মনেরও ছায়াসম্পাত হয়েছে কিন্তু মুখ্যত সেটা প্রাণভূমি। এখন প্রাকৃত প্রাণের সঙ্গে তার তুলনা করি। প্রাকৃত প্রাণে বাসনা প্রবল। বাসনা চায় সম্ভোগ, রসাস্বাদ। এই রসাস্বাদকে আমরা বিশুদ্ধ করে নিতে পারি, যদিও তার নির্ভর থাকবে ইন্দ্রিয়ের উপর। এটাকেই আমরা আজকাল বলি art-এর জগৎ। শব্দ আর রূপ বিশেষত এই দুটিকেই আমরা art-এর উদাহরণরূপে গ্রহণ করি। শব্দ, স্পর্শ, রূপ—এ তিনটিকে আমরা নিতে পারি। এগুলির যে অবিশুদ্ধ, ব্যামিশ্র সম্ভোগ, সেটা মনুষ্যলোকে হয়। এটা হচ্ছে স্থূলভোগ। এই ভোগই যদি বিশুদ্ধ হয়, ব্যাপ্ত হয়, উপাদাননিরপেক্ষ হয়, abstract হয়, তাহলে সে চেতনা গন্ধর্বলোকে পৌঁছয়। আমাদের দেশে গানবাজনাকে বলে গান্ধর্ববিদ্যা! এটা হল শব্দের দিক থেকে রসাস্বাদন। আবার তেমনি রূপের দিক থেকে হতে পারে। নৃত্যের দিক থেকে হতে পারে, অঙ্গহার যাকে বলা হয়। আবার স্পর্শের দিক থেকেও হতে পারে, যা নরনারীর প্রেমলীলায় অভিব্যক্ত হয়। এ সমস্তই গন্ধর্বচেতনার অন্তর্গত। এখানে বলা হচ্ছে যার চেতনা গন্ধর্বপ্রধান, তার মাঝে যখন তত্ত্বের ছায়া পড়ে, তখন সে ছায়াটা **অপ্সু পরীব দদৃশে**, জলের মাঝে ছায়া পড়ার মতো। অপ্ কথাটি বলা হয়েছে একটা বিশেষ অর্থকে লক্ষ করে। আপো বৈ প্রাণাঃ, আগেই বলেছি। প্রাণের প্রতীক বা symbol হচ্ছে অপ্। প্রাণ চঞ্চল, তার মাঝে যখন সেই চৈতন্যের ছায়া পড়ে, সে যেন সব সময় টলমল

করছে। এই যে চৈতন্যের দ্বারা উদ্ভাসিত অথচ টলমল করছে, এ হচ্ছে প্রাণের স্বরূপ। এ প্রাণকে অবলম্বন করেই গন্ধর্বচেতনা ফোটে। এই গন্ধর্বলোকের একটা ছবি আমরা উপনিষদের গোড়াতেই পেয়েছি। যখন যম নচিকেতাকে তৃতীয় বর চাওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে চাইছিলেন তখন তাঁর সামনে নানারকম ভোগসুখ উপস্থিত করা হল। রথ, অশ্ব, সঙ্গীত, বাদ্য, অপ্সরা প্রভৃতি। আগেও বলেছি, যোগের প্রথম দশায় এইরকম একটা ভূমি আমাদের সম্মুখীন হয়। সেটাকে যোগশাস্ত্রে বলা হয়েছে 'মধুমতী ভূমি'। মধুতে যেমন মিষ্টত্ব রয়েছে, একটা নেশা রয়েছে, সেরকম মিষ্ট নেশার একটা ভূমি খুলে যায়। ইন্দ্রিয় শক্তিগুলি তীক্ষ্ণ হয় আর তীক্ষ্ণ হওয়াতে অপার্থিব যে সব ভোগ্যবস্তু সেগুলি তার সামনে আবির্ভূত হয়। যোগে এইগুলিকে বলে তন্মাত্রা-সংবিৎ। এইগুলি সেই পঞ্চেন্দ্রিয়েরই সূক্ষ্ম সম্ভোগের উপাদান। যেমন, দিব্য স্পর্শ, দিব্যরস, দিব্যগন্ধ, দিব্যরূপ এই সমস্তগুলি ফোটে। এগুলিকে প্রত্যাখ্যান করা বা উজিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে যোগে। কতকটা এর আভাস পাই যখন আমরা vision দেখতে পাই। এ vision আমরা অনেকেই দেখি এবং অনেক সময় এ vision-এ আমরা আবদ্ধ হয়ে পড়ি। এটা হচ্ছে সেই গন্ধর্ব-লোকে থেকে যাওয়া। তাতে যে আত্মদর্শন বা আত্মচৈতন্যের সমাহার হয়, সেটা যেন জলের উপর ছাড়া পড়ার মতো অর্থাৎ তাতে আচ্ছন্নতা থাকে। এই লোকের যে সমাহার সেটাও স্পষ্ট হতে পারে যদি আমরা ওটা ওপর থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে আবার দেখি। এখানে যখন বলা হল, 'সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে' অর্থাৎ সৃষ্টিতে যে লোকগুলি রয়েছে সেগুলি যখন পরপর চেতনায় বিকশিত হয়ে যায়, তখন গন্ধর্বলোকটাকে অনুভব হয় আত্মারই একটা বিভূতিরূপে। সেই বিভূতিরূপে তখন সত্যদর্শন হতে পারে। পুরাণে এই কথাটাই বোঝানো হয়েছে এইভাবে যে, অপ্সরারা ইন্দ্রের নিত্য সহচরী, ইন্দ্রের কাছে তারা কোনো প্রলোভনের বস্তু নয়, কিন্তু তারাই এসে আবার সাধকদের তপোভঙ্গ করে। ঋগ্বেদে এই অপ্সরাদের বলা হয়েছে ইন্দ্রের স্বারাজ্য-সঙ্গিনী অর্থাৎ ইন্দ্রচৈতন্যের স্বাভাবিক বিভূতি।

যদি তাদের ঈশ্বর হতে পারি master হতে পারি, তাদের যদি control-এ রাখতে পারি তবে তারা আমারই আত্মচৈতন্যের ছটা। এটা হচ্ছে তাদের যথার্থ সম্ভোগ আর যখন মনুষ্যচেতনা থেকে উপর দিকে উজিয়ে যাচ্ছি তখন যদি তারা উপস্থিত হয় আর মনুষ্যচেতনায় যদি তাদের গ্রহণ করতে যাই তবে তখন তাদের দ্বারা আমরা প্রলুব্ধ হই এবং যোগভ্রষ্ট হই।

নচিকেতা যখন স্বর্গলোকেরও ঊর্ধ্বে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তখন কীভাবে তাদের প্রত্যাখ্যান করেছিলেন দেখানো হয়েছিল। সেই গন্ধর্বলোক, প্রাণলোকের কথা শেষ করে তারপর বলা হচ্ছে গন্ধর্বলোকের ঊর্ধ্বে পিতৃলোকের কথা। পিতৃলোককে আমরা স্থাপন করতে পারি মনোভূমি আর বিজ্ঞানভূমি দুটোর ঠিক মাঝামাঝি। বিজ্ঞানভূমি থেকে আরম্ভ হবে দেবলোক। বিজ্ঞানভূমিকে আমরা সাংখ্যের ভাষায় বলতে পারি শুদ্ধসত্ত্বের ভূমি। মনের ভিতর দিয়ে স্বত্ত্বগুণের প্রকাশ হয়, কিন্তু তার মাঝে তম এবং রজের সংমিশ্রণ থাকে। আমাদের ভাবনায়, চিন্তায়, অনুভবে, সঙ্কল্পে আমরা যেন স্বচ্ছতার প্রকাশ দেখি তেমনি আবার চাঞ্চল্য, আচ্ছন্নতাও মিশে থাকতে দেখি। এটাই মনোভাবের দস্তুর। সব সময় আমাদের মনশ্চেতনা স্পষ্ট থাকে না, অথচ স্পষ্টতার আভাস আমরা পাই। যখন

বিজ্ঞানভূমিতে উত্তীর্ণ হব তখন এগুলি খুব স্পষ্ট হয়ে যাবে। তখন মনে হবে এই মন-প্রাণ দেহকে বিজ্ঞান যন্ত্ররূপে ব্যবহার করছে। এই বিজ্ঞানভূমিতে পিতৃ-চৈতন্যের শাশ্বত অবস্থান। এইজন্যই তাকে বলা হয়েছে পিতৃলোক। এই ভূমিতে মানুষের যত সব সিদ্ধির শক্তি সঞ্চিত থাকে। এই কথাটা ঋগ্বেদে প্রথম সূক্তে পাই, যেখানে ঋষি বলছেন, আমার মাঝে আজকে যে আগুন জ্বালাতে যাচ্ছি সেটা শুধু আজকেরই নয়, আর শুধু আমার মাঝেই নয়। এ আগুন যাঁরা পূর্বে ছিলেন, তাঁরাও জ্বালিয়ে গেছেন। আর এর পর যাঁরা আসবেন তাঁরাও জ্বালাবেন। অর্থাৎ সাধনার মাঝে একটা ক্রম রয়েছে, একটা ধারা রয়েছে। পূর্বসঞ্চিত যে সাধনা, সাধনার যে সিদ্ধি যার ফল আমরা লাভ করি, সেইটা দিয়ে আবার আমরা ভবিষ্যতকে গড়ে তুলি। এই যে অনুবৃত্তি সেটাকে বলা হতো 'সন্তান'। আর এই সন্তানক্রমে ব্রহ্মবিদ্যা দিয়ে যাওয়া, ধারাকে প্রবাহিত রাখা, এটা তাঁরা সজ্ঞানে করতেন। এর মধ্যে পিতৃলোকের সঙ্গে পুত্রের সহযোগ ঘটত। পিতৃশক্তি আমাদের সাহায্য করেন এ বিশ্বাসটা ছিল। যেমন দেবতার আরাধনা কিংবা উপাসনা, তেমনি পিতৃলোকের তর্পণ। এই পিতৃলোকে গুরুশক্তি সঞ্চিত রয়েছে বলা যেতে পারে। আমরা যেটাকে গুরুশক্তি বলছি, তাঁরা বলতেন ঋষিদের শক্তি। ঋষি মানে আমাদের পিতৃগণ। একই কথা। একসময়ে ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ করা হতো পিতার কাছ থেকে। তখন পিতাই ঋষি। সমস্তই হল মানুষের যে চেষ্টা তার ফলে যে সিদ্ধি, তার একটা সংহত রূপ, এটাকে ভাবনা করা উচিত। এটা থেকে আমরা শক্তি আহরণ করতে পারি। আর এই পিতৃলোক যখন আত্মচৈতন্যে উদ্ভাসিত হয় তখন তাকে দেখি স্বপ্নের মতো। স্বপ্নটা এখানে mystic sense-এ রহস্যার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। স্বপ্নজ্ঞান যেটা, সেটা বিজ্ঞান। আমরা যে প্রাকৃত স্বপ্ন দেখি এখানে সেটাকে বোঝানো হয়নি। আমাদের স্বপ্ন দুইরকম। প্রাকৃত স্বপ্নগুলি মনেরই ছায়া। তার মাঝেও বিজ্ঞানের আবেশ রয়েছে। কেননা ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ হয়ে বিষয়ের জ্ঞান হচ্ছে। এটি হচ্ছে বিজ্ঞানের প্রভাব। কিন্তু বিষয়ের জ্ঞান সেখানে স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। দৃশ্যটি কোনো ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষের সঙ্গে জড়ানো। এইগুলি হচ্ছে আমাদের এই প্রাকৃত স্বপ্ন। এর ঊর্ধ্বে আমাদের একটা স্বপ্নলোক রয়েছে, যেখানে আমরা স্বপ্ন দেখি কোনো অনুভূত বিষয়কে আশ্রয় করে নয়, অনুভাব্যের প্রকাশ। একটা সাধারণ উদাহরণ বলা যেতে পারে, যেমন দেবস্বপ্ন, যদিও তার মাঝে প্রাকৃত স্বপ্নের মিশ্রণ থাকতে পারে, তবু স্বপ্নবিষয়কে অবলম্বন করে তত্ত্বেরও স্ফুরণ হতে পারে। এখানে স্বপ্ন বলতে এই বিজ্ঞানময় স্বপ্নকে লক্ষ করা হয়েছে, বিজ্ঞানভূমিকে লক্ষ করা হয়েছে, যেখানে ভাবের স্ফুরণ হয়। মন এবং বিজ্ঞানের সংযোগভূমিতে পিতৃভূমি। এই মন হচ্ছে আমাদের ঊর্ধ্বচারী মন। Universal truth-এর যেখানে দর্শন হয়, সেই ভূমি হচ্ছে পিতৃভূমি। গুরুশক্তির ভূমিও বলা যেতে পারে। তাকে তন্ত্রে বলা হয়েছে, মানবৌঘ, সিদ্ধৌঘ। মানুষের সাধনচেষ্টা যেখানে সঞ্চিত রয়েছে, সেটা হল মানবৌঘ। আর মানুষের যেখানে সিদ্ধি, তার শক্তি যেখানে পুঞ্জিত হয়ে রয়েছে সেটা সিদ্ধৌঘ। দুটিই গুরুশক্তির ভূমি। তার ঊর্ধ্বে আবার তন্ত্রে আর একটা ভূমির কথা বলা হয়েছে, দিব্যৌঘ। এখানে যাকে পিতৃলোক বলা হয়েছে সেটা মানবৌঘ আর সিদ্ধৌঘ—এ দুটি শক্তির আশ্রয়।

পিতৃলোকের পর দেবলোক। এখানে দেবলোকের কথা বাদ দেওয়া হয়েছে, একেবারে চলে যাওয়া হয়েছে ব্রহ্মলোকে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে যে দেবভূমির কথা

রয়েছে তার উপান্তভূমিতে রয়েছে প্রজাপতি। আরম্ভ হয়েছে আজানদেব দিয়ে। আজানদেবকে বলা যেতে পারে নিসর্গ। তারপর কর্মদেব, তারপর শুদ্ধদেব। তারপর সেই তিনটি দেবতা যাঁদের আমরা বলতে পারি মহাদেব—ইন্দ্র, বৃহস্পতি, প্রজাপতি। এই যে প্রজাপতি, ইনিই একসময় যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা ছিলেন। আমরা এখন God বলতে যা বুঝি, বৈদিক যুগে প্রজাপতি বলতেও ঠিক তাই বোঝানো হতো। বেদান্তের পরিভাষা ব্যবহার করে বলতে পারি, সগুণ ব্রহ্ম। ঈশ্বরও বলতে পারি। এই প্রজাপতির উর্ধ্বে ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে বলা হয়েছে ছায়াতপ। **ছায়াতপয়োঃ ইব ব্রহ্মলোক**। আতপ প্রজাপতি যাকে ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে প্রাজাপত্য সূর্য। এটা হল সূর্যের শুক্ল ভাতি। তার ওপিঠে হচ্ছে ছায়া। যেটা একদিকে পরঃকৃষ্ণ, সেটাই তার একদিক থেকে সমস্ত কিছুকে বিভাসিত করছে। তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্বম্। এটা যদি শুক্লভাতি, তবে ওটা কৃষ্ণভাতি। ব্রহ্ম দুইয়ের সমাহার।

তাহলে এই যে লোকদর্শন তার গোড়ায় থাকল, আয়নাতে যেমন ছায়া পড়ে তার যেমন সুস্পষ্ট দর্শন হয়, তেমনি সুস্পষ্ট আত্মদর্শন। সেই আত্মদর্শন বিস্ফারিত হয়। হয়ে সে গন্ধর্বচেতনা, পিতৃচেতনা, দিব্যচেতনার ভিতর দিয়ে ব্রহ্মচেতনা পর্যন্ত পৌঁছয়। তখন অয়মাত্মা ব্রহ্ম, যেটা অন্য উপনিষদে বলা হয়েছে, এই অনুভূতি জাগে। সমস্ত বিশ্ব তখন ব্রহ্মীভূত এই আত্মার শরীর। যা আগের শ্লোকে বলা হয়েছিল—সর্গেযু লোকেযু শরীরত্বায় কল্পতে।

৬।। এখানে একটা সাধন সঙ্কেত দেওয়া আছে। পৃথকরূপে উৎপদ্যমান যে ইন্দ্রিয়, তাদের পৃথকভাব এবং উদয়-অস্ত আছে। এটি যে জানে সে শোকের ওপারে যায়। ইন্দ্রিয়গুলিকে বলা হয়েছে **পৃথক্ উৎপদ্যমান**। একটা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আর একটা ইন্দ্রিয়ের পার্থক্য রয়েছে এটা আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। যেমন চোখের কাজ কান দিয়ে চলে না—এরকম প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা।

পঞ্চভূতের মাঝে চৈতন্যের আবেশে এবং বাইরের অভিঘাতে আলাদা আলাদা ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়েছে বিভিন্ন বস্তুকে গ্রহণ করবার জন্য।

ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি বা ক্রিয়া হচ্ছে আলাদা আলাদা কিন্তু আবার মনের মাঝে গিয়ে ওরা একাকার হয়ে যায়। তখন একটা ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানের সঙ্গে আর একটা ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটে। যেমন আমি যদি ভাবতে যাই একটা আপেলের কথা তাহলে তার রসের কথা ভাবতে গিয়ে রূপের কথায় ডুবে যাই। রূপের যে জ্ঞান তার সঙ্গে গন্ধজ্ঞানও জড়িয়ে থাকে। এরকমভাবে মনের মাঝে সমস্ত বৃত্তিগুলি মিশে যায়। এখন একটা সাধনা হচ্ছে, এমনি করে এদের মিশতে না দেওয়া। যেমন আমি একটা আপেলের কথা ভাবছি, যদি তার রূপের কথা ভাবি, রূপটাকেই গ্রহণ করতে চাই, তাহলে তার স্পর্শের কথা ভাবব না কিংবা রসের কথা ভাবব না, শুধু সেই রূপের কথাই ভাবব। তার থেকে যে জ্ঞান হবে সেটাকে বলব রূপতন্মাত্র, শুধু রূপ, আর কিছু নয়। যদি সেই আপেলের রসের কথা ভাবতে চাই, তাহলে রূপের কথা ভাবব না, এটি রসতন্মাত্র। এই তন্মাত্রগুলিকে যোগে বলা হয় সূক্ষ্ম বিষয়, আর সেগুলিতে চিত্তের যে সমাপত্তি তাকে বলা হয় সবিচার সমাপত্তি।

চারটি সমাপত্তির কথা আছে যোগে—সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ, সাস্মিত। এগুলি হচ্ছে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যোগকে অবলম্বন করে চেতনাকে ক্রমশ সূক্ষ্মের দিকে নিয়ে

যাওয়া। প্রথম সবিতর্ক সমাপত্তি। ধরা যাক শ্রীকৃষ্ণমূর্তির ধ্যান করছি। সে মূর্তিতে আমার চিত্ত সমাপন্ন হল। সমাপত্তির লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তৎস্থ-তদঞ্জনতা (যোগসূত্র ১।৪১)। সাংখ্যেও একই উপমা ব্যবহার করা হয়, আত্মাকে বলা হয় একটা স্বচ্ছ স্ফটিক আর বিষয়টি যেন জবা ফুল। জবাফুলের ছায়াটা স্ফটিকের উপর পড়ল। স্ফটিক তাতে লাল দেখাল, এটাকে বলে উপরাগ। এই উপরাগের মাঝে বিষয় এবং বিষয়ী একাকার হয়ে যায়। এই যে একাকার হয়ে যাওয়া তাকে বলেছে তৎস্থ-তদঞ্জনতা। তাতে থেকে যেন তার সঙ্গে মাখামাখি হয়ে যাওয়া। এটাই সমাপত্তি। বিষয়ভেদে সমাপত্তি আলাদা আলাদা। যেমন শ্রীকৃষ্ণমূর্তির ধ্যান করে তন্ময় হয়ে গেলাম। তখন সে মূর্তির সব কিছুই গ্রহণ করছি। মূর্তি তখন আমার গ্রাহ্য বিষয়। সূক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে আমিও আলাদা, মূর্তিও আলাদা। মূর্তির যে বিভিন্ন বিভাব বা aspect রয়েছে সেগুলি হয় মিশ্রিত হয়ে অথবা পর্যায়ক্রমে চেতনায় ভাসছে। ধরা যাক ভক্তের দেবতার সঙ্গে বিলাস। কখনও স্পর্শ, কখনও শব্দ কখনও রস এই রকমভাবে তর্পণ হয়। এর মাঝে বিতর্ক রয়েছে। বিতর্ক মানে বিষয়কে বিচিত্রভাবে গ্রহণ করা, যার মূলে চিন্তার সঙ্গে ভাষার একটা যোগ থাকে। ভাষা চিন্তাকে বিশ্লিষ্ট করে দেয়। সেজন্য তখন গ্রহণ যেটা হয় সেটা বিশ্লিষ্ট গ্রহণ হয়, অথচ সমস্তর জন্য একটা সংশ্লিষ্ট ভাবও থাকে। এটা হল সবিতর্ক সমাপত্তি। তারপর ধরা যাক কোনো একটা ইন্দ্রিয়কে নিয়ে চিত্ত সমাপন্ন হল। যেমন শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির সুরে চিত্ত আকৃষ্ট হল। তখন সব ভুলে শব্দেতে চিত্ত লয় হল। এই যে বিশুদ্ধ শব্দজ্ঞান, অর্থাৎ শব্দতন্মাত্র জ্ঞান, এটাকে আশ্রয় করে যে তন্ময়তা এটাকে বলা হবে সবিচার সমাপত্তি। এর মাঝেও আমাদের চেতনার একটা বাইরের দিকে প্রবৃত্তি থাকে। এজন্য এ দুটোকে বলা হয় গ্রাহ্য সমাপত্তি। একটাতে স্থূল বিষয়কে গ্রাহ্য করা হচ্ছে, আর একটাতে সূক্ষ্ম বিষয়কে গ্রাহ্য করা হচ্ছে। সূক্ষ্ম বিষয়কে যখন গ্রাহ্য করি তখন ব্যামিশ্রভাব কেটে যায় বলে বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। আসক্তি কেটে যায়। এই শ্লোকটিকে সেই সবিচার সমাপত্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। ইন্দ্রিয়গুলি পৃথক পৃথক ভাবে উৎপন্ন হয়েছে। তাদের সত্তাও পৃথক, ভাবও পৃথক। যদি তাদের পার্থক্যের উপরে সংযম করি, চিত্তকে নিবিষ্ট করি এবং তাদের উদয় ও অস্ত দুটোকেই দেখি তাহলে আত্মজ্ঞান সম্ভব হয়। যদি আমরা চৈতন্যের দিক থেকে দেখি তাহলে ইন্দ্রিয় উদয় হয় চিত্তসত্ত্ব থেকে। যদি জড়দৃষ্টিতে দেখি তাহলে ইন্দ্রিয় উদয় হয় চিত্তসত্ত্ব থেকে। যদি জড়দৃষ্টিতে দেখি তাহলে উদয় ভূত থেকে। চিত্তসত্ত্ব থেকে ইন্দ্রিয়ের উদয় এ ধরনের ভাবনা যোগশাস্ত্রে রয়েছে। একে বলে প্রত্যাহার। অন্তরের বাসনা, বাসনার যোগে ইন্দ্রিয়ের বিসৃষ্টি, তাইতে কোনো একটা বস্তুকে বা বিষয়কে আমরা গ্রহণ করি। অর্থাৎ এই ইন্দ্রিয়ে বাইরে থেকে বিচিত্র বস্তুর আঘাত এসে পড়ছে। সমস্ত আঘাতকে আমরা গ্রহণ করি না, অর্থাৎ সব বিষয়ে আমরা সচেতন হই না। বিশেষ ধরনের আঘাতকে হয়তো আমরা গ্রহণ করি, বিষয় সম্বন্ধে সচেতন হই। মনে হয়, আমাদের ভিতরে যে বাসনা রয়েছে সে বাসনার সংস্কারে উদ্বুদ্ধ হই। যেমন ঘরের ভিতরে বসে আমরা কথা বলছি, বাইরে থেকে আওয়াজ আসছে কিন্তু সেগুলি খেয়ালে আনছি না। একটা বিশেষ আওয়াজের প্রতি চিত্তকে নিবদ্ধ রাখছি। এটা হচ্ছে বাসনাবশত। এটাই হল চেতনার selectivity, selection। অনেক কিছু আঘাত থেকে একটা কিছুকে বেছে নেওয়া, যেদিকে তার চিত্তের প্রবণতা রয়েছে সেই অনুযায়ী বিষয়কে বেছে নেওয়া।

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বিষয়ের যে প্রবর্তনা সেটা আসে চিত্তসত্ত্ব থেকে। আমার যেরকম বুদ্ধি সেই অনুযায়ী আমি ইন্দ্রিয়কে ব্যবহার করি। ইন্দ্রিয় অনুভবে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান চিরস্থায়ী হয় না। সে জ্ঞান আবার লয় হয়ে যায়। কোথায় লয় হয়? তাঁরা বলবেন, এই চিত্তসত্ত্বেতেই লয় হয়। তাতে প্রমাণ হচ্ছে, চিত্তসত্ত্ব থেকে যেমন প্রবর্তনা আসছে তেমনি আবার চিত্তসত্ত্বেই লয় হচ্ছে। এই ভাবনা যদি করা যায় তাহলে আত্মজ্ঞানের উদয় হয়।

এখানে যোগসাধনার সঙ্কেত পাওয়া যায়। একটা হচ্ছে ব্যামিশ্র ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে শুদ্ধ করা, আর একটা হচ্ছে তার উদয়-অস্তকে প্রত্যক্ষ করা। উদয়-অস্তকে যদি আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি তাহলে এই পৃথক করা সহজ হয়। এই হল আত্মজ্ঞানলাভের অথবা বিশুদ্ধ চৈতন্য লাভের একটা উপায়।

৭।। এই শ্লোক দুটিতে (৭ ও ৮) যে ভাব রয়েছে তার কথা আগেই বলা হয়েছে (১।৩।১০-১১) পাঠটা একটু আলাদা। আগেরটাতে ছিল 'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা অর্থাঃ' বস্তুজগতের আর ভাবজগতের সম্পর্ক বোঝানো হয়েছিল। এখন এখানে সেই ধারাটাকে বলা হয়েছে সাধনার দৃষ্টি থেকে। প্রথম বলা হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের থেকে শ্রেষ্ঠ হল মন। একথাটা আগেও বলা হয়েছে 'যচ্ছেদ্ বাঙ্ মনসি প্রাজ্ঞঃ' (১।৩।১৩)। সেখানে বাক্‌কে মনে নিয়ত করবার কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে মনেই পর্যবসিত করতে হবে। বাইরে থেকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যে সমস্ত বিষয়কে গ্রহণ করি তারা মনের মাঝে ভাবরূপে থেকে যায়। সে ভাবরূপকেই যদি আমরা প্রধান করি, চেতনাকে যদি বস্তুনির্ভর না করি, তাহলে ইন্দ্রিয় থেকে যে মন শ্রেষ্ঠ সে ভাবটা আমাদের মাঝে ভাল করে বসে যায়। এটাই হচ্ছে অন্তর্মুখ থাকা, ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা যে বিষয়কে গ্রহণ করছি সে ব্যাপারে কতকটা তটস্থ থাকা। তারপর মনের মাঝে বিষয়গুলি এসে বিশেষ থেকে সামান্যরূপ গ্রহণ করে। সে সামান্য চেতনাকে এখানে বলা হয়েছে **সত্ত্ব**। সে হচ্ছে বুদ্ধি। বুদ্ধি আর সত্ত্ব একই কথা। বুদ্ধি বোঝাচ্ছে একটা বোধ awareness। সেটা কোনো বিষয়ের নয়, বস্তুর নয়, ভাবের। আর সত্ত্ব বলতে বস্তুত বোঝায় একটা essence। সাংখ্যে তিনটি গুণের কথা বলা হয়েছে—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। তার মাঝে তমঃ হচ্ছে আবরণশক্তি। রজঃ হচ্ছে সে আবরণকে বিদীর্ণ করে জ্ঞানের যে প্রথম প্রকাশ। আর সত্ত্ব হল সে বস্তুর অন্তর্নিহিত যে তত্ত্ব, যার উপর তার সত্তা নির্ভর করে। আর এই সত্ত্বের সঙ্গে যখন আমাদের চেতনার যোগ হয় তখন সেটা আমাদের চেতনার সঙ্গে একাকার হয়ে যায়, একটা তাদাত্ম্যবোধ বা জ্ঞান। কোনো বস্তুকে যখন আমরা সত্ত্বের দিক থেকে জানি তখন তার সঙ্গে এক হয়ে যাই, একটা তন্ময়তা। এদিক থেকে যে জ্ঞানের একটা চতুর্থভূমি পাওয়া যায় তাকে বলা হয় সত্ত্বাপত্তি। সমস্ত জ্ঞানের মাঝেই খানিকটা তাদাত্ম্যভাব থাকে। আমরা বিষয়কে তখনই ভাল করে জানি যখন তার সঙ্গে মিশে যাই। বিষয় যখন আমাদের চেতনাতে একটা তরঙ্গ তোলে সে তরঙ্গটা ধরে তাতেই যদি অন্তরাবৃত্ত হই, তাহলে এক দিক থেকে যেমন আমরা নিজেকে গভীরভাবে জানি, অন্যদিক থেকে বিষয়কেও অন্তরঙ্গ করে জানি। এমনি করে চেতনার কুহরে বা গভীরে যে বিষয় এবং বিষয়ী একাকার হয়ে যায়, সত্ত্ব বলতে তাকেই বোঝায়।

এই সত্ত্বটা হচ্ছে সমস্ত অস্তিত্বেরই এমন একটা সন্ধি যেখানে বিষয় এবং বিষয়ী মিশে যায়। দর্শনে যেটাকে আমরা বলি ভাববাদ idealism, তার মূল হচ্ছে এই সত্ত্বাপত্তি।

বিষয়কে যদি কেবল বাইরেই রাখি এবং বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর পার্থক্যকে বড় করে দেখি তাহলে সেটা হবে সমস্ত materialistic বস্তুবাদী চিন্তার উৎস। কিন্তু যদি বিষয়কে আমি আত্মবোধ দ্বারা গ্রহণ করি অর্থাৎ বিষয় থেকে আমার চেতনার যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে সে পরিবর্তনটাকে লক্ষ করি, করে প্রত্যাহার দিয়ে ক্রমশ ভিতরের দিকে ঢুকে যাই, তাহলে ভাবনার যে ধারা প্রবর্তিত হবে সেটা হবে idealism ভাববাদ। এই ভাববাদের গোড়াতেই দেখা দেয় বোধি, যাকে আমরা বুদ্ধি বলি। বোধিটা হচ্ছে একটা প্রত্যক্ষ অনুভব কিন্তু আন্তর অনুভব। সেটা যখন বাইরে প্রতিক্ষিপ্ত হয় তখন সেটাকে বলা যেতে পারে বুদ্ধি। সত্ত্বের দুটি বৃত্তিই সম্ভব, একদিকে বুদ্ধি আর একদিকে বোধি। এখানে বুদ্ধি কথাটা ব্যবহার করা হচ্ছে। দর্শনে মহৎ বলা হয়েছে। কিন্তু কঠোপনিষদে বুদ্ধি বলতে বোধি বোঝানো হয়েছে। সেই সত্ত্বে কিংবা সে বোধে থাকা, সহজ কথায় বাইরের যে বিষয় তাকে আত্মসাৎ করা। বাইরের বিষয়ই শেষে আত্মচৈতন্যের মাঝে নিমজ্জিত হয়ে গেল, এবং সে বিষয়জ্ঞানেরও অতীত একটা সত্তার বোধ আমার মাঝে জাগরুক থাকবে, এইভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা—এটিই হল সত্ত্বাপত্তি। আমাদের ইন্দ্রিয় থেকে যেতে হবে মনে, অর্থাৎ অন্তর্মুখ হতে হবে, অন্তর্জগতে থাকতে হবে। আর সেই মন থেকে আমাদের যেতে হবে ঐ সত্ত্বে; এ ধারাটা হল বাইরের থেকে বিষয়কে আকর্ষণ করে নিজের মাঝে তলিয়ে দেওয়া। সত্ত্ব থেকে বিষয়ের কি করে বিচ্ছুরণ হয় সে কথাটা এখানে আসছে না। অর্থাৎ এখানে ধারাটা হচ্ছে প্রত্যাহার এবং তার থেকে সমাধির দিকে।

ইন্দ্রিয়ের থেকে মন শ্রেষ্ঠ। মন থেকে সত্ত্ব হচ্ছে উত্তম। সত্ত্ব থেকে উত্তম হচ্ছে **মহৎ**। সত্ত্বটাকে আমরা কল্পনা করতে পারি একটা বিন্দুরূপে, যেখানে আত্মবোধ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। ইন্দ্রিয়বৃত্তির ভিতর দিয়ে আমাদের চিত্ত বাইরে ছড়িয়ে পড়ে সেটা সংহত হয়েছে মনে, আর একটা একক মনশ্চেতনা সংহত হয়েছে সত্ত্বে। এই সত্ত্বে থাকলে পরেই আবার চেতনার বিস্ফারণ ঘটে। এখানে যে বিস্ফারণের কথা বলা হচ্ছে সেটা কিন্তু আন্তর বিস্ফারণ, ভিতরের বিস্ফারণ। এ বিস্ফারণটা বাইরেও ঘটতে পারে। তার কথা আছে গীতাতে। সেখানে process একটু আলাদা। বলা হচ্ছে, নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্—যার মাঝে দ্বন্দ্ব নেই, যেমন রাগদ্বেষ, শুভাশুভ, জয় পরাজয় ইত্যাদি—সে নিত্যসত্ত্বে স্থিত হয়। এই নিত্যসত্ত্ব আর এখানে যাকে সত্ত্ব বলা হয়েছে দুটো একই এবং নিত্যসত্ত্বে স্থিত হলে সে 'নির্যোগক্ষেম' হয়। বাহ্য ব্যাপারে সে তখনও দ্রষ্টা এবং ভোক্তা থাকে কিন্তু তার সে থাকাটা হচ্ছে উদাসীন হয়ে। এইভাবে নিত্যসত্ত্বস্থ থাকা অর্থাৎ বাইরের জগৎকে আমার আত্মকেন্দ্র থেকে দেখা অথচ তার সম্পর্কে চিত্তে একটা তটস্থভাব, এইটাকে বলা হয়েছে 'আত্মবান্' হওয়া। এখানে যে ধারাটা দেওয়া হয়েছে সেটা অন্তর্মুখীনতা। সত্ত্ব থেকে যে মহতের অভিব্যক্তি হয় সেটা হচ্ছে অন্তরের চেতনার একটা বিস্ফারণ। এই যে বিস্ফারণ, সেটাও থাকে না, মিলিয়ে যায়। একথাটা আগেও বলা হয়েছে। যে কোনো বিরাট অধ্যাত্ম অনুভূতি যার মাঝে একটা ব্যাপ্তি রয়েছে, তীক্ষ্ণতা রয়েছে, তার যদি পুনরাবৃত্তি হয় তখন ক্রমশ তার আভা মিলিয়ে যেতে থাকে। যেমন মধ্যদিনের সূর্যের আভা ক্রমশ ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু তবু একটা বোধ থাকে। সে বোধটাকে এখানে বলা হয়েছে **অব্যক্ত**। সাংখ্যে যে জড় প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলা হয়েছে, এ অব্যক্ত সে অব্যক্ত নয়। এটা বোধের অব্যক্ত। এই অব্যক্তের বোধই আনন্দের বোধ। এই যে

আনন্দের বোধ তাকে অবলম্বন করে বিশুদ্ধ পৌরুষ-চেতনার উদ্ভব হয়। সেই চেতনা নির্বিকল্প, নির্বিশেষ। এক হিসেবে বলা যেতে পারে শুধু অস্তিতার বোধ। একথাটা আসবে। সেই অস্তিতার বোধ নিয়ে আবার যখন যোগী ফিরে আসেন ব্যুত্থানে, তখন তাঁর কাছে বিস্ময়কর কিছুই থাকে না। এই একটা লক্ষণ দেখা দেয়, যেন সবই তাঁর জানা, সবই দেখা, সবই হয়ে আছে। এই কথাটাকেই পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রে বলেছেন যে এ অবস্থাতে জ্ঞান হয় অনন্ত, জ্ঞেয় হয় অল্প। সেইজন্যই আমাদের মাঝে জিজ্ঞাসা জাগে। আমরা বিষয়কে বাইরে রেখে জানবার চেষ্টা করি, কিন্তু কূলকিনারা পাই না। ধারাটা যখন উল্টে যায়, তখন সমস্ত প্রকৃতির মর্মরহস্য এমনভাবে অধিগত হয় যে জানবার যেন আর কিছুই থাকে না। কোনো কিছুই তখন কোনো একটা ক্ষোভ বা বিস্ময় জাগায় না। এই অবস্থাকেই আগে বলা হয়েছে শান্তি। এখন এটাকে বলা হবে বিশুদ্ধ অস্তিত্বের বোধ। এই যে অস্তিত্ব, এটা কোনো ব্যক্তিগত অস্তিত্ব নয়, সমস্ত বিশ্বের মর্মে যে অস্তিত্ব রয়েছে, যাতে বিশ্ব বিধৃত, বৈষ্ণবেরা যাকে বলেছেন সন্ধিনী শক্তি, তারই বোধ। অর্থাৎ একটা ব্যক্তিত্ববোধের সঙ্গে যুক্ত থাকে একটা ব্যাপ্তি এবং আনন্ত্য এই দুইয়ের বোধ। এটাকে বলা হয়েছে **মহান** এবং **অব্যক্ত**। সেই মহান ও অব্যক্তকে অবলম্বন করে শুদ্ধ অস্তিত্বের যে বোধ সেই **আত্মা**।

৮।। এখানে আত্মার একটা লক্ষণ দেওয়া হয়েছে যেটা আগের শ্লোকে পাইনি। বলা হয়েছে অব্যক্ত থেকে পরতর তত্ত্ব হচ্ছে সেই আত্মা **পুরুষ**। সে **ব্যাপক**, সে **অলিঙ্গ**। আত্মার এই ব্যাপক বিশেষণ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে, মহান আত্মার যে অনুভব, ব্যাপ্তিচৈতন্যের যে অনুভব তার একটা সংস্কার এই শুদ্ধচৈতন্যে থাকে। আর অলিঙ্গ দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে অব্যক্তের যে অনুভব তারও সংস্কার এর মাঝে থাকে। লিঙ্গ অর্থ হচ্ছে চিহ্ন, নির্দেশক। যেমন আগুনের লিঙ্গ হল ধূম। ধোঁয়া দেখলে তখন বুঝি যে আগুন আছে। তাহলে আগুনের যা বিভূতি, তার থেকে যা বেরিয়ে আসছে সেটা হল তার প্রমাপক, তার চিহ্ন, তার নির্দেশক। প্রকৃতির অব্যক্ত হচ্ছে সেই ভাব যার মাঝে সমস্ত কিছু অবসিত হয়েছে, সব কিছুর পর্যবসান হয়েছে। সেখান থেকেই সব কিছু বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু যখন আমরা অন্তরাবৃত্তির ধারা ধরে চলি তখন সব কিছুই দেখি তাতে প্রলীন হয়। অতএব বাইরে সে অব্যক্তকে চিনবার বা ধরবার কোনো কিছুই থাকে না, এইজন্য তাকে বলা হয় অলিঙ্গ। এই যে অলিঙ্গ এটা হচ্ছে আমাদের যেসব positive experience বা ইতিভাব, তার চারিদিকে নেতির একটা বিপুল বিস্তার। আমাদের যে কোনো অনুভূতির চারিদিকে এরকম একটা বিস্তার রয়েছে। বিষয়কে জানতে গিয়ে আমরা তার সব কিছুকে জানতে পারি না। শুধু একটা অংশকে জানি, একটা দিককে জানি এবং সেই সঙ্গে অনুভব করি যে জানবার অনেক কিছুই রয়ে গেল। এটা হচ্ছে অবিদ্যার দিক থেকে যখন আমরা জানি। যখন বিদ্যার দিক থেকে জানি, তখন একটা বিশেষ জ্ঞান এবং তাকে ঘিরে যে নির্বিশেষ জ্ঞান দুটোর যুগপৎ প্রতীতি হয়। আর সে নির্বিশেষের একটা প্রত্যক্ষ হয় যেটা মনোগত। এই প্রত্যক্ষটাই হচ্ছে বোধের তত্ত্ব। এটি হচ্ছে এই ব্যাপক এবং অব্যক্তের জ্ঞান, এখানে যেটাকে বলা হয়েছে অলিঙ্গজ্ঞান। সেটাই হল যাথাত্ম্যবোধ। এই আত্মবোধ হলে পর মৃত্যু থাকে না। মৃত্যু যদি থাকে তাহলে জন্মও আছে, জন্মমৃত্যুর পুনরাবৃত্তিও আছে। কিন্তু যখন সর্বব্যাপী অব্যক্ত একটা সত্তায় চেতনা মিশে যায় তখন এই পুনরাবৃত্তি থাকে না। তিনি থাকেন না, অথচ থাকেন, যে কথাটা আগের একটা শ্লোকে

বলা হয়েছিল, সে বোধ জন্মালে পর সৃষ্টিতে যে লোকসংস্থান রয়েছে তার সঙ্গে চেতনা একাকার হয়ে যায়। সেটা ছিল ইতিভাবের কথা। এখানে বলা হয়েছে নেতির দিক থেকে, যখন জন্মমৃত্যুর আবর্তন থাকে না। এই যে লোকোত্তর ভূমি, তাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, আবার সেই আবর্তনটা দেখা দেয়। কিন্তু দেখা দেয় এই লোকোত্তর ভূমির নিচে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে একটি উপমা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে একজন যদি একটা গাড়ির উপর চড়ে চলতে থাকে, তাহলে সে উপর থেকে দেখতে পায় তার দুদিকে চাকা ঘুরছে, তেমনি যে সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়—সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা সেখানে বলা হয়নি, বলা হয়েছে সূর্যমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত হয়—সে তেমনি তার নিচে দিনরাত্রির আবর্তনকে দেখতে পায়। এটা symbolical language রূপকের ভাষায় বলা। দিনরাত্রির আবর্তন হচ্ছে জন্ম মৃত্যুর আবর্তন। পৃথিবীতে যতক্ষণ আছি ততক্ষণ পর্যন্ত এই দিনরাত্রির আবর্তনটা আছে, আলোর পর আঁধার। আঁধারের পর আবার আলো, আবার আঁধার, এরকম করে চলতে থাকে। কিন্তু যদি সূর্যমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত হই তখন সেখানে শুধুই আলো, আলোর পর আঁধার—এটা নেই, অতএব মৃত্যু নেই। এটাই অমৃতত্ব। সেই অমৃতত্বের ভূমি থেকে আবার দেখি এই মৃত্যুগ্রস্ত সংসারকে।

৯।। এখানে বলছেন অরূপের কথা। **সন্দৃক** কথাটা ঋগ্বেদে আছে। সম্যক্ দর্শন Integral vision হয় তখনই যখন কোনো একটা তত্ত্বকে পরিপূর্ণরূপে জানছি। এই সম্যক্ দর্শন যখন হয়, তখন কোনো রূপ থাকে না। এটা হল নেতিবাদের দিক থেকে যখন বলা হচ্ছে। ইতিবাদের দিক থেকে বলব, সব রূপই থাকে। তিনি যেমন অরূপ, তেমনি তিনি বিশ্বরূপ। আর একধাপ এগিয়ে গেলে বলতে পারি যে তিনি আবার ব্যক্তিরূপও। এখানে বিশ্বরূপ আর ব্যক্তিরূপ, এই দুটিকেই বাদ দিয়ে অরূপের কথা বলা হচ্ছে। সেটা হচ্ছে সম্যক্ দর্শন। সম্যক্ দর্শন এইভাবে যে ঐ অরূপই আবার বিশ্বরূপের উৎস—এই উপলব্ধি। অরূপের মাঝেই সেই বিশ্বরূপকে আমরা দেখছি। নির্বিশেষ তত্ত্বরূপ, একটা অব্যক্ত শক্তিরূপ, যেটাকে আমরা বলছি শূন্য, সেটা বস্তুত শূন্য নয়। যেমন আমাদের সুষুপ্তি। উপনিষদের কোথাও কোথাও রয়েছে যে সুষুপ্তিতে বাইরের যত কিছু, অর্থাৎ যা আমরা বাইরে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছিলাম, সে সমস্ত তাদের উৎসের মাঝে গিয়ে অন্তর্লীন হয়ে যায়। উপনিষদের এক জায়গায় এমন বর্ণনাও রয়েছে যে সে পরমচেতনা সমুদ্রের মতো। পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সবদিক থেকে নদীর ধারা এসে সে পরমচেতনার মাঝে লয় হয়ে যাচ্ছে, সব জলই এক জল হয়ে যাচ্ছে। নদীগুলিকে আলাদা রূপে চিনতে পারা যাচ্ছে না। তেমনি করে সমস্ত বিশেষ নির্বিশেষে রূপান্তরিত হয়। তখন বিশেষ কোনো রূপ থাকে না। এজন্য তাকে বলা হয়েছে অরূপ। অথচ রূপায়ণের শক্তি তার থাকে। বৌদ্ধদের শূন্যবাদে ঠিক এই কথাই বলা হয়েছে। শূন্যকে তাঁরা নিঃশক্তিক মনে করতেন না বরং তাঁরা বলতেন যে logically দেখতে গেলে যদি শূন্যকে তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত না করি তাহলে সৃষ্টিকেও আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না। যা কিছু হচ্ছে সে শূন্যেতেই। রূপের আবির্ভাব অরূপ থেকে। যেখানে মন নেই, সেখান থেকে মন আসছে। যেখানে শব্দ নেই, সেখান থেকে শব্দ আসছে। অব্যক্ত থেকে সব কিছুর অভিব্যক্তি হচ্ছে।

তাহলে সেই অব্যক্তকে আমরা জানছি শুদ্ধ শক্তিরূপে এবং সেই শক্তি অনির্বচনীয়। অনির্বচনীয় বলতে শঙ্করের সদসৎ-এর উর্ধ্বে কোনো অনির্বচনীয়ের কথা

বলছি না। যার কোনো নির্বচন, কোনো definition সম্ভব নয় অথচ যার সত্তা আছে। এই যে সত্তার শক্তি এর বোধটাই হচ্ছে অরূপ। তখন বলা চলে যে সম্যক্‌দর্শনে কোনো রূপ থাকছে না। এটাকে আরও পরিষ্কার করে বলছেন যে, আমার চোখ যখন একটা বিষয়কে দেখে, তখন সেটাকে যেমন আমাদের সামনে দেখি, আমাদের থেকে আলাদা করে দেখি, সেখানে সেরকম কোনো দর্শন সম্ভব নয়। **ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্‌**, চোখ দিয়ে দেখা যায় না অথচ দর্শন হয়। চোখ দিয়ে দেখা সেটা হল প্রবৃত্তি, বিষয়ের দিকে ঝুঁকে পড়া, সামনের দিকে আকর্ষিত হওয়া। আর যদি আবৃত্তচক্ষু হয়ে দেখা যায় তাহলে সমস্ত দৃষ্টিটা যেন নিবৃত্তির দিকে গভীরে তলিয়ে যায়। সেখানে রূপের অবসান, অথচ তাই রূপের উৎস। তাকে দেখা যায়, কিন্তু চোখ দিয়ে বাহ্য বস্তুকে objectকে দেখার মতো দেখা যায় না। তাহলে আমরা বলতে পারি সে দেখাটা একটা বোধমাত্র, যে-বোধ সর্বব্যাপী, অনন্ত, নির্বিশেষ, 'ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ'। এখন এ বোধ আমরা কী করে পেতে পারি?

এখানে তিনটি সাধনার কথা বলা হচ্ছে। মন, মনীষা আর হৃদয়। এই তিনটি সাধনার কথা ঠিক এইভাবেই ঋগ্বেদেও আছে। প্রথম জানা মন দিয়ে, তারপর মনীষা দিয়ে, তারপর হৃদয় দিয়ে। আবার হৃদয় দিয়ে যেমন শেষে জানা, তেমনি হৃদয় দিয়েও আবার শুরু করা যেতে পারে। হৃদয় দিয়ে যে জানা সেটা আদিতেও আছে, অন্তেও আছে। অথবা বলা যেতে পারে সমস্তটা হৃদয় দিয়ে জানা, এটাই সম্যক্‌ দর্শন। হৃদয় দিয়ে যে জানা সেটা হল শ্রদ্ধার জানা। যেটা এই উপনিষদের গোড়াতেই বলা হয়েছে। নচিকেতার মধ্যে শ্রদ্ধা আবিষ্ট হল। যে জানত না তার মাঝে এল শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধাই তাকে জানিয়ে দিল। মনের দিক থেকে দেখতে গেলে সেটা অসম্পূর্ণ হবে, কিন্তু হৃদয়ের দিক থেকে যদি দেখি তাহলে সম্পূর্ণ, যদিও সেটা আভাসে। এই শ্রদ্ধা থেকে সেটা প্রত্যয়ে রূপান্তরিত হয় মনের ভিতর দিয়ে, মনীষার ভিতর দিয়ে। উপনিষদের অন্যত্র রয়েছে 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ'। আত্মাকে দর্শন করতে হবে, শুনতে হবে, মনন করতে হবে, নিদিধ্যাসন করতে হবে। এই যে প্রথম শোনা এই শোনাই যদি প্রত্যয়রূপে জ্বলে ওঠে, তাহলে আর মনন, নিদিধ্যাসনের দরকার হয় না। তখন শ্রবণ থেকেই দর্শন। একেই পরে বেদান্তে বলা হয়েছে উত্তম অধিকারী। রামকৃষ্ণদেব তার উপমা দিয়েছেন শুকনো দেশলাই। এটাতে ঘষতে হয় না, সামান্য একটু স্পর্শেই দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে। যদি তা না হয়, তাহলে শ্রদ্ধা অন্যান্য সাধনের অপেক্ষা রাখে। প্রথম সাধন হল মন, যা বিচার করে। বিচার শব্দের একটা পারিভাষিক অর্থ আছে। বিশেষ থেকে সামান্য পৌঁছানো। যখন বিশেষকে সামান্যের অধীনরূপে দেখি তখন সেটা হচ্ছে বিতর্ক। যেমন একটা গাছ দেখছি, সঙ্গে সঙ্গে আমার জ্ঞান হচ্ছে যে গাছের একটা সাধারণ ধর্ম রয়েছে যাকে বলে বৃক্ষত্ব। এই সাধারণ ধর্মটাকে চেতনার পিছনে রেখে যখন বিশেষকে, বিশেষ গাছটিকে দেখছি, তখন তার সম্পর্কে আমরা যে-সমস্ত judgement pass করব, এগুলি হবে বিতর্ক। কিন্তু যখন এই বিশেষ গাছটি থাকবে না, তখন সে হবে মাত্র উদ্বোধক। যখন তার থেকে সোজাসুজি ঐ বৃক্ষত্বে পৌঁছে যাব, সামান্য পৌঁছে যাব এবং তাকে অবলম্বন করেই চিত্তবৃত্তির প্রবর্তন চলবে, তখন সেটাকে বলে বিচার।

সমাপত্তির দুটি রূপের কথা বলেছিলাম। একটি সবিতর্ক, আর একটি সবিচার। সবিচার সমাপত্তি যেখানে, সেখানে চিত্ত universal-কে নিয়ে, সামান্যকে নিয়ে deal

করে; সেখানে বিশেষ পর্যবসিত হয় সামান্যে। এই সামান্য ভাব-সামান্য। এই যে বিচারের ভূমি তাকে আমরা বলতে পারি, সত্ত্ব কিংবা বিজ্ঞান কিংবা স্মৃতি, বুদ্ধি, বোধি ইত্যাদি। এই যে মন দিয়ে একটা মনন করছি তখন বিশেষের সঙ্গে সামান্যের একটা যোগ থাকছে, কিন্তু গতিটা থাকছে বিশেষের দিকে। তখন কোনো একটা বিশেষ সম্বন্ধে আমরা নানারকম judgement pass করতে পারি; ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা দিক থেকে দেখতে পারি, এটা হচ্ছে সেই মননের অবস্থা। এই মননে সংশয়নিবৃত্তি হয়। একটা জিনিসের যে নানাদিক রয়েছে সেগুলি ক্রমশই একটা বিন্দুতে বা কেন্দ্রে সংহত হয়। তার ফলেই বিচারের উদয় হয়। বিচার যখন জাগে তখন চিত্ত আশ্রয় করে ভাব-সামান্যকে। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে কোনো একটা moodকে ভাবকে সে আশ্রয় করে। হৃদয়ের যে ক্রিয়া সেটা সর্বত্র অনুস্যূত থাকে এবং মননের মাঝে একটা বিক্ষেপ থাকলেও, বিতর্কে একটা বিক্ষেপ থাকলেও, বিচারে কোনো বিক্ষেপ থাকে না। সেটা একটা ব্যাপক mood বা ভাব যেটা চিত্তকে অধিকার করে। এই বিচারের যখন উদয় হয় তখন স্বভাবতই চিত্ত স্থির হয়ে আসে। তখন নিজের চিত্তের যে প্রবৃত্তি তাকে বলে নিদিধ্যাসন। শব্দটার অর্থ খুব গভীরে তলিয়ে গিয়ে ধ্যান করবার ইচ্ছা। বিচারটাই তাহলে হবে তলিয়ে যাবার ভূমিকা। একদিকে মনন, আর একদিকে ধ্যান, দুইয়ের মাঝে হচ্ছে বিচার। যখন এই ধ্যান প্রবর্তিত হয়, তখন হয় মনীষার উদ্ভব। **মনীষা** শব্দের ভিতর দুটি ধাতু একসঙ্গে আছে, মন্ আর ইষ্। মন্ ধাতুর অর্থ মনন করা আর ইষ্ ধাতুর অর্থ হল একটা কিছু উথলে ওঠা, কোনো কিছুর ঊর্ধ্বগতি হওয়া upsurge। তাহলে মনীষা হচ্ছে মনের একটা upsurge। মন যেন দপ্ করে জ্বলে ওঠে। রামকৃষ্ণদেবের সামনে কোনো একটা আধ্যাত্মিক অনুভূতি নিয়ে তার বিবৃতি করা হচ্ছিল, সে এমনি করে আসে, এমনি করে হয়। তিনি বাধা দিয়ে বলেছিলেন, 'নাগো তোমরা যা বলছ, তা নয়। সেটা দপ্ করে জ্বলে ওঠে।' এই যে দপ্ করে জ্বলে ওঠা এইটাই হচ্ছে মনীষা। সাধারণভাবে তাকে বলতে পারি flash of intuition। মনন তার ভূমিকা তৈরি করে, তারপর সংশয়-নিবৃত্তিতে সত্য প্রকাশ হয়। সে প্রকাশের অবশ্য তারতম্য রয়েছে। মনীষারও তারতম্য রয়েছে। কিন্তু স্থূল যে তত্ত্ব principle সে একই। এখানে সত্যকে জানবার চেষ্টা থাকে না, সত্যই নিজেকে জানিয়ে দেয়। আর এই যে নিজেই নিজেকে জানিয়ে দেয় তাতেই সমস্ত চিত্তকে সে অধিকার করে। একটা আবেশ হয়। সে আবেশে সত্য আধারে সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হয়, তাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন তার পরের অবস্থা আসে, হৃদয় দিয়ে জানা। এটা বোধ নয়, হওয়া। সবকিছু দিয়ে হওয়া। এই হৃদয়ের অনুবৃত্তি, এই ধারাটা সর্বত্রই ছিল, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। হৃদয়ের ভিতরে যে প্রবৃত্তি সেটা শ্রদ্ধারূপে দেখা দিয়েছিল, সেটাই মননকে আশ্রয় দিয়েছে, সেটাই নিদিধ্যাসনকে প্রবর্তিত করেছে এবং শেষ পর্যন্ত সেটাই আবার চেতনার সমস্ত ভূমিকে অধিকার করেছে। এটাকে বলা হয় **অভিক্লৃপ্তি**। ক্লৃপ্ ধাতুর অর্থ হচ্ছে সম্পদ্যমানতা, একটা কিছু হওয়া। এখানে রূপটাকে আমরা দেখছি। একই রূপ, সমাপত্তিতে যে রূপ, সম্পদ্যমান তত্ত্বেও সেইরূপ। সম্ পূর্বক পদ্ ধাতুটা উপনিষদে, বিশেষত প্রাচীন উপনিষদে, অনেক জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। 'সতা সম্পদ্যতে', সতের সঙ্গে সম্পন্ন হওয়া, সম্পন্ন হয় মানে সম হয়ে যায়, তাতে রূপান্তরিত হয়। তাহলে **ক্লৃপ্** কথাটার অর্থ হতে পারে রূপান্তর। মীমাংসকরা এটাকে বলতেন ভাবন, একটা কিছু

হওয়া। এই ক্লৃপ্ ধাতু থেকে আর একটা অর্থ হতে পারে, কল্পনা। কল্পনা বলতে আমরা বুঝি imaginary, অতএব unreal, অবাস্তব একটা কিছু। কিন্তু ভাবের জগতে কল্পনাই হচ্ছে আসল। এই ক্লৃপ্ ধাতুর ব্যবহার ঋগ্বেদেও রয়েছে, 'যথাপূর্বম্ অকল্পয়ৎ'—সেটা হচ্ছে সৃষ্টির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা যে এই যে সৃষ্টি এটা কল্পিত হয়েছে। এখানে imagination কথাটা খাটে না। কল্পিত হয়েছে মানে এটাকে করা হয়েছে, এটাকে রূপ দেওয়া হয়েছে কিন্তু ভাবের জগতে। কেমন করে? না, যথাপূর্বম্। পূর্বে যেমন করে দেওয়া হয়েছিল, এখন ঠিক তেমনি করে দেওয়া হয়েছে। এটা থেকে আর একটা শব্দ আমরা পাই, পারিভাষিক শব্দ, যেটাকে বলে কল্প। পুরাকল্প। কল্প হচ্ছে একটা universal duration, সামূহিক স্থিতিকাল, একটা বিশেষ গঠনশৈলী, ছাঁচ বা pattern নিয়ে। এক একটা কল্পের মাঝে একটা নিয়মমাফিক ভাব থাকে। সেই ভাবটিই নির্দিষ্ট একটা কাল পর্যন্ত সমস্ত বিশ্বকে শাসন করে। এক এক কল্পের অধিষ্ঠাতা এক একজন ব্রহ্মা। তার মাঝে পরমপুরুষের বিশেষ কোনো একটা ইচ্ছা, একটা সঙ্কল্প, একটা কাম, তাঁর will বীজরূপে নিহিত থাকে। এই বীজ যে পর্যন্ত অঙ্কুরিত না হয়, সে পর্যন্ত এই বিশ্বের ব্যাপার, ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপার চলতে থাকে। প্রথম থেকে তার পরিপূর্ণ স্ফুরণ পর্যন্ত যে কাল, তাই হল কল্প। তাহলে কল্প কথাটার অর্থ হচ্ছে কোনো একটা বীজ-ভাবনার স্ফুরণ। অভিক্লৃপ্তি ঠিক তাই। আমাদের মাঝে আত্মভাব বীজ আকারে যা রয়েছে, সেইটাই হৃদয়ের স্পর্শে মননের সাহায্যে এবং মনীষার সাহায্যে অভিক্লৃপ্ত হয়, অর্থাৎ সেই বীজটা বনস্পতিতে রূপান্তরিত হয়। আর রূপান্তরকরণের শেষ পর্বে সমস্ত কিছু হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়। হৃদয়ের সঙ্গে চেতনার এবং আনন্দের একটা যোগ আছে। আনন্দ যেখানে অস্ফুট কিন্তু চেতনার ক্রিয়া স্ফুট, সেখানে আছে মন এবং মনীষা। তাতে যা জানা যায়, তাতে যেন একটু অস্পষ্টতা থাকে, একটু দূর দূর ভাব থাকে। সেই জানা যখন গভীর হয় তখন আমরা পাই জানার আনন্দকে। এটি হচ্ছে হৃদয়ের অভিক্লৃপ্তি। সেজন্য সাধনার গোড়াতেই হৃদয়কে আশ্রয় করতে হয়। সে হচ্ছে শ্রদ্ধার আশ্রয়। শ্রদ্ধাগুণ, সে যেন নচিকেতার স্বভাবধর্ম। এখনকার ভাষায় আমরা যাকে বলি Psychic being তার ধর্ম। পরমতত্ত্বের দিকে আমাদের যে অভিযান, তাতে যদি এই শ্রদ্ধাকে অবলম্বন করি, heart petals দিয়ে, হৃদয় দিয়ে তাঁকে গ্রহণ করি বরণ করি, তারপর সে পাওয়া সম্পূর্ণ হয় হৃদয় দিয়ে। তাই এখানে বলা হল যে মন দিয়ে, মনীষা দিয়ে, হৃদয় দিয়ে যিনি অভিক্লৃপ্ত হন **য়ে এতদ্ বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি**, যারা তাঁকে জেনেছে তারা অমৃত হয়ে যায়।

তাহলে সমস্ত প্রাপ্তিটাকে আমরা বলতে পারি হৃদয়বৃত্তির একটা অনুশীলন। যে অনুশীলনের মাঝে মনন এবং মনীষা একটা বড় অংশ গ্রহণ করে। তারা সে আনন্দভাবনাকে স্বচ্ছ করে, উদার করে, উজ্জ্বল করে তোলে, তার ব্যাপ্তি ঘটায়। তাই হৃদয় এবং মন—মনের মাঝে মনন এবং মনীষা দুই-ই থাকে—দুইয়ের একটা সামরস্য ঘটে। এটি হচ্ছে পূর্ণবোধ। খুব সহজ করে বলা যেতে পারে যে spiritual experience-এ head and heart united হয়। মন দিয়ে এবং মনীষা দিয়ে যে জানা, তার পর্যবসান স্বাভাবিক রীতিতেই হয় হৃদয় দিয়ে জানাতে। অর্থাৎ গীতার পরে দেখা দেয় ভাগবত। আত্মারাম মুনির মাঝে অহৈতুকী ভক্তির উদয় হয়। অরূপে যাঁকে জেনেছি তাঁকে স্বরূপে জানি। অমানব বলে যাঁকে জেনেছি তাঁকে মানব বলে জানি। এইটাই হল পাওয়ার শেষ কথা।

১০।। আগে যে কথা বলা হয়েছিল, এখানে সেই কথাই আর এক ঢঙে বলা হচ্ছে—ইন্দ্রিয়, তার থেকে মন, তার থেকে বুদ্ধিতে যাওয়া। বুদ্ধির যে নিশ্চল ভাব সেটাই হল যোগ। **পঞ্চ জ্ঞানানি**—জ্ঞান বলতে এখানে ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানকে লক্ষ করা হচ্ছে, sense knowledge। জ্ঞান শব্দটা এই অর্থে অন্যান্য জায়গায়ও ব্যবহার করা হয়েছে, যখন জ্ঞানের সঙ্গে পার্থক্য করা হয় বিজ্ঞান এবং প্রজ্ঞানের। ইন্দ্রিয় দিয়ে যা আমরা জানি, সে জ্ঞান সবারই রয়েছে। যখন ইন্দ্রিয়ের মাঝে একটা বিশেষ বোধ, তার থেকে আমাদের মাঝে একটা সামান্য-বোধ জন্মে সে সামান্য-বোধকে আশ্রয় করে আত্মজ্ঞান জন্মায় তখন তাকে আমরা বলতে পারি যথাক্রমে বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান। সামান্য জ্ঞানটা প্রথম ভাসাভাসা থাকে। কিন্তু চিত্তকে অন্তর্মুখ করে, এই ভাসাভাসা যে সামান্য জ্ঞান, তাকেই যদি আমরা repeat করি, বারবার আসতে দিই, তাহলে সেই সামান্য জ্ঞানকে অবলম্বন করে প্রজ্ঞান বা অন্তর্জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সমস্ত বিষয়ের মূলে একটা সামান্য ভাব রয়েছে, যে কোনো বিষয়ের মূলে এ জ্ঞানটা যখন হয়, তখন আমরা কতকটা আত্মসচেতন হই। তারপর সেই সামান্য জ্ঞানকে অবলম্বন করে যে আত্মসচেতনতার ধারণা জাগে সেই ধারণার ফলে আত্মবোধ উৎপন্ন হয়। তখন আমি যে জানছি সেটা আমি জানি। একটা আলাদা আমির ভাব জাগে। এইটি হল আত্মজ্ঞানের ভূমিকা। এটার সাধনা বৌদ্ধেরা করতেন, আগেই বলেছি। তাঁরা এটাকে নাম দিতেন 'সম্প্রজন্য', awareness। আমার ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে যা কিছু ভাবনা, চিন্তা হচ্ছে, কোনো কিছু আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে না। যখন যা করছি, ভাবছি, হুঁসে করছি, কখনও আত্মহারা হচ্ছি না। এটাকে যদি আমরা সবসময় বহন করে চলতে পারি, তাহলে জ্ঞানের অবস্থান হয়, **অবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি**। একটা হচ্ছে অবস্থান আর একটা হচ্ছে উত্থান। আমরা সাধারণত যাকে বলি প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি, এখানে তাকেই বলা হচ্ছে। উত্থান শব্দটা এখানে নেই, তাহলেও আমরা ধরে নিতে পারি, উত্থান এবং অবস্থান। প্রবৃত্তিতে চিত্ত বাইরের দিকে যায় ভিতর দিকে অন্ধকার থেকে যায়। আর নিবৃত্তিতে বাইরে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও ভিতরে একটা জ্ঞান হতে পারে, সেই জ্ঞান প্রবল হলে বাইরের জ্ঞান তার ভিতরে তলিয়ে যেতে পারে। এই যে তলিয়ে যাওয়া এইটিই হচ্ছে অবস্থান। মিশে যাওয়া। Subconscious mind-এর working (অবচেতন মনের ক্রিয়া) যেটা, তার depth-এ গভীরে যাওয়া। Depth-এ গভীরে যাওয়ার একটা কৌশল আছে। এটা হচ্ছে যে প্রথম আমাদের দেহবোধকে উজ্জীবিত করা। সে কথাটা আগেও বলেছি। পতঞ্জলির যোগের আরম্ভে আসনরূপ যোগাঙ্গ স্থিরসুখমাসনম্ থেকে— যখন আসনে আমার দেহ স্থির হয় তখন সে স্থির দেহের যে একটা সুখময় অনুভূতি হয়—এই অনুভবটাকে আমরা জাগিয়ে তুলতে পারি। এবং এই অনুভবটাকে শরীরের বিশেষ কোনো একটা জায়গায় ধারণা করতে পারি। হৃদয়ে ধারণা করলেই ভাল। এখন হৃদয়ের যে অনুভব সেটা স্বচ্ছ হয়ে, ঘনীভূত হয়ে ক্রমশ যোগীরা যাকে বলেন হার্দজ্যোতি, তাতে পরিণত হয়। কোনো একটা গভীর ভাবে যেরকম হয়। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সারদাদেবী যখন রামকৃষ্ণদেবের কাছে প্রথম এলেন, তাঁর চোদ্দ বছর বয়সে, তিনি কয়েকদিন থেকে চলে গিয়েছিলেন। তারপর সারদাদেবীর সব সময় মনে হতো যেন তাঁর ভিতরে একটি ভরা ঘট। এটা হল হৃদয়ে একটা ভাবের ধারণা উন্মেষিত হওয়া। আর তাই থেকে সে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। এমনি করে ধারণা হৃদয়ে করা যেতে পারে,

ভ্রূমধ্যে করা যেতে পারে, দেহের বাইরেও করা যেতে পারে, মাথার উপরেও করা যেতে পারে। এই চারটিই প্রশস্ত। এই ধারণাতে দেহবোধ ঘনীভূত হয়। ঘনীভূত যে দেহবোধ এটাই আত্মবোধের ভূমিকা। তখন দেহবোধকে আশ্রয় করে একটা ক্ষেত্রভাবের উদয় হয়। গীতাতে আছে ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ। এই ক্ষেত্র কথাটা ঋগ্বেদেও আছে। যতটুকু দেশকে অধিকার করে রয়েছে আমার দেহ, সমস্তটাই একটা ক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্রের সর্বত্রই চৈতন্যের পরিব্যাপ্তি। চৈতন্য ক্ষেত্রের মাঝখানকার কোনো একটা দেশকে আশ্রয় করে ঘনীভূত হয়েছে এবং সেখান থেকে সর্বত্র বিকীর্ণ হয়েছে—এই ভাবই যদি আমাদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে ইন্দ্রিয়ের যে চেষ্টা, তাদের বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়া, তার থেকে যে প্রতিক্রিয়াটা আসে, সেটাকে আমরা সেই ঘনীভাবের মাঝে তলিয়ে দিতে পারি। তখনকার অবস্থার কথা আগেও বলেছি। গীতার একটি শ্লোকে তার সুন্দর বর্ণনা আছে, সেটা হচ্ছে আপূর্যমাণ সমুদ্রের মতো, অচলপ্রতিষ্ঠ। এটাকে হৃদ্যসমুদ্র বলে, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। এই সমুদ্রের মাঝে বাইরের যা কিছু সমস্তই তলিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত জলের দ্বারা সে সমুদ্র আপূর্যমান। সেইটা হচ্ছে জ্ঞানের অবস্থান, পঞ্চজ্ঞানের অবস্থান। যে কোনো ইন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু গ্রহণ করছি, তার সম্পর্কে আমি সচেতন এবং সেই ইন্দ্রিয়বোধকে তলিয়ে দিচ্ছি এই পিণ্ডবোধের মাঝে। এটা একরকম ধারণা। এ ধারণার কথা বলা হচ্ছে পরের শ্লোকে—

'স্থিরাম্ ইন্দ্রিয়ধারণাম্'।।

এমনি করে যখন ইন্দ্রিয়বৃত্তি অন্তর্মুখ হয়, পিণ্ডবোধে যখন অবস্থান করে, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে মনও অবস্থিত হয়। অর্থাৎ মনটা নিজের মাঝেই যেন কোথায় তলিয়ে যেতে থাকে। আমাদের জীবনে সেই peaceful moments শান্তমুহূর্ত অনেক সময়ই পাই। সেই সময়কে আমরা অপব্যয় করি নানারকম আবোলতাবোল চিন্তা করে, যাতে আমাদের কাজেরও কোনো সহায়তা হয় না। সে শুধু একটা শক্তির অপব্যয়। এই সময়টা যদি এই পন্থা অবলম্বন করি, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে সজাগ রাখছি, বাইরে থেকে যা কিছু আসবার আসতে দিচ্ছি সমস্তই সেই আত্মবোধে, দেহস্থিত যে আত্মবোধ তার মাঝে তলিয়ে দিচ্ছি, ঘটা করে যোগ করার চাইতে এর উপকার বেশি। এমনি করে পঞ্চজ্ঞান তলিয়ে গেল, মনও অন্তর্মুখ হল। মনের ওপারে রয়েছে বুদ্ধি। ওপারে না বলে আমরা বলতে পারি গভীরে। বুদ্ধির এখানে কয়েকটা সমপর্যায় শব্দ দেওয়া হয়েছে, সত্ত্ব, বিজ্ঞান। আর একটা বলা যেতে পারে, যা বুদ্ধিরই ক্ষেত্র, সেটা হল স্বপ্ন। এই সমস্তই চেতনার একই ভূমির সংজ্ঞা। সত্ত্ব কথাটাই ধরা যাক। সত্ত্ব pure essence, ভাবনারই pure essence। Pure essence-টাকে আমরা প্রথম অনুভব করতে পারি অহং-তত্ত্ব দিয়ে। এখানে অহং কথাটাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সাংখ্যের scheme-এর হিসাবে (ক্রম অনুসারে) ইন্দ্রিয়, তার থেকে মন। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বাইরে, মন তার গভীরে। মনের থেকে গভীরে হচ্ছে বুদ্ধি। সাংখ্যের যেটা অহংকার, সেটাই হচ্ছে আগে যেটা বলেছি আত্মসচেতনতা, বৌদ্ধরা সম্প্রজন্য দিয়ে যার সাধনা করেন। হুঁসে থাকা, আমি আছি এই বোধ। এই আমিকে যদি আমার ভাবনা চিন্তা কর্মগুলির কেন্দ্র বলে বুঝতে পারি আর তাকে এইভাবে ধারণা করি যে বাস্তবিক সে শূন্যবৎ, তার কোনো রূপ নাই, গুণ নাই, কিছু নাই, নির্বিশেষ অথচ তার

থেকেই সমস্ত বিশেষের উৎপত্তি হচ্ছে, তাহলে সে অহং-ভাবের ভিতরেই আমরা সত্ত্বের অর্থাৎ সত্তার essence-এর অনুভূতি পাই। এইখানে আমরা বিবেকজ্ঞানের উপযোগিতা দেখতে পাই। আমরা আমিকে সব সময় রঞ্জিত করে দেখি। আমি এই করছে, ঐ করছে ইত্যাদি নানা রকম ভাবনা, নানা ভাবে নানা রকম বিশেষণ জুড়ে দিচ্ছি। এগুলি হল বোধির বিকার। স্বচ্ছ কিন্তু তার মধ্যে ঝামেলা রয়েছে যথেষ্ট। এইটাই চিত্তের বিক্ষেপ। অথচ সমস্তের মূলে একটা বিশুদ্ধ বোধবৃত্তি রয়েছে। যেমন আয়না। আয়নাটা স্বচ্ছ। তার মাঝে নানা বিষয়ের প্রতিবিম্ব পড়ছে। যখন যার প্রতিবিম্ব পড়ছে, নিজেকে সেই আকারেই আকারিত দেখছে, কিন্তু বস্তুত কিছুই নয়। আমি কিছুই নই, শূন্যবৎ। নানাভাবে এটাকে ধারণা করা যেতে পারে। যেমন আমার মাঝে, দেহের কোনো কেন্দ্রে একটা জ্যোতির্বিন্দু রয়েছে, অথবা সর্বদেহব্যাপী একটা বোধ, সেইটাই আমি। তার কোনো রঙ নেই, বিশেষণ নেই। এটাই হচ্ছে শুধু বোধে থাকা। বাইরে অহং-এর যা বৈচিত্র্য দেখতে পাচ্ছি বা দেহের ভিতরে যা বৈচিত্র্য দেখতে পাচ্ছি, তার মূল এই একরস অনুভব করা, এটাই হল সত্ত্বের বোধ। এই সত্ত্বতত্ত্বও যা, বুদ্ধিও তা। এই যে বোধ, আমরা বাইরের দিক থেকে যদি তাকে দেখি তখন মনে হবে সে নিষ্ক্রিয়। অথচ সেই সমস্ত ক্রিয়ার উৎস। ক্রিয়া থাকবেই। কিন্তু সে ক্রিয়ার মূলে নিষ্ক্রিয় একটা ভাব রয়েছে, ভাবনার সঙ্গে এইটুকু যোগ করে দিতে হয়। এটা একটা সহজ উপায়। কোনো ক্রিয়া থাকবে না, ক্রিয়াকে রুদ্ধ করব, শুধু নিষ্ক্রিয়তা থাকবে, এই উপায়ের মধ্যে আছে কৃচ্ছ্রতা, যদিও সাধারণত আমরা এই উপায়টাই অবলম্বন করতে চাই, আর তাইতেই আমাদের প্রাকৃত-জীবন আর যোগ-জীবনের মাঝে একটা বিরোধের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই সূক্ষ্ম কথাটাকেই যদি স্বীকার করে নিই যে, বাইরের যত বিক্ষেপ, তার মূলে রয়েছে একটা প্রশান্তি, আমার আমিকে বাইরে ছড়িয়ে দিয়েছি তার যেমন একটা স্বচ্ছতা রয়েছে, আমার অভিজ্ঞতার একটা সত্যতা রয়েছে, তেমনি আমার ভিতরটা একটা মহাশূন্য যেখানে কিছুই নেই, সেটাও সত্য—তাহলে বিরোধ থাকে না। এইটাই আগে বলা হয়েছে যে, অব্যক্ত থেকে সব কিছুর অভিব্যক্তি। এটা আমরা তখনই বুঝতে পারি যখন অভিব্যক্তি থেকে উল্টো দিকে সেই গভীরে চলে যাই, যাকে উপনিষদে বলা হয়েছে অন্তরাবৃত্তি, 'আবৃত্ত-চক্ষু', দৃষ্টির মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া, আপনাতে আপনি থাকা। এইভাবে নিজের মাঝে যদি সেই essenceটা সত্তাটা আমি পাই এবং তারই মাঝে নিজেকে তলিয়ে দিই, তখন বুদ্ধির যে **বিচেষ্টা** বাইরের যে বিক্ষেপ তা রুদ্ধ হয়ে যায়। মাঝে মাঝে প্রকৃতি এমনই রুদ্ধ হয়ে যায়, যেমন আমাদের ঘুমের মাঝে। তখন এই পঞ্চেন্দ্রিয়জ্ঞান, মন, বুদ্ধি, কোনো কিছুর চেষ্টা থাকে না। আমরা বেশ জানি এই ঘুমটুকু না হলে আমাদের চলত না অর্থাৎ এই নিদ্রাদশায় প্রত্যেকদিনই আমরা যোগ করছি। এখন এই ঘুমের প্রশান্তি এটাকে জাগ্রতে নিয়ে আসা, এটাই হল যোগ। যদি আমরা সেই প্রশান্তিকে জাগ্রতে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে বুদ্ধি একদিকে বিচেষ্ট করে না, আর একদিকে করে। তখন অন্তরের কোনো একটা গভীর প্রদেশ থেকে আমার সমস্ত ভাবনা চিন্তা উৎসারিত হয়। এই উৎসারণটাই হচ্ছে বিভূতি। সেই উৎসারণে তখন সামর্থ্য থাকে, শক্তি থাকে। আর ভিতরের সঙ্গে যোগ হারিয়ে বাইরে যা আমরা উৎসারণ করি, বিক্ষিপ্ত করি, সে বিক্ষেপে যেমন অবসাদ আসে তেমনই সত্যকার কোনো লাভও হয় না, বরং সে নানা দিক থেকে ঝামেলা বাড়ায়। এটাই হল আমাদের প্রাকৃত জীবন। এই তুলনায়

যোগজীবন হল অন্তর্মুখ আত্মস্থ জীবন। প্রাকৃত জীবনের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ নেই। শুধু নিজেরই মাঝে যে আর একটা তত্ত্ব রয়েছে তাকে আবিষ্কার করা এবং তাতে থেকে সব কিছু করে যাওয়া। এটাই গীতার উপদেশ, স্থিতপ্রজ্ঞতা।

এটাকে বলা হচ্ছে **পরমা গতি**। একটা গতি বাইরের দিকে। সেখানে চিত্ত ক্ষিপ্ত হচ্ছে, হুঁস হারিয়ে ফেলছে। আর একটা গতি অন্তরের দিকে, যেখানে সমস্ত কিছুকে আকর্ষণ করে তলিয়ে দিচ্ছে, তলিয়ে দিয়ে নিষ্পন্দ হয়ে যাচ্ছে। আর এই নিষ্পন্দতা থেকে আবার উৎসাহিত হচ্ছে সেও একটা গতি। শেষের যে গতি সেটা যোগস্থ হয়ে কর্ম করা। যেটা গীতাতে বলা হয়েছে, যে কর্মে অকর্ম দর্শন করে আর অকর্মে কর্ম দর্শন করে সে কৃৎস্নকর্মকৃৎ। কর্মে অকর্ম দর্শন—কাজ করছি এটা দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু হুঁস করে কেন্দ্রে যদি প্রতিষ্ঠিত থাকি, তাহলে দেখছি যে কিছুই করছি না। এই হল কর্মে অকর্ম। আবার দেখছি যে কিছুই করছি না, ঠিক সেই কেন্দ্র থেকেই কর্ম উৎসারিত হচ্ছে তখন হচ্ছে অকর্মে কর্ম। এইভাবে তিনটি movements-কে যদি আমরা জানি তাহলেই আমরা হই কৃৎস্নকর্মকৃৎ, কর্মের যেটা সমগ্র রহস্য তা জানতে পারি।

তাহলে movementগুলি হচ্ছে এইরকম। প্রথম, আত্মসচেতন হওয়া, নিজের প্রত্যেক কর্ম সম্পর্কে হুঁসে থাকা, চলছি বলছি যা কিছু করছি কিছুই আমার দৃষ্টির বাইরে যাচ্ছে না। তারপর তার গভীরে যা অকর্ম নিষ্পন্দে যে রচেছে, তার ধারণা করা। সেটার ধারণা করতে গিয়ে বাইরের এগুলিকে আকর্ষণ করে ভিতরে তলিয়ে দেওয়া। অন্তরে স্থিরবোধের সংস্কারটা যদি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার থেকে আবার কর্মকে উৎসারিত হতে দেখি, এইটিই হল সেই চরম অবস্থা final state। তখন সমস্তই অকর্তার কর্ম। এই অকর্তার কর্মই নিমিত্ত কর্মে এবং দিব্যকর্মে রূপান্তরিত হয়। তাহলে তিনটি গতি ঃ একটা প্রাকৃত গতি যেটা আমরা সাধারণত অনুভব করি। আর একটা অন্তরাবৃত্তি, ভিতর দিকে গতি, সেটা শেষ পর্যন্ত শূন্যতায় পর্যবসিত হয়, তাকে বলা হয়েছে পরমা গতি। আর একটা হচ্ছে যেখান থেকে বাইরের দিকে আবার একটা গতি, সেটাকে বলা হয় বিসৃষ্টি। বিসর্গকে কর্মের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে গীতাতে—ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ। তখন যে কর্ম হয় সেটা অন্তর থেকে হয়। যেমন গাছের ফুল ফোটে ঠিক তেমনি করে কোনো চাপের কম নয়, বাসনার দ্বারা প্রণোদিত হয়ে কোনো কর্ম নয়, কিন্তু স্বচ্ছ এবং স্বস্থ আত্মভাব থেকে শক্তির উৎসরণ। এই হয় তখন কর্মযোগ।

১১।। **স্থির ইন্দ্রিয়ধারণা**-র কথাটি আবার আর একভাবে বলা হচ্ছে। ধারণা শব্দটিকে পরে পতঞ্জলি একটা যোগাঙ্গরূপে গ্রহণ করেছেন। অষ্টাঙ্গ যোগের দুটি ধাপ রয়েছে—বহিরঙ্গ আর অন্তরঙ্গ। প্রথম পাঁচটি নিয়ে বহিরঙ্গ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার। তারপর ধারণা, ধ্যান, সমাধি—এ নিয়ে অন্তরঙ্গ। তার মাঝে ধারণাকে বলা হয়েছে 'দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা'। চিত্তকে দেশে বেঁধে রাখাকে বলা হয় ধারণা। ধারণা দুরকম, একটা অন্তর্ধারণা আর একটা বহির্ধারণা। অন্তর্ধারণা আমাদের প্রাকৃত দেহে করতে পারি। বহির্ধারণা বিচার এবং বিবেক দ্বারা যখন একটা ব্যাপ্তভাব দেহে উদয় হয়, তখন করা যেতে পারে। অন্তর্ধারণা হল হৃদয়ে, ভ্রূমধ্যে, মেরুদণ্ডে—এইসব জায়গায় চিত্তকে ধারণা করা। এটা আসন এবং প্রত্যাহার থেকে হয়। বলা যেতে পারে, আসন, প্রাণায়াম এবং প্রত্যাহার এই তিনটির স্থিতিতে আসে দেহের

একটা স্থৈর্যবোধ, সে স্থৈর্যের ভূমিকায় প্রাণের একটা প্রশম এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তির ভিতরের দিকে টান। এটা যেখানে গিয়ে কেন্দ্রীভূত হবে সেখানে একটা ধারণা উৎপন্ন হয়—খুব সহজ কথায় বাইরের সমস্ত কিছু ভিতরের এক জায়গায় তলিয়ে যায়। সেটা সংস্কার অনুযায়ী কারো হৃদয়ে, কারো ভ্রূমধ্যে, কারো সর্বদেহে কিংবা মেরুদণ্ডে। এগুলি সমস্তই অন্তর্ধারণা। এই সমস্ত ধারণা অন্তর্মুখ হয়ে বাইরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে। এটাকে বলা হয়েছে মহাবিদেহধারণা। তখন দেহবোধ আকাশবৎ। এইটি বহির্ধারণা।

এমনি করে স্থিরা ইন্দ্রিয়ধারণা। ইন্দ্রিয় বলতে এখানে পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মন, ছয়টিকে ধরা হয়েছে। যেমন গীতাতে রয়েছে, 'মনঃষষ্ঠাণি ইন্দ্রিয়াণি'। এই সমস্ত যদি দেহের পিণ্ডবোধে বাঁধা পড়ে যায় দেশবদ্ধ হয়ে, তাহলে সেটা হল ধারণা। এই ধারণাটাই যোগ। এই ধারণার যে প্রত্যয়, তার যে একতানতা, সেটা হল ধ্যান। 'তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্'। অর্থাৎ ক্ষেত্রের মাঝে সমস্ত ইন্দ্রিয়বোধ তলিয়ে যাচ্ছে, অবস্থান করছে। তাতে এই ক্ষেত্রই যেন পুষ্ট হচ্ছে। এই ক্ষেত্রের বোধ, তার অনুবৃত্তি চলতে থাকে। মহাভারত এবং গীতার ভাষায়, ঋগ্বেদের ভাষায়ও বলতে পারি, এটাকে বলা হয় ক্ষেত্রজ্ঞের উন্মেষ। আর এর ভিতরে ক্ষেত্রজ্ঞের যে উন্মেষ সেটাই গাঢ় হলে মহৎতত্ত্বে ছড়িয়ে যায়। তারপর সে অব্যক্তে মিলিয়ে যায়। গাঢ় হয় প্রত্যয়ের একতানতায়। ক্ষেত্রজ্ঞ যদি ক্ষেত্রকে বারবার এইভাবে জানে তাহলে জানার ফলে ধ্যানবৃত্তির উন্মেষ হয়। সেটা নিয়ে আসে একটা শূন্যতা। পতঞ্জলি এটাকে বলেছেন, স্বরূপশূন্যতা, নিজের ভিতর ফাঁকা। এটাই সমাধি। এটা যেমন বাইরে থেকে সমস্ত কিছু গুটিয়ে এনে হতে পারে, যাকে আগে বলা হয়েছে পরমা গতি, তেমনি আবার সেখানে স্থিত থেকে জাগ্রতেও হতে পারে। স্থিতপ্রজ্ঞের যে সমাধি, সেটা এরকম জাগ্রত সমাধি—জাগ্রৎ এবং সুষুপ্তি, দুইয়ের যুগপৎ ধারণা। এই যে ইন্দ্রিয়ধারণা এটাকে বলা হয়েছে **যোগ**।

অপ্রমত্তস্তদা ভবতি— প্রমত্ততা হচ্ছে প্রমাদ। এই অপ্রমাদকেই বৌদ্ধেরা একটা বড় সাধন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। প্রমত্ততা শব্দটা হয়েছে √মদ্ থেকে, মাতলামি থেকে। 'প্র' উপসর্গটা বোঝাচ্ছে সামনের দিকে। আমাদের সমস্ত ভাবনায় চিন্তায় ব্যবহারে একটা মাতলামি রয়েছে। সমস্ত কিছুকে বাইরে ছড়িয়ে দেওয়া এটাই প্রমাদ। প্রমাদ কিসের থেকে আসে? গীতাতে বলা হয়েছে এটা তমোগুণের একটা বৃত্তি। তমোগুণের এই কয়েকটি বৃত্তি রয়েছে—আলস্য, নিদ্রা, ভয়, প্রমাদ। এইসবগুলি হয় যখন নিজের ভিতরটা অন্ধকার থাকে। তখন প্রকৃতিরই ক্রিয়া হয়ে চলেছে অপনাআপনি, automatically, অথচ পুরুষের কোনো জ্ঞান নেই। একটা অন্ধতা। এ প্রমত্ততার বিপরীত হচ্ছে অপ্রমাদ। বুদ্ধদেব এটার উপর খুব জোর দিতেন, বলতেন, 'প্রমাদো মৃত্যুনো (মৃত্যোঃ) পদম্'। প্রমাদ হচ্ছে মৃত্যুর পদ। তুমি যদি প্রমত্ত হও তাহলে তুমি মরেছ। শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তাও এই অপ্রমাদের উপদেশ। বলেছিলেন, 'সমস্ত সংসারই অনিত্য, তাদের উদয়-বিলয় হচ্ছে। হে চিত্তবান, তোমরা অপ্রমত্ত হয়ে বিচরণ করবে।' কর্ম হবেই। দেহপ্রাণমনের সমস্ত কর্মই চলবে, কিন্তু সে চলাটা যদি মাতলামি হয়, তাহলেই সর্বনাশ। তাহলেই মৃত্যু। কিন্তু যদি স্থিরা ইন্দ্রিয় ধারণা থাকে ভিতরে, তাহলে সেটা মাতলামি হয় না, হয় উল্লাস। উল্লাস শব্দটা ব্যবহার করেছেন তান্ত্রিকরা। তার থেকে বৈদান্তিকরা নিয়ে বলেছেন, প্রপঞ্চ-উল্লাস। অন্তরে অপ্রমত্ততা এবং তারই ফলে বাইরে আনন্দের বিচ্ছুরণ,

তাই তখন কর্ম। প্রমত্ততার আর একটি লক্ষণ দেওয়া হয় deviation—ব্যতিক্রম, যে পথে চলেছি সেটা থেকে ছিটকে পড়া। এটা আসে মাতলামি থেকে। এই মত্ততার চোটে ব্যতিক্রম যেটা হয়, বেদান্তে তাকে বলা হয়েছে আবরণ ও বিক্ষেপ। জ্ঞান আবৃত থাকে। আমি কী, আমার যে আত্মতত্ত্ব, সে তত্ত্বের একটা বিস্মৃতি আসে। নিজেকে ভুলে যাই। এবং তার ফলে যে বিক্ষেপ হয়, যে কর্মের প্রবৃত্তি হয় সে হয় মূঢ়ের কর্ম। মূঢ়ের কর্ম, মূঢ়ের ধর্ম যা আমাদের জগতে সর্বত্রই চলেছে, সাংখ্যে এটাকে বলেছে রজোগুণ এবং তমোগুণের ক্রিয়া। তমোগুণ আবরণ, আর সেই আবরণকে ভিত্তি করে রজোগুণের বিক্ষেপ। আমাদের মাঝে সত্ত্বগুণের যে প্রকাশ হয়, যার ফলে আমরা ইন্দ্রিয়কে স্থির করে পাই, তার মাঝে এই আবরণ ও বিক্ষেপের সৃষ্টি হয়। এমনি করে এই তিনটি গুণের একটা মিশ্রণ সব সময় আমাদের মাঝে চলতে থাকে। আবরণ এবং বিক্ষেপ দূর করে সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, নিত্যসত্ত্বস্থ হওয়া, এটাই হচ্ছে অপ্রমত্ততা। যখন নিজের অন্তর থেকে কোনো চেষ্টা নেই যেটাকে অন্যত্র বলা হয়েছে অনীহ, নিরীহ, বাইরে থেকে যে সমস্ত আসছে আমার মাঝে সেগুলিকে ভিতরে তলিয়ে দিচ্ছি এবং তাতে আমাদের অন্তরের ধারণাটি সিদ্ধ হচ্ছে, কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে না, সেই ইন্দ্রিয়ের ধারণা যদি সিদ্ধ হয়, তাহলে এই অপ্রমাদের ভূমি পাব। তখন দেখব—এটা একটা peculiar কথা বলা হচ্ছে—**যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ**। যোগ হচ্ছে প্রভব এবং অপ্যয়। প্রভব মানে একটা কিছু উৎপন্ন হওয়া, একটা কিছুর আবির্ভাব। আর অপ্যয় মানে প্রলয়। প্রথম দেখব আত্মচৈতন্যের বৃত্তিগুলি জাগছে এবং তাতেই তলিয়ে যাচ্ছে। কোনো কর্ম থাকবে না, ভাবনা চিন্তা থাকবে না, বলা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে যে অপ্রমত্তভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে এবং সেই ভূমি থেকেই দেখতে হবে যে ভিতর থেকে ফোয়ারার মতন শক্তি উৎসারিত হচ্ছে এবং আবার ফোয়ারার জল যেমন তার কুণ্ডে ফিরে যায় তেমনি করে সে আবার শূন্যে ফিরে যাচ্ছে।

এটা হল যখন আমরা অন্তর্ধারণার রাস্তায় এগিয়ে যাই আবার মহাবিদেহ ধারণার দ্বারা ঠিক এই ভাবটাকে আমরা আয়ত্তে আনতে পারি। তার সূত্র আমরা পাই উপনিষদে, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি শান্ত উপাসীত' (ছান্দোগ্য ৩।১৪)। এক বৃহৎ সত্তায় সমস্ত কিছু আকর্ষিত হয়ে রয়েছে। আকাশের মতো এক সত্তা ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র, তারই মাঝে সমস্ত ভাবের উদয় হচ্ছে, স্থিতি হচ্ছে, প্রলয় হচ্ছে, তৎ-জ-ল-অন্। এই দেখা যদি শান্ত হয়ে তারই মাঝে থাকে, তারই কাছে বসে থাকে, 'উপাসীত' তাহলে এটা হল বাইরের ধারণা। এই যে প্রভব এবং অপ্যয়কে দেখা এর থেকে পরে বৌদ্ধদের ক্ষণভঙ্গ বাদ এসেছে। সর্বত্র আমরা একটা অনুবৃত্তি দেখছি, একটা continuity দেখছি, 'সন্তান' যাকে এঁরা বলতেন। তাঁরা বলতেন এই সন্তানদৃষ্টিই আমাদের মোহের কারণ। অর্থাৎ দূর থেকে, অতীত থেকে, বর্তমানের ভিতর ভবিষ্যতকে প্রসারিত করছি। সেই দর্শন আমাদের সত্যদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বৌদ্ধরা বলতেন যে, ঠিক এরকম না করে জগৎটাকে অন্যভাবে দেখা যেতে পারে। তখন তার সাধনা হবে অতীতকে ভোলা আর ভবিষ্যৎকে স্বীকার না করা, শুধু বর্তমানে থাকা। স্মৃতি এবং কল্পনা, দুটিকেই আমাদের ভাবনা থেকে বাদ দেওয়া। স্মৃতিকে বাদ দেওয়াকে পতঞ্জলি বলেন, 'স্মৃতিপরিশুদ্ধি', ভুলতে শেখা চাই। এমনভাবে করতে হবে যাতে কালকের ভাবনাকে আজকে টেনে না আনি। সকালের জের

বিকেলে থাকবে না। বিকেলের জের সন্ধ্যায় থাকবে না। ক্রমশ ভাবনাকে সঙ্কুচিত করে আনতে হবে। তারপর মুহূর্তে মুহূর্তে সব জের মিটিয়ে দেব। জের টানব না, যা গেল তা গেল। যখনই একটা ক্ষণ বিলীন হচ্ছে তখনই ভিতরে দেখতে পাচ্ছি শূন্যতা। এটা ক্ষণভঙ্গবাদ। এটার সাধনা করলে আসক্তি থাকবে না। আমাদের আসক্তির জন্যই 'সন্তান' বা অনুবৃত্তি হয়। কিন্তু যখন জ্ঞানের দিক দিয়ে বিচার করব, তখন বুঝব যে দিনের প্রত্যেকটি মুহূর্তে এইভাবে সব বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। তখন তার প্রতি একটা উদাসীনতা, একটা তটস্থতা এসে যাবে। মনের এইরকম বৃত্তিকেই বলে অপ্রমাদ। কোনো উপকরণ নেই অথচ তাকে অবলম্বন করে বাইরে ক্ষণভঙ্গ চলছে। এই দুটি ধারাকে মিলিয়ে দিতে হয়। শূন্যতার উপরে জোর দিতে হয়। আর শূন্যতার সংস্কার দৃঢ় হলে তার থেকে ক্ষণভঙ্গকে উৎসারিত করা—এটাই তৃতীয়া গতি।

১২।। তাঁকে বাক্ দ্বারা, মন দ্বারা, চক্ষু দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, শুধু বলা চলে যে তিনি **অস্তি**। এ অস্তি ছাড়া তাঁকে কীভাবে পাওয়া যেতে পারে? এর আগে যা বলা হয়েছে তাই আবার অন্যভাবে বলা হচ্ছে। আমরা চাই তাঁকে চোখ দিয়ে পেতে, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে পেতে। এগুলি দিয়ে যে পাওয়া যায় না, এ কোনো কথা নয়। উপনিষদেও বলা হয়েছে যে এরা ব্রহ্মের দ্বারপাল। অর্থাৎ এদের দিয়েও আমরা ব্রহ্মকে পেতে পারি। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে এদের দিয়ে যে ব্রহ্মকে পাও তা গৌণ। মুখ্যত তাঁকে পেতে হবে অন্তরাবৃত্তি দ্বারা, আবৃত্তচক্ষু হয়ে। প্রথম মরতে হয়—তখনই জীবনকে পাওয়া যায়। এটাই উপনিষদের মূল তাৎপর্য। এখানে বাক্ মন, চক্ষু ইত্যাদি দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায় না বলা হয়েছে, সেটা শুধু তাদের অপূর্ণতা দেখাবার জন্য। তাদের দিয়েও যখন ব্রহ্মকে পাই তখনও আমাদের তাদের মূলে যেতে হবে। এরই কথা কেনোপনিষদে খুব ভাল করে বলা হয়েছে। বাক্ যাকে বলতে পারে না অথচ যিনি বাক্ বলেন—তাঁকে ব্রহ্ম বলে জানবে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে। বাকের বহির্মুখী গতি দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না। তাঁকে পেতে হলে কার্য থেকে কারণে যেতে হবে, স্থূল থেকে মূলে যেতে হবে, বাহির থেকে ভিতরে যেতে হবে, তবেই তাঁকে জানা যেতে পারে। আমরা যখন ধ্যান করি, তখন যদি অন্তরে জ্যোতিদর্শন করি তখন এটাকে সিদ্ধির লক্ষণ মনে করি। কিন্তু যদি বাইরে সূর্যের আলো বা প্রদীপের আলো দেখি—তাদেরকে কোনো সিদ্ধি বলে মনে করি না। বস্তুত অন্তরে জ্যোতির দর্শন আর বাইরে আলো দেখা—দুটির মাঝে কোনো তফাৎ নেই। কিন্তু বাইরে আলো দেখা থেকে অন্তরের আলো দেখাকে আমরা বড় স্থান দিই। কেন? বাইরে যে দীপ জ্বলছে বা সূর্যের যে আলো আছে—সেটা আমাদের স্বাভাবিক দর্শন। কিন্তু ভিতরে যখন আমরা জ্যোতি দর্শন করি তখন তাকে একটা নিস্পন্দ শূন্যতার মাঝে দেখছি। এই শূন্যে আলো দেখাকে আমরা বড় স্থান দিই। বাইরের সূর্য প্রতিদিন দেখছি, তাকে তত্ত্বদর্শন বা দেবদর্শন মনে করি না। ভিতরটাকে ফাঁকা করে দিতে পেরেছি, তার জন্য যে শূন্যতা উৎপন্ন হয়েছে, তার ভিতরে যখন আলোর আবির্ভাব হয়—তখনই আমরা তাকে আত্মদর্শন বা দেবদর্শন মনে করি। চোখ যখন বাইরে দেখে তখন তত্ত্বজ্ঞান পায় না। কিন্তু চোখ যখন ভিতরের শূন্যতাকে দেখছে—সেটাই তত্ত্বদর্শন। তাকে অস্তিত্ব বলতে পারি, নাস্তিত্ব বলতে পারি, শুধু একটা সত্তার বোধ, শুধু আমি আছি। কোনো উপাধি নেই, কোনো বিশেষণ নেই,

কোনো কর্ম নেই। এই শুধু থাকাকে আমরা দেহবোধে স্পষ্ট অনুভব করতে পারি। এ শুধু থাকা, অস্তিত্বের একটা নির্বিশেষ অনুভব। এটাই সব অনুভবের মূল। এটা না পেলে অন্য অনুভূতি পাওয়া সার্থক হয় না। তা আছে, 'অস্তি'—তাছাড়া কি উপায়ে তার উপলব্ধি করা যেতে পারে? এ থাকার পিছনে রয়েছে নাস্তি। কিছুই নেই, অথচ আছে, অস্তি ও নাস্তির একটা মিথুন। সম্ভূতি আর অসম্ভূতি দুটিকে মিলিয়ে নিতে হবে।

ধারাটা এই হবে—প্রথম শূন্যতা। তাকে আশ্রয় করে বিশুদ্ধ অস্তিত্বের বোধ। আর তার যে বিক্ষেপ তাই জগৎ। আগুন থেকে যেমন স্ফুলিঙ্গগুলি বেরিয়ে আসছে, তেমনি এই অস্তি থেকে জগৎ বেরিয়ে আসছে। আমাদের চেতনাকে রাখতে হবে এই অস্তিত্বে।

১৩।। আগের মন্ত্রে বলা হয়েছিল যে সেই তত্ত্ববস্তুকে ইন্দ্রিয় দিয়ে পাওয়া যায় না। গীতাতে একটা কথা বলা হয়েছে যে সে বস্তু বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয়। বুদ্ধি বলতে বোধকে বোঝাচ্ছে। সে বস্তু পাওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করি। প্রথম প্রথম এইরকম চেষ্টা থাকে, থাকা উচিত, কিন্তু ক্রমে এই চেষ্টা থাকবে না। এইটা হচ্ছে সাধনার সঙ্কেত। অর্থাৎ সে বস্তু পাবার চেষ্টা আমরা করব না, কিন্তু সে বস্তুই আমাদের পাবে। Not to possess God, but to be possessed by God। এই কথার ইঙ্গিত আগে করা হয়েছিল। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ। প্রবচন দিয়ে, মেধা দিয়ে, বহুশ্রুতি দিয়ে, আত্মাকে পাওয়া যায় না। তিনি যাকে বরণ করেন সে-ই তাঁকে পায়। একদিক দিয়ে তিনি আমাদের বরণ করে রয়েইছেন। কিন্তু আমরা সে স্বয়ং-বরণকে বুঝতে পারি না। মনে করি তাঁকে পেতে হবে, একটা কিছু করতে হবে। বলেছি প্রথম অবস্থায় এটা সত্য। কিন্তু ক্রমে সে পাওয়া কিংবা করা রূপান্তরিত হবে হাওয়াতে। মনে করতে হবে তিনি আছেন, আমার মাঝে তিনি হয়ে আছেন। এইভাবে সাধনা চলবে। এইভাবে তত্ত্বের কিংবা ইষ্টের সর্বব্যাপ্তির বোধ থাকা দরকার। তাকেই বলা হয়েছে আস্তিক্যের বোধ। আর যদি বলি তিনি অব্যক্ত, তিনি দূরে রয়েছেন, তাঁকে পেতে হবে, সেটা হবে সত্যকার নাস্তিক্য। রামকৃষ্ণ একটা কথা বলতেন, জ্ঞানীর ঈশ্বর হেথা হেথা, অজ্ঞানীর ঈশ্বর হোথা হোথা। তিনি দূরে নন। তিনি আমাদের কাছে, আমাদের অন্তরে, আমাদের বোধে। কিন্তু সে বোধই যখন সমস্ত বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়, তখন তিনি আবার দূরেও, তদ্দূরে তদ্উ অন্তিকে। আগে তিনি কাছে তারপরে তিনি দূরে। কিন্তু আমরা উল্টোভাবে ভাবি। তিনি আছেন দূরে আর তাঁকে পাবার জন্য চেষ্টা করতে হবে। যতক্ষণ আমাদের মাঝে অহং-বুদ্ধি রয়েছে, অবিদ্যা রয়েছে, ততক্ষণ আমরা এইভাবেই চেষ্টা করব। কিন্তু এই চেষ্টার ফলে অবিদ্যা দূর হয়ে যায়। তখন দেখি, তিনি ছিলেন, তিনি আছেন। তখন তিনি আধারে আবিষ্ট হন।

সে আবেশ প্রথম থেকেই হয়। তা না হলে আমাদের চিত্ত ওদিকে যেতই না, যার কথা উপনিষদের গোড়াতেই বলা হয়েছে, নচিকেতার মাঝে শ্রদ্ধার আবেশ। যখন দেখি তিনি সমস্ত পরিপূর্ণ করে রয়েছেন তখন এই অস্তিত্বের উপলব্ধির দ্বারা আমরা পরম তত্ত্বকে লাভ করি। তাকে শান্ত আত্মারূপে পাই—আর এই পাওয়াটাই চরম। তারপর ইহলোক পরলোক বন্ধন মুক্তি কোনো দ্বৈতই থাকে না। শুধু যে প্রাকৃত চেতনার দ্বৈতই থাকে না তা নয়, অপ্রাকৃত চেতনাতেও কোনো দ্বৈত থাকে না। এইটাই সেই পরম পূর্ণতা, যাকে অন্য উপনিষদে বলা হয়েছে পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং ইত্যাদি। অসীম সমুদ্র যেন থৈ থৈ

করছে, তার মাঝে চেতনা ডুবে আছে, অন্তরে বাইরে তখন একই চেতনা। এই যে অস্তিত্বের বোধ তাকে বলা হয়েছে **তত্ত্বভাব**। তৎ+ত্ব। 'তৎ' বলতে সেই অনির্বচনীয় রহস্যকে লক্ষ করা হয়। উপনিষদে তিনটি সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে—ইদম্, এতত্ আর তৎ। ইদম্ হচ্ছে এই বিশ্বজগৎ। এতত্-এর পুরুষ বাচক রূপ হচ্ছে এষঃ। সে হচ্ছে আত্মা। আর তৎ হচ্ছে লোকোত্তরের পরম সত্য। দর্শনে যাকে বলা হয় individual, universal and transcendent তাই এতৎ, ইদম্ আর তৎ। যা যুগপৎ বিশ্বোত্তীর্ণ ও বিশ্বাত্মক, যিনি আমার অন্তর্যামী, সেই অনির্বচনীয়ের যে ভাব তাই তৎ+ত্ব। বৌদ্ধেরা যাকে বলতেন তথতা thatness। যা যেমন তা তেমনি। এর মাঝে আমার কল্পনা করবার কিছু নেই। সমস্ত কল্পনা থেকে সে নির্মুক্ত, তাই তাকে বলে 'কল্পনাপোঢ়া'। এই তথতাই শূন্যতা। নিঃশক্তি নয়, তার থেকেই সমস্ত কিছুকে পূর্ণ করে রেখেছে। এই শূন্যতা নিঃশক্তি নয়, তার থেকেই সমস্ত কিছুর বিচ্ছুরণ ঘটে, ফোটে আলো যাকে বলা হয়েছে প্রজ্ঞা-পুরাণী—যা থেকে জগতের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সমস্তের মূলে রয়েছে শূন্যতা। এই শূন্যতাই অস্তি—পরম অস্তিত্ব। এই তথতার সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বলতেন যে, আমাকে নিয়ে জগৎকে নিয়ে, ইষ্টকে নিয়ে আমাদের যত সংস্কার সমস্তই তাতে লুপ্ত হয়ে যায়। তাহলে কী থাকে? এই দিক দিয়ে দেখি, কিছু থাকে না। আর ওইদিক দিয়ে যদি দেখি, তাহলে সবই থাকে। এইটাই তত্ত্বভাব।

এই তত্ত্বভাব উভয়েতে সিদ্ধ করতে হবে। **তত্ত্বভাবেন চ উভয়োঃ**। সাধনার প্রথম দশায় আমাদের মাঝে সূক্ষ্ম দ্বৈত থাকে। একটা কিছু লভ্য বা প্রাপ্তব্য থাকে, আর একদিকে লব্ধা বা প্রাপক থাকে। উপাস্য থাকে, উপাসকও থাকে। অথবা প্রাকৃতভাবে নিয়ে এসে বলতে পারি, আত্মা আছে, চৈতন্য আছে, আবার ইদম্ আছে, জগৎ আছে। তখন সেই তত্ত্বভাব—সব কিছু নির্বিশেষ—এই বোধ যেমন জন্মাবে আত্মার ভূমিতে, তেমনই জন্মাবে অনাত্মার ভূমিতে। Subject and object—দুইয়ের মাঝে সেই শূন্যতার বোধ থাকবে। শূন্যে শূন্যে মিলে গেল। দুটি শূন্য যেন এক। আমরা একটা মহাশূন্যে পৌঁছলাম। তখন এটাকে বলা হয়েছে 'অতিশূন্য'। এই যে দর্শন তাকে নিয়ে বৌদ্ধদের ধর্মে সম্প্রদায়-ভেদ হয়েছে। শূন্যতা দুই প্রকারের। একটা 'পুদ্গল-শূন্যতা' বা পুদ্গল-নৈরাত্ম্য আর একটা ধর্মশূন্যতা বা ধর্মনৈরাত্ম্য। তাঁরা বলেন, আত্মভাব বলে বাস্তবিক কিছু নেই, কারুর নেই, না বিষয়ের, না বিষয়ীর। এটা হল অতিশূন্যতা। যারা হীনযানী তাদের সম্বন্ধে মহাযানীরা বলতেন, ওরা শুধু পুদ্গল-শূন্যতা মানে, ধর্মশূন্যতা বোঝেনা। পুদ্গল মানে আমিত্ব, আমার জীবত্ব। আমার ভিতরে সব শূন্য সব ফাঁকা। কিন্তু সে আমিতে জগৎ রয়েছে, ইষ্ট রয়েছে, অতএব শূন্যতারও একটা সংস্কার রয়েছে, কিন্তু এ সমস্ত নেতিবাচক হয়নি, রয়েছে ইতিবাচক হয়ে। মহাযানীরা বলতেন, এটা সম্যক্ দর্শন নয়। নাস্তি যদি বলতে হয় তবে যেমনি আমিও নেই, তেমনি জগৎও নেই। বিষয়ীও নেই, বিষয়ও নেই যেমন আমি শূন্য তেমনি বিষয়গত জগৎ সমস্তই শূন্য। ইষ্টও শূন্য। হীনযানীরা সমাধি ও ব্যুত্থানে ভেদ স্বীকার করেন। যখন সমাহিত হই—তখন সব শূন্য। কিন্তু যখন ব্যুত্থিত হই, তখন সে শূন্যের মাঝে জগৎ ভাসছে এবং জগতের একটা অস্তিত্ব রয়েছে। যদি এই শূন্যতার ভাবনাকে ব্যুত্থানের মাঝে রাখতে পারি তাহলে দেখব, আমি যেমন শূন্য, জগৎও তেমনি শূন্য। এইটাই সর্বশূন্য বা অতিশূন্য। এই ভাবটাকে তাঁরা বলতেন সম্যক্ দর্শন।

অর্থাৎ তথতাকে খুঁজতে হবে শুধু ব্যষ্টিচৈতন্যে নয়, বিশ্বচৈতন্যেও। সমাহিত চেতনার অনুভব যেন ব্যুত্থানেও তেমনি থাকে। শূন্যতার মাঝে সেই পরমবোধের মাঝে সমাধি—ব্যুত্থানের ইতিনেতির যে দ্বৈত, তার লীলা চলবে অনপেক্ষ হয়ে। এখানে তারই ইঙ্গিত। অস্তি এই বলে যে উপলব্ধি করবে সেটা উভয়ের তত্ত্বভাব নিয়ে করবে। উভয় বলতে বিষয়ী-চৈতন্য এবং বিষয়। বিষয়ী-চৈতন্যও যেমন শূন্য, তার বিষয়ও তেমনই শূন্য। এমনি করে যদি সব কিছুকেই আমরা সেই নেতিতে কিংবা শূন্যে তলিয়ে দিই—তাহলে তার ভিতর থেকে তত্ত্বভাবের একটা প্রসাদ উৎপন্ন হয়। **তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি**। তত্ত্বভাবের এই যে প্রসন্নতা এটা ব্যুত্থানের, আর এরই মাঝে রয়েছে তত্ত্বভাবের শক্তি। বহুবার যে উপমা দিয়েছি সেই উপমাটা আবার স্মরণ করিয়ে দিই—সমস্ত ব্যাপারটা হচ্ছে যেন অন্ধকার আলো হয়ে ওঠার মতো। নাস্তিতে সমস্ত কিছু শেষ হয়ে গেছে, তারপর সেই অবাঙ্‌মনসগোচর নাস্তিত্বের মাঝে আবার সেই বাক্‌ ও মন আলো হয়ে ফুটে উঠছে। এটা হচ্ছে সেই তত্ত্বভাবের প্রসন্নতা। যখন একে ব্যক্তির দৃষ্টিতে দেখছি তখন বলব এটা জীবন্মুক্তি। আর যখন এটাকে সমগ্রভাবে দেখছি তখন উপনিষদের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় অতিমুক্তি। মুক্তি আমার, আমি বদ্ধ, আমি মুক্ত হয়েছি। কিন্তু সে তৎস্বরূপ নিত্যমুক্ত, মুক্ত হয়েই রয়েছেন। এবং তাঁর সেই মুক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের লীলা দেখা যাচ্ছে। যখন এইভাবেও ধারণা করতে পারি তখন যে মুক্তির চেতনা সেটা হল অতিমুক্তি। সে অতিমুক্তির মাঝে আবার বন্ধনমোচনের যে লীলা চলে, সেটাই হচ্ছে তত্ত্বভাবের প্রসাদ। অন্ধকারের মাঝে আবার সেই আলো ফুটে ওঠার মতো। অথচ সে আলো অন্ধকারকে প্রকাশ করতে পারে না। যা সেই আগের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্‌। কিন্তু সেই অন্ধকার দ্বারাই ঐ আলো প্রকাশিত। অতএব অতিশূন্যই হল সমস্ত অস্তিত্বের উৎস। তাহলে এখানে অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হচ্ছে না কিন্তু তাকে দেখা হচ্ছে নাস্তির কুক্ষিগত করে। নাস্তির মাঝেই অস্তিত্ব। নাস্তিকে অবলম্বন করেই তার উৎসারণ, তার ঐশ্বর্য।

১৪।। এখানে দুটি কথা বলা হচ্ছে, একটা হচ্ছে হৃদয়ের কামনা হতে প্রমুক্তি আর একটি হচ্ছে ব্রহ্মসম্ভোগ। কামনা অর্থ—যা অসিদ্ধ তাকে সিদ্ধ করবার জন্য একটা ব্যাকুলতা। আগেই বলেছি এই ব্যাকুলতা স্বাভাবিক। কিন্তু সত্যকার বোধ যখন জাগে, তখন দেখি সবকিছু সিদ্ধ হয়েই আছে। এই ভাবটাকে অবলম্বন করে একটা সাধনা প্রচলিত ছিল, যাকে বৌদ্ধরা বলতেন সহজযান। সহজ অর্থাৎ আমার সঙ্গে যা জন্মেছে। এই যে অস্তিত্বের বোধ, নিত্য যা হয়েই রয়েছে তার যে বোধ, এই যে বোধ নিয়ে আমি জন্মেছি, আমার অবিদ্যায় তাকে ঠিক বুঝতে পারছি না। অতএব সাধনার প্রথম অবস্থায় যেমন আমি একটা কিছু পাবার জন্য চেষ্টা করব, তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝতে চেষ্টা করব যে সে বস্তুটা আমাকে পেয়েই রয়েছে। আমরা একটা দিকের উপর জোর দিই, আর একটা দিককে সরিয়ে রাখি। তাতে বিশ্বাস করি না। কেননা সে প্রাপ্তিকে আমরা বুঝতে চাই দেহ প্রাণ মনের অনুভব দিয়ে। যেমন একটা কথা আমরা বলি, ঈশ্বর যদি থাকেন তাঁকে চোখে দেখব, তখন ঈশ্বর-দর্শন হবে। একথাটা আমাদের খুব চলতি। মা এসে দেখা দেবেন, মা আমাদের সাথে কথা বলবেন। হ্যাঁ, তিনি দেখা দেবেন, কথা বলবেন, সবই সত্যি। কিন্তু তার জন্য প্রস্তুতি যেটা, সেটা হচ্ছে এই দেখা দেবার, কথা বলবার

আকাঙ্ক্ষাকে ছাড়া। সেটার কথা গোড়াতেই বলা হয়েছে যে তার রূপ তোমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় না, এই চোখ দিয়ে তাকে তুমি দেখতে পার না। অথচ এই উপনিষদেই বলা হচ্ছে, তিনি রূপে রূপে প্রতিরূপ। চোখ মেলে তাঁকেই দেখছি। আবার এই যে তাঁকে দেখা যায় না আর তাঁকে সর্বত্র দেখছি, এর মাঝামাঝি একটা অবস্থা আছে, যেখানে তাঁকে আমি আমার ভাবের অনুরূপ করে দেখছি। এইটা একটা কামনা। কামনা সম্পর্কে গীতায় একটা সুন্দর বিশ্লেষণ রয়েছে—সেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, ইন্দ্রিয়ানি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে। কামনার অধিষ্ঠান হচ্ছে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি। ইন্দ্রিয়ের যে কামনা তার সাথে আমরা পরিচিত। যা অলব্ধ, অসিদ্ধ, অদৃষ্ট তাকেই আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে লাভ করতে, সিদ্ধ করতে, দর্শন করতে চাই। এটাই হচ্ছে সেই ইষ্ট বস্তুর সঙ্গে আমাদের সব চাইতে বড় ব্যবধান। তারপর আর একটা ব্যবধান সৃষ্টি হয়, সেটা সূক্ষ্ম। তা হল মনের ব্যবধান। কামনা তখন মনের আশ্রিত, মন তার অধিষ্ঠান। মনের কামনা—যেমন রূপকল্পনা। এর সঙ্গে আমরা পরিচিত। অনেক বস্তু আমরা যেমন স্থূলে চাই—তেমনি অনেক কিছুই মনে চাই। মনটাকে ভরাতে চাই। এই যে ইন্দ্রিয়ের কামনা ও মনের কামনা—এই দুটিকে বর্জন করতেই হবে। সর্বত্র বৈরাগ্যের একটা উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আসক্তি বর্জন করার কথা বলা হয়েছে। আসক্তি বর্জন করতে হবে স্থূলে ও সূক্ষ্মে। যেমন ইন্দ্রিয় দিয়ে সম্ভোগ করি তেমনি মন দিয়েও সম্ভোগ করি। তার থেকেও সূক্ষ্মতর সম্ভোগ রয়েছে—বুদ্ধির সম্ভোগ। বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় রূপও আছে। আমরা তাকে পেতে চাই। যার কথা আগে বলেছিলাম, একটা নিত্য ভাবরূপ। সেটা মনের ওপারে ফোটে। মন তার খানিকটা আভাস পায় এবং তাই দিয়ে সে ইষ্টমূর্তির কল্পনা করে। কতকগুলি কল্পনা সর্বজনীন হয়। কিন্তু এ সমস্ত কল্পনার বাইরে ঊর্ধ্বে আর একটা কল্পনা রয়েছে যেখানে সেই ইষ্টের বিগ্রহ শুদ্ধসত্ত্ব দিয়ে গড়া। সে বিগ্রহকে রচনা করে আমাদের বুদ্ধি বা বোধশক্তি। এটা হচ্ছে রূপের সংস্কার। রূপ বলতে এখানে শুধু চোখে দেখাকে বলছি না, কোনো কিছুকে বিষয়ী থেকে আলাদা করে বিষয়রূপে অনুভব করা, তাকেই বলছি রূপ। এই রূপের সংস্কার যে-পর্যন্ত আমরা না ছাড়তে পারি সে-পর্যন্ত দর্শন সম্যক্ হয় না। গীতাতে যে বলা হয়েছে বুদ্ধিও কামনার অধিষ্ঠান, এখানে সেটাকেই বলা হচ্ছে **হৃদিশ্রিত কাম**। সমস্ত কামনাই মূলত বুদ্ধিগত অথবা হৃদ্‌গত। হৃদয়ের গভীরে যে কামনা রয়েছে তারই পরিতৃপ্তি আমরা খুঁজি ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে অথবা মনের ভিতর দিয়ে। এই দুটিকে আমরা চিনি। কিন্তু তাদের মূলে রয়েছে ওই হৃদ্‌গত কামনা অর্থাৎ যেটা অরূপেরই রূপবাসনা। এই হৃদ্‌গত কামের একটা বিশ্বরূপ আছে যা সৃষ্টির ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায়। সোঽকাময়ত অহং বহু স্যাং প্রজায়েয়। এই যে তাঁর কামনা, সে কামনার ছায়া আমাদের মধ্যেও পড়ে। আমাদের হৃদয়ে সেই কামনা গাঁথা রয়েছে। কিন্তু সেই কামনার ঊর্ধ্বে রয়েছেন **তৎ**। তাঁরই কামনা, সে কামনায় কোনো বন্ধন নেই। অতএব তাঁকে বলা যায় তিনি আপ্তকাম। কিংবা তিনি অকাম। তিনি সব পেয়ে রয়েছেন অথবা তিনি কিছুই চাইছেন না। এইটাই হল সেই পরবৈরাগ্য, গুণবৈতৃষ্ণ্য। এই ভাবটিকে রূপ দেওয়া হয়েছে শিবের মাঝে। শিব কিছুই চান না, এটা বোঝাতে তাঁকে করা হয়েছে দিগম্বর, শ্মশানচারী অথচ তিনি সব পেয়ে রয়েছেন, এটা বোঝাতে তাঁরই অঙ্কে স্থাপন করা হয়েছে গৌরীকে। এই যে শিবের ভাব, এটি হচ্ছে যখন আমার হৃদ্‌গত কামনা উচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এটা একটা

প্রমুক্তি। প্রমুক্তি বলা হয় তাকে যখন একে একে বাঁধন খসতে থাকে। মুক্তির মাঝেও একটা প্রগতি রয়েছে যেমন অন্ধকারের বুক আলো হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে। এর কথাই শেষ শ্লোকে বলা হয়েছে। বলা হবে যে নিজের ভিতর থেকে সে নিত্য স্বরূপকে আবিষ্কার করতে হবে ধৈর্যেণ। সেই পরম অস্তিত্বে সমস্ত চেতনাকে পূর্ণ করতে হবে, আর দেখব যে ধীরে ধীরে সব আলো হয়ে উঠছে, ইন্দ্রিয়ের কামনা যাচ্ছে, মনের কামনা যাচ্ছে। হৃদয়ের মাঝে যে কামনা রয়েছে, বুদ্ধিগত যে সংস্কার রয়েছে, তারও মুক্তি হবে। তাতে কি আমরা সব হারাচ্ছি? না সবই পাচ্ছি। অনায়াসে পাচ্ছি। এমনি করে যে পর্যন্ত না পাই, সে পর্যন্ত নানা আকুলিবিকুলি দিয়ে শুধু আমরা আমাদের নিজেকে ভোলাই। এটাকে আমরা যেই অন্যভাবে বুঝতে পারি যে তিনি আমাকে পেয়েই রয়েছেন, তখন আর হৃদয়ে কামনা থাকে না। তাঁর হৃদয় তাঁরই রসে, তাঁরই ভাবে, তারই শূন্যতায় পূর্ণ হয়ে যায়। এই যে ভাব, এতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। তাহলেই **অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে**। অত্র, এই জীবনে, এই ব্যুত্থান দশায়, এই চোখ মেলে, সেই বৃহৎকে আমরা সম্ভোগ করব। অর্থাৎ কামনার পরিতর্পণ। তখন কোনো একটা অলব্ধ বস্তুর লাভ করার ফলে নয়, স্বতঃসিদ্ধি। বস্তু লব্ধই। আর যে লব্ধ বস্তু সেটা সকল সম্ভোগের নিদান। অস্তিতা থেকে আনন্দ উৎসারিত। যত কিছু কামনা সমস্ত হচ্ছে সেই আনন্দ পাওয়ার জন্য। কিন্তু সে আনন্দ আছেই, ছিলও, ছিল সেই 'তথতাতে' বা তত্ত্বভাবে, 'অস্তিতা'তে।

এখানে আমরা তিনটি পর্ব পাচ্ছি। একটা নেতির বোধ, শূন্যতা, যাকে এখানে বলা হয়েছে তত্ত্বভাব। তাকে অবলম্বন করে অস্তিত্বের বোধ অর্থাৎ কিছুই যে নেই, সেটাই আছে। আর এই অস্তিত্বের বোধ থেকে উৎসারিত একটা সমশন, একটা সম্ভোগ, একটা নিত্য উৎসারিত আনন্দ, যে আনন্দ আত্মস্বরূপেরই আনন্দ, যার কোনো উপলক্ষ্য দরকার হয় না।

১৫।। আগের মন্ত্রটিতে যা বলা হয়েছিল এখানেও সেই কথাটিই বলা হচ্ছে। শুধু কামের জায়গাতে **গ্রন্থি** শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে। সে গ্রন্থি দিয়ে আমরা কামের স্বরূপটাকে বুঝতে পারি। হৃদয়ের মাঝে যেন একটা গাঁট পড়ে গেল। একটা গ্রন্থি দিতে হলে সে দড়িটাকে বাঁকিয়ে নিতে হয়, বাঁকিয়ে নিয়ে এমনভাবে একটা ফাঁস দিই যাতে সেটাকে আর পরে খুলতে পারি না। অর্থাৎ বক্রতা যেটা সেটা চিরন্তন বক্রতা হয়ে যায়। এইটিই হচ্ছে আমাদের মাঝে নিরূঢ় সংস্কার, যা আমাদের মাঝে মজ্জাগত হয়ে থাকে, কিছুতে তাকে আমরা ছাড়াতে পারি না। এইগুলিকে বলা হয় গ্রন্থি। আজকাল এইগুলিকে আমরা বলি complex, neurosis। আধুনিক মনোবিজ্ঞান বলছে যে আমাদের মাঝে কতকগুলি complex কিংবা neurosis রয়েছে আমাদের অবচেতনায়, সেগুলি সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না, অথচ তাদেরই অনুশাসনে, তাদেরই প্রশাসনে এই জীবনটা চলে। আমার মনের মাঝে একটা দুঃখ দেখা দেয়, কোথা থেকে দুঃখ এসেছে আমরা বুঝতে পারি না। তেমনি সংস্কারবশত কত কাজ আমরা করি। কেন করি খুঁজে পাই না, অর্থাৎ আমাদের এই বাইরের মন তার কোনো খবর রাখে না। এইগুলিই হচ্ছে সেই গ্রন্থি, মজ্জাগত সংস্কার, যাকে আমরা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারি না। হাজার বোঝালেও বুঝি না যে এইগুলি সর্বনেশে। এই গ্রন্থি থাকে খুব গভীরে, এজন্য উপনিষদে তাকে বলা হয়েছে হৃদয়গ্রন্থি। হৃদয় বলতে বোঝানো হচ্ছে আমাদের সত্তার গভীরে আত্মচৈতন্যের সেই

সরল স্বচ্ছতা যা আমাদের সবাইয়ের সঙ্গে এবং তাঁর সঙ্গে যুক্ত রাখে। হৃৎ কথাটা এসেছে √হৃ ধাতু থেকে। হৃ ধাতুর একটা অর্থ হচ্ছে আলো দেওয়া to shine। হৃৎ হচ্ছে যা আলো দিচ্ছে। যার কথা আগে বলা হয়েছে, আমাদের মাঝে সেই অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ মধ্যে আত্মনি তিষ্ঠতি, যিনি জ্যোতিরিবাধূমকঃ। এই দেহের মাঝে অধূমক জ্যোতিরূপে যে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ রয়েছেন তিনিই হৃদয়। আধুনিক পরিভাষায় যাকে আমরা বলি psychic being। বলা যেতে পারে সে যেন একটা আলোর শিশু, শিশুর মতো সে সরল, সে স্বচ্ছ। এই যে স্বচ্ছতা, এই যে সরলতা, এটার উপরে একটা পাশ জড়িয়ে যায়। কোথা থেকে জড়ায়, সে আমরা বলতে পারি না। এমন বলা যেতে পারে যে, এই পাশবদ্ধতা এইটিই ছিল আদিম। অর্থাৎ জড়ত্ব হচ্ছে চৈতন্যের একটা প্রতিষেধ। চৈতন্যের থেকেই চৈতন্যের প্রতিষেধ, চৈতন্য যেন নিজেকেই জানছেন অচেতনরূপে। এইটাই মায়। কী করে সে হয় সেটা আমরা বুঝতে পারি না। এই জন্য তন্ত্রে মায়াকে বলা হয়েছে নিষেধব্যাপাররূপা। আমি, আমি নই। যে আমি স্বচ্ছ, যে আমি সরল, যে আমি শিশুর মতো, তাকে আমিই প্রত্যাখ্যান করছি। এই প্রত্যাখ্যানকে অবলম্বন করেই দেখা দেয় জড়ত্ব, সে-ই আলোটাকে এমনভাবে চেপে ধরে যেন মনে হয় কোনোদিকেই তার মুক্তি ঘটবে না। এটাই গ্রন্থি। অবচেতনার নিগূঢ়তম সংস্কার। এই গ্রন্থি সহজে কাটে না। যা আমাদের চেতনারূপে আসে, যাকে আমরা মন দিয়ে ধরতে যাই, বুদ্ধি দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করি, তার হাত থেকে আমরা মুক্তি পাই। কিন্তু এই যে অবুঝ সংস্কার তার থেকে মুক্তি পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। অথচ তার জন্য আমরা বেদনাও ভোগ করি। সব সময় করি না, অনেক সময় আমরা বুঝতেই পারি না কত গ্রন্থি আমাদের মাঝে রয়েছে। তবে আমাদের মাঝে আলোর ক্রিয়াও সব সময় হচ্ছে। একটা সময় আসে যখন বুঝি যে মনের মাঝে যেন বাঁক রয়েছে, কত গিঁট রয়েছে অন্তরে, খুলতে চেষ্টা করি কিন্তু খুলতে পারি না। এরও পরে একটা অবস্থা রয়েছে যখন দেখি যে গ্রন্থিগুলি ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে। তবে সেই বিষয়ে উপনিষদ বলেন যে খুলে যাওয়াটা এত সহজ নয়। এই গ্রন্থিগুলিকে ভেদ করতে হবে। সেই আলোর শক্তি দিয়ে তীব্রভাবে আঘাত করতে হবে, যাতে এ খুলে যায়। এই গ্রন্থিদের কথা তন্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের চেতনায় পরপর তিনটি গ্রন্থি রয়েছে—ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি, রুদ্রগ্রন্থি। তাঁরা বলেন যে ব্রহ্মগ্রন্থি রয়েছে মণিপুরে, নাভিতে। বিষ্ণুগ্রন্থি রয়েছে হৃদয়ে, অনাহতে। আর রুদ্রগ্রন্থি রয়েছে ভ্রূমধ্যে, আজ্ঞাচক্রে। মণিপুর বা নাভিকে আমরা বলতে পারি আমাদের প্রাকৃত জীবনের মূল, মূলকেন্দ্র। যখন মাতৃগর্ভে ছিলাম, তখন ঠিক ফলের বোঁটার মতো এই নাভিরজ্জু দিয়েই আমরা মায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। এই নাভিকে অবলম্বন করেই মায়ের সত্তার রস, শক্তি, ভাব আমাদের ভিতরে সঞ্চারিত হয়েছে। এটাই আদিগ্রন্থি, সে গ্রন্থি বাঁধা হয়েছিল মাতৃগর্ভে থাকতে। তাঁরা এটাকে ব্রহ্মগ্রন্থি বলেন এইজন্য যে—প্রজাপতির যে একটা সৃষ্টিলীলা চলছে, যার মাঝে একটা যান্ত্রিক আবর্তন রয়েছে, যে গ্রন্থিটি হচ্ছে এই গ্রন্থি। এই যান্ত্রিক আবর্তনের লক্ষণ কী? তাঁরা বলেন, সমস্ত জীবের মাঝে আহার মৈথুন নিদ্রা—এই যে তিনটি বৃত্তি রয়েছে এইটাই হচ্ছে যান্ত্রিক আবর্তন। জীব আহার দিয়ে নিজেকে পুষ্ট করছে, তারপর আবার সন্তান উৎপাদনের চেষ্টায় বহু হচ্ছে এবং ঘুমোচ্ছে কিংবা মরে যাচ্ছে। এই আবর্তনটা সর্বজীব-সাধারণ। এটাকে অবলম্বন করেই প্রজাপতি তাঁর সৃষ্টিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এইটাই ব্রহ্মগ্রন্থি,

আমাদের প্রাকৃত-জীবভাব। তার ঊর্ধ্বে ওঠাই হল ব্রহ্মগ্রন্থির ভেদ। ভেদ আমরা আগেই করতে পারি। একটা সময় আসে যখন শ্রদ্ধার আবেশে আমরা অনুভব করি যে, এই যে প্রাকৃত জীবন, আহার-মৈথুন-নিদ্রার যে জীবন, তার ঊর্ধ্বে আর একটা কিছু আছে। আভাসে অনুভব করি, কিন্তু তাকে পাই না, পাওয়ার জন্য একটা ব্যাকুলতা জাগে। এটা হল আমাদের চেতনার বোধন। যখন উদ্বুদ্ধ হলাম, বৈদিক ঋষির ভাষায় আমাদের মাঝে যখন অগ্নি সমিন্ধন হল, আগুন যখন জ্বলল, তখন প্রয়োজন, আত্মবীর্য দিয়ে সে আগুনকে আরও উজ্জ্বল করে তোলা। এইজন্য তাঁরা সেই আগুনকে অর্থাৎ অভীপ্সার আগুনকে বলতেন সহসঃ সূনুঃ, উৎসাহসের পুত্র। যখন আমরা সে বস্তুর আভাস পাই, তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল হই, তখনও আমাদের জৈব সংস্কার আমাদের ছাড়ে না, সেগুলিকে প্রবলভাবে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এটা হল গ্রন্থিভেদ। যখন নাভির গ্রন্থি ভিন্ন বা ছিন্ন হল অর্থাৎ জৈব সংস্কারের ঊর্ধ্বে আমরা উঠলাম, তখন চেতনা এল হৃদয়ে। হৃদয় ভাবের ক্ষেত্র। এখানে রয়েছে আমাদের রসচেতনা। আলোও রয়েছে, যাকে বেদে বলা হয়েছে হার্দজ্যোতি। হৃদয় দিয়েই আমরা বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হই। যখন নাভিতে ছিলাম তখন ছিলাম একা, সমস্ত জগৎটা আমাকে কেন্দ্র করেই ঘুরছে। যখন হৃদয়ে এলাম, তখন সবাইকে পেলাম, চেতনা বিস্ফারিত হল, জাগল প্রসন্নতা, আনন্দ, রসচেতনার অনুভব। তবুও এটা একটা গ্রন্থি, একটা বন্ধন। অভাবের বন্ধন নয়, কিন্তু ভাবের বন্ধন। এর গভীরে রয়েছে রসাস্বাদের একটা আকাঙ্ক্ষা। একেই আগে বলা হয়েছে হৃদ্‌গত কাম, রূপবাসনা। পুরাণে এটাকে বলা হয় বিষ্ণুমায়া, বিষ্ণুর মোহিনী মায়া। এই মায়া অবশ্য ব্রহ্মার যে জগৎ গড়বার মায়া তা নয়। এটাকে একদিক থেকে বলা যেতে পারে যেন বিদ্যামায়া, একটা আলোর আড়াল। এইটাই হল বিষ্ণুগ্রন্থি বা হৃদ্‌গ্রন্থি। যদি এইটা আমরা ভেদ করতে পারি, চেতনা তখন আরও ঊর্ধ্বে ওঠে, ভূমধ্যে। ভেদের রীতি সর্বত্রই এক। প্রথম একটা আভাস জাগে, তারপর চেতনার নিম্নভূমি থেকে পূর্বের চেতনাগুলি বাধা দিতে থাকে তখন বীর্যপ্রকাশ করতে হয়। সে বীর্যকে বলা হয় ওজঃ, ইন্দ্রের বজ্রশক্তি, একটা indomitable will, এমন দৃঢ় একটা ইচ্ছাশক্তি যার কাছে সমস্ত কিছুই পরাভূত হয়। সেই ইন্দ্রশক্তি দিয়ে সবলে এই বিষ্ণুগ্রন্থিকে ভেদ করি। চেতনা তখন জাগে ভূমধ্যে আজ্ঞাচক্রে। এখানে রয়েছে রুদ্রগ্রন্থি। ভূমধ্যের নিচের সমস্ত জগৎ অস্তির জগৎ, অস্তির বৈচিত্র্য ফুটেছে সেখানে। তার ওপারে যাকে তন্ত্রে বলা হচ্ছে সহস্রার, সেটা হচ্ছে অস্তি নাস্তির একটা মিথুন। তন্ত্রে বলে এইখানে শিবশক্তির সামরস্য।

আগে বলেছিলাম, ভূমধ্যে যে বিন্দুচেতনা, সেখান থেকে দুটি রেখা নিচের দিকে যাচ্ছে। আবার সেই রেখা দুটিই প্রসারিত হয়ে একটা কোণ উৎপন্ন করে উপরের দিকে যাচ্ছে, ঠিক যেন একটা গুণচিহ্নের মতো, একটা ডমরুর মতো। এই গুণচিহ্নের যে মধ্যবিন্দু, সেটাই হল রুদ্রগ্রন্থি। হৃদয়ে যখন বিশ্বকে পেলাম, তখন আমাদের যে উল্লাস, সে উল্লাসকে কেন্দ্রিত করে টেনে তুলতে হবে উপরের দিকে। গৌড়পাদের ভাষায় বলতে গেলে, রসাস্বাদ বর্জন করতে হবে। সংহত চেতনা ঊর্ধ্বদিকে গিয়ে যখন বিস্ফারিত হয় তখন সেই অস্তিনাস্তির মিথুনের বোধ জাগে। এই বোধ হচ্ছে সামরস্য। তাকে আমাদের এখানকার কোনো আনন্দ দিয়ে আমরা বোঝাতে পারি না। সেটা একটা অদ্ভুত গভীর প্রশান্তি, আর সেই প্রশান্তির গভীরে বিপরীতক্রমে একটা আনন্দের উল্লাস। সে আনন্দ

এখানকার বোধে ধরা যায় না। এখানকার যে আনন্দ তাকে আনন্দ না বলে সুখ বলাই উচিত। এখানকার সুখকে আমরা অনুভব করি উত্তেজনারূপে। উত্তেজনা যত বাড়ে আমরা তত খুশি হই। ভাবি যা চেয়েছিলাম এইবার তা পুরোপুরি পেলাম। সামরস্যের বোধ কিন্তু ঠিক তার বিপরীত। সেখানে যেটা পাওয়া সেটা গভীর প্রশান্তিতে তলিয়ে যাওয়া। সুষুপ্তির গভীরে যে শান্তি, তাতে আমরা তার খানিকটা আভাস পেতে পারি। এইটাই গম্ভীরানন্দ। এইটাই সেই বিপ্রলব্ধা রাধার ভাবসম্মিলন, সে ভাবের সম্বন্ধে যে সমস্ত ছবিগুলি আমরা ফোটাই, তার মাঝে কিন্তু বৈষ্ণবী মায়ার ছবিগুলিই ফুটতে থাকে। মায়ার সংস্কার দিয়েই আমরা ছবি আঁকি। ছবিগুলি সত্য হয় না। এই যে সামরস্যের আনন্দ, সেটাকে আমরা লাভ করতে পারি যদি ভ্রূমধ্যের রুদ্রগ্রন্থিকে ভেদ করি। এখানে শুধু হৃদ্‌গ্রন্থি-ভেদের কথা বলা হয়েছে। রুদ্রগ্রন্থি ভেদের যে সংস্কার সেটা আপনা থেকেই উৎপন্ন হয়। সেখান পর্যন্ত আমরা উঠতে পারি নিজের চেষ্টায়, কিন্তু তাকে ভেদ করা প্রসাদ বা শক্তিপাতসাপেক্ষ। তবে সেটা হয়ে যায়। যখন হৃদ্‌গ্রন্থি ভিন্ন হয়, যার কথা এখানে বলা হয়েছে, অর্থাৎ চেতনা যখন ভ্রূমধ্যে থেকে ঊর্ধ্বে এবং অধে প্রসারিত, তখন এই মর্ত্য অমৃত হয় এবং এইখানেই সে ব্রহ্মকে সম্ভোগ করে।

১৬।। যোগের দুটি ধারা আছে, একটা রাজযোগ, একটা হঠযোগ। রাজযোগে প্রধান অবলম্বন হয় মন আর হঠযোগে শরীর। শরীরকে আশ্রয় করলেও তার মাঝে মনের প্রাধান্য থাকেই। কিন্তু সাক্ষাৎভাবে শরীরকেই সেখানে অবলম্বন করা হয়। সমস্ত যোগের মূল হচ্ছে ধারণা। প্রত্যাহার থেকে ধারণা। চেতনা চারদিকে ছড়িয়ে আছে, সেটাকে গুটিয়ে আনতে হবে, এনে নিজের শরীরের মাঝেই কোথায় সেটাকে ধরে রাখতে হবে। এটা আমরা নিজেরা চেষ্টা করলে বুঝতে পারি যে কার কোথায় ধারণা হয়। এই হল একটা ধারা। অর্থাৎ চিত্তকে একাগ্র করতে গিয়ে যেখানে সে একাগ্রতাটা আমরা তীব্র বলে অনুভব করি, সেটাকে একটা চক্র কিংবা একটা পদ্মরূপে কল্পনা করে সেইখানেতে চেতনাকে ধরে রাখবার চেষ্টা।

আর একটা হচ্ছে আত্মকেন্দ্র থেকে নিজেকে বিচ্ছুরণ করা। সেখানেও আমরা দেহকে অবলম্বন করি। কিন্তু নিজের মাঝে তলিয়ে না গিয়ে সেখান থেকে বাইরে ছড়িয়ে দেওয়া, এটাও একরকম ধারণা। পতঞ্জলি এটাকে বলেছেন, মহাবিদেহ-ধারণা, এটা অকল্পিত বৃত্তি। একটা মন্ত্রে আগে বলা হয়েছিল, ধাতুপ্রসাদাৎ মহিমানম্ আত্মনঃ। এটা হচ্ছে মহাবিদেহ-ধারণার অনুকূল। রাজযোগের মোক্ষসাধনা এটাকে অবলম্বন করে। ধাতু বলতে আমরা সত্ত্ব, being বুঝি, অথবা being-এর উপাদান বললে আরও ভাল। এটাকে বুঝতে হবে চেতনা দিয়ে in terms of consciousness। অর্থাৎ একটা সংস্কার উৎপন্ন হবে যে আমার দেহ প্রধান নয়, দেহবোধই প্রধান। দেহ objective আর দেহবোধ subjective। অপরের দেহ আমরা চোখের সামনে দেখি এবং তার থেকে নিজের দেহ সম্পর্কে একটা কল্পনা উৎপন্ন হয়। এই কল্পনায় থাকতে নেই। সাক্ষাৎভাবে আমার দেহ সম্পর্কে আমার একটা বোধ রয়েছে, এই বোধটাকে আবিষ্কার করতে হয়। তাকে জাগ্রত করতে হয়। তখন সর্বদেহব্যাপী যে-বোধ তার মাঝে আমরা চেতনার ঘনতার একটা তারতম্য দেখতে পাই। কখনও সে বোধ আচ্ছন্ন, কখনও উদ্দীপ্ত। কখনও আকাশবৎ। এই যে সেটাকে আকাশবৎ প্রসন্নরূপে অনুভব করা, যার মাঝে নিজের দেহটা যেন একটা

কাঁচের বাল্‌বের মতো, ভিতরে আলো, যে আলো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে, এই ভাবের যে সাধনা, এটা হচ্ছে সেই মহাবিদেহ-ধারণার অনুকূল। একে আগে বলা হয়েছে ধাতুপ্রসাদ। এই গেল একটা ধারা।

অন্যত্র বলা হয়েছে, যাঁকে জানতে চাই তিনি অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্। অণু হতেও তিনি অণুতর, মহৎ হতেও তিনি মহত্তর। তাহলে ভাবনার আর একটা ধারা রয়েছে, সেটা বাইরে থেকে নিজেকে গুটিয়ে আনা। একটা যেন প্রবাহে ছড়িয়ে পড়া, মহৎ থেকে মহত্তর হওয়া। আর একটা তেমনি ক্রমশ গুটিয়ে আসা, অণু হতে অণুতর হওয়া। অণু কথাটা এই উপনিষদে অনেকবার বলা হয়েছে। চিত্তবৃত্তির এই যে দুইটি ধারা—একটি বিস্তার, একটি সঙ্কোচ—এই দুটিতেই অভ্যস্ত হতে হবে। দুটিতেই দেহ অবলম্বন হয়, কিন্তু একটিতে প্রবল থাকে, কিংবা প্রধান থাকে ভাবনা। পতঞ্জলির ভাষায় প্রযত্ন-শৈথিল্য ও অনন্ত-সমাপত্তি। নিজেকে আল্‌গা করে ছেড়ে দেওয়া, অনন্তের মাঝে নিজেকে ব্যাপ্ত করা। আর একটা ভাব রয়েছে, যা ছড়িয়ে রয়েছে তাকে হঠপূর্বক জোর করে নিজের মাঝে টেনে আনা। এই ধারাতে চললে পর নাড়ীবিজ্ঞান হয়। এই শ্লোকে তারই কথা বলা হচ্ছে। এই উপনিষদের মাঝে দুটি ধারা ওতপ্রোত হয়ে আছে। কঠোপনিষদ যেমন রাজযোগের বীজ তেমনি হঠযোগেরও বীজ।

হঠযোগের দুটি রীতি বলা যেতে পারে। একটি প্রাণ-সংযম, আর একটি হচ্ছে এই নাড়ীবিজ্ঞান। প্রাণ-সংযমের কথা কঠোপনিষদে বিশেষ করে বলা হয়নি। সেটা অন্য উপনিষদে আছে। এখানে যে নাড়ীবিজ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, এটা খুব প্রাচীন। সেটা অন্য উপনিষদের অন্যান্য অংশে তো আছেই, প্রাচীন উপনিষদগুলিতে, এমনকী এটার একটা উদ্দেশ পাওয়া যায় ঋক্-সংহিতাতেও। এখানে প্রথমে বিবৃত করা হচ্ছে নাড়ীজালের একটা ছবি। এই নাড়ীজাল বা নাড়ীতন্ত্র, যেটাকে আমরা বলি nervous system, সেটা সম্পর্কে একটা বর্ণনা অন্যত্র আছে। বলা হয়েছে যেমন একটা অশ্বত্থ পাতাকে যদি ক্রমশই পচিয়ে দেওয়া হয়, তবে তার মধ্যে শিরাজাল যেমন সর্বত্র ব্যাপ্ত দেখা যায়, তেমনি আমাদের শরীরেও শিরাজাল এরকমভাবে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। তার ভিতর দিয়ে প্রাণ সঞ্চরণ করে। একটি উপনিষদে আছে যে এই শিরার সংখ্যা, (শিরা বলতে আমরা যাকে nerve বলি তাকেই mean করা হয়েছে) বাহাত্তর হাজার। এখানে বলা হয়েছে একশ এক। এই যে নাড়ীজাল সেটা ব্যাপ্ত হয়—এখানে বলা হচ্ছে—হৃদয় থেকে। আগে আমরা দেখেছি, অশ্বত্থের বর্ণনায় নাড়ীজালের ব্যাপ্তি দেখান হয়েছিল মূর্ধা থেকে, Brain থেকে নীচের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এখানে বলা হয়েছে যেন হৃদয় থেকে ছড়িয়ে পড়ছে। এই দ্বিতীয়টা psychologically correct নয়, কিন্তু ভাবনার জন্য এটা প্রয়োজন। আগে যেটা বর্ণনা করা হয়েছিল, একটা অশ্বত্থ গাছ উল্‌টে রাখলে যেরকম হয়, নাড়ীজাল ঠিক তেমনি, psychologically সেটা correct। এই মন্ত্রের বর্ণনা হল, ধারাটা যখন উজান বেয়ে যায়, তখনকার জন্য। হৃদয় থেকে ঊর্ধ্বমুখী হবে সেই উজান ধারা। আবার যখন নেমে আসবে তখন কিছু ভাবনা করতে হয় না, সহজ একটা অনুভব হয়। তারই বর্ণনা আছে ওই অশ্বত্থ গাছ উল্‌টে দিলে যা হয়, তার ছবিটাতে।

এখানে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে বৃহদারণ্যকে যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে সেটার। সেখানে বলা হয়েছে যে হৃদয় থেকে আরম্ভ করে

মাথার দিকে একটা নাড়ী চলে গিয়েছে, তাকে বলা হয়েছে হিতা নাড়ী। এই হিতা নাড়ী মূর্ধার ভিতর দিয়ে সূর্যমণ্ডল পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাতে একটা পথ তৈরি হয়েছে, আলোর পথ। হৃদয় থেকে এই পথ বেয়ে সে সূর্যমণ্ডলে পৌঁছতে পারে। এই ভাবনার মূল রয়েছে অন্যান্য উপনিষদে এবং ঋগ্বেদেও। আগেও বলেছি যে সূর্যমণ্ডলকেই মনে করতে হবে আমার প্রাণ এবং চেতনার উৎস। আমরা সূর্যের থেকেই এসেছি, আবার সেই সূর্যেই ফিরে যাব। মৃত্যুর পরেও যেমন সূর্যকে পাব তেমনি এই জীবনেই তাঁকে পাব। ঈশ উপনিষদে রয়েছে সূর্যমণ্ডলে কল্যাণতম রূপ দর্শন করবার কথা। আর শেষে সেই রূপ দর্শন করে বলছেন, যো অসৌ অসৌ পুরুষঃ, সোঽহম্ অস্মি। এখানে সূর্যমণ্ডলের ভাব নিয়ে বেঁচে থাকছি। তার থেকে একটা কল্পনা এসেছে যে সূর্যমণ্ডল থেকে রশ্মিগুলি ছড়িয়ে পড়েছে, তার একটি রশ্মি আমার মস্তক ভেদ করে, ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে হৃদয়ে এসে জীবচেতনা হয়েছে। পরের শ্লোকে যাঁকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ বলা হয়েছে, অন্যত্র তাঁর উল্লেখ আছে এই উপনিষদেই, সে জীব হয়েছে। এই যে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ, যাঁকে মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ, তিনি হলেন সূর্যেরই প্রতিনিধি। এই হৃদয়স্থ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে যদি আমরা উদ্দীপ্ত করতে পারি তাহলে সূর্যের সাযুজ্য লাভ করব এই একটা ভাবনা ছিল। যে পথ দিয়ে সূর্যরশ্মি আমাদের মাঝে প্রবেশ করেছে এবং যেন হৃদয়ের মধ্যে একটি বিন্দু আকার ধারণ করেছে, সে পথের আর একটা নাম হচ্ছে সুষুম্ণ। যজুর্বেদে তার কথা আছে। আর একটি বেদে তাকে বলা হয়েছে সুষোমা নদী। এরই ভিতর দিয়ে চেতনার অমৃতপ্রবাহ যখন উপরের দিকে, তেমনি নিচে নেমে এসেছে। এই অমৃতপ্রবাহ যখন উপরের দিকে বয়ে চলে তখন তাকে বলা হয় ইন্দু। যখন নিচের দিকে নেমে আসে তখন বলা হয় অন্ধঃ। ইন্দু আর অন্ধঃ দুটিই হচ্ছে সেই আনন্দচেতনা। অন্ধঃ হচ্ছে, যাকে পুরাণে বলা হয়েছে, গঙ্গার ভোগবতী ধারা। সেটা চলেছে পাতালের দিকে। এটি হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়সুখ। আর যা ইন্দু, তা হচ্ছে স্বর্ণদী—আকাশগঙ্গা। একে অলকানন্দাও বলা হয়। এইটাই হচ্ছে ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত উত্তমসুখ। এইগুলি হচ্ছে উপনিষদে যেগুলি সংক্ষেপে বর্ণিত করা হয়েছে ইঙ্গিতরূপে।

হঠযোগীরা এটাকে পরে develop করেছেন, ফুটিয়ে তুলেছেন এইভাবে যে, ধারাটা রয়েছে আমাদের মেরুদণ্ডের মাঝে। মেরুদণ্ডের কথাটা উপনিষদে নেই, কিন্তু বোঝা যায় যে এটা অজানা ছিল না। সেখানে শুধু নাড়ীর কল্পনাটাই পাই, এই নাড়ী কোথায় তার বর্ণনা নেই। এই নাড়ী যে মেরুদণ্ডে, এ বোধটা আমরা পাই সঙ্কর্ষণের বোধ থেকে, সব থেকে নিজেকে যখন ভিতরে গুটিয়ে আনি তখন। এই গুটিয়ে আনবার সময় তিনটি গতিকে অবলম্বন করতে হয়। একটা গতি বাইরে থেকে ভিতরের দিকে অর্থাৎ যেটা আমাদের সেই frontal consciousness হয়ে রয়েছে, বহিশ্চেতনা, যেটাকে অন্তশ্চেতনায় রূপান্তরিত করতে হবে। চিত্তকে অন্তর্মুখ করলে এটা স্বভাবতই হয়। আমরা সাধারণত খুব বেশি গভীরে যাই না, হৃৎপিণ্ডের পিছনে খানিকটা দূর হয়তো যেতে পারি। কিন্তু চিত্ত যখন খুব তন্ময় হয়, তখন সেটা গিয়ে ওই মেরুদণ্ডকে স্পর্শ করে। সেই মেরুদণ্ডেতে বাস সম্ভব। এটাই পুরাণে বলা হয়েছে, সুমেরুতে দেবতা আর কুমেরুতে অসুর। সুমেরু উত্তরে আর কুমেরু দক্ষিণে। একটা জ্ঞান আর একটা কর্ম। এইটাই হঠযোগে একটা সহস্রার আর একটা মূলাধার। তার মাঝে প্রাণের স্রোত ওঠানামা করছে।

এই মেরুদণ্ড সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা প্রথমত দরকার। আমাদের চিত্তবৃত্তির যে ক্রিয়া হয় সেটা প্রবৃত্তিবশে হয় এবং সাধারণত হয় সেটা হৃদয় থেকে। বাইরে কোনো একটা কিছু যখন আমাদের আঘাত করে তখন আমরা সাড়া দিই হৃদয় দিয়ে। একটা ভাবনা emotion আমাদের মাঝে জাগে, সেই ভাবনা emotion আমাদের বাইরে প্রক্ষিপ্ত করে। আমরা react করি। যদি শরীরতত্ত্বের দিক থেকে বলা যায়, তাহলে বলতে পারি, এই সমস্ত ব্যাপারটা আমাদের রক্তচলাচলের উপর blood circulation-এর নির্ভর করছে। অর্থাৎ আমাদের ভাবের সংঘর্ষে রক্তচলাচল কখনও দ্রুত কখনও মন্দ হচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসও কখনও দ্রুত হয়, কখনও মন্দ হয়। এই রক্তসঞ্চালনকে দ্রুত করা কিংবা শ্বাসকে দ্রুত করা হঠযোগীর পক্ষে নিষিদ্ধ। এইটা হল বাইরের ক্রিয়া। কিন্তু তখনও ভিতরে, মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে, নাড়ীর ক্রিয়া একটা চলে যেটার সম্পর্কে আমাদের কোনো চেতনা থাকে না। অর্থাৎ আমাদের মেরুতন্ত্রীটা হচ্ছে অসাড়—যত সাড় সে সমস্ত হচ্ছে আমাদের হৃদয়ে। এখন এই যে দুটির ক্রিয়া নাড়ীতন্ত্রের মধ্য দিয়ে সূক্ষ্মভাবে প্রবাহিত রয়েছে, তাদের মাঝে একটা তফাৎ আছে। হৃদয়ের ক্রিয়া যেটা, সেটা তাপ সঞ্চার করে। কিন্তু মেরুতন্ত্রীর যে ক্রিয়া, সেটা নিয়ে আসে শৈত্যের অনুভব। তার মাঝেও যে তাপ নেই, তা নয়, অগ্নিনাড়ী তার ভিতরেও আছে, কিন্তু সে আগুনটাকে বলা যেতে পারে আগুনের একটা coating বা ঘের, একটা insulation। তার ভিতরে রয়েছে একটা সোম্য স্রোত, এটা হচ্ছে শীতল স্রোত। কোনো একটা ভাবকে হৃদয় থেকে যদি আমরা পিছনে ঠেলে দিই—অভ্যাসে সেটা পারা যায়—তাহলে মেরুতন্ত্রীর মাঝে যেমন অত্যন্ত গভীরে সেটা ডুবে যায় তেমনি সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত তাপ জুড়িয়ে গিয়ে একটা শীতল প্রবাহে সেটা রূপান্তরিত হয়, হিমবাহের মতো। এটা হল যখন আমরা ভিতরের দিকে গুটিয়ে আসি।

যেমন গুটিয়ে আসতে হবে তার সঙ্গে এ ধারাটাকে ঊর্ধ্বমুখীও করতে হবে। এটাকে বলে ঊর্ধ্বস্রোত। ঊর্ধ্বস্রোত কথাটা প্রাচীন। উপনিষদেও আছে, সংহিতাতেও আকারে ইঙ্গিতে আছে। চেতনার ধারা যখন ঊর্ধ্বস্রোতা হয়, তখন তার একটা বাইরের লক্ষণ দেখা দেয়। আমরা যেটাকে বলি মাথা-গরম। ওটা তাপের ক্রিয়া। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে ওই তাপের আবার যেন একটা অন্তঃশীতলতা, যেন একটা সোম্যধারা, সেটাও চলতে থাকে। একেই সংহিতাতে বলা হয়েছে অগ্নি-সোমের মিলন, অর্থাৎ একটা আগুনের হল্‌কা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, ঠিক তার কেন্দ্রে একটা বরফের স্রোত উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। এই হল দ্বিতীয় গতি। তারপর যতই সে উপরের দিকে ওঠে, ততই তার একটা ব্যাপ্তি ঘটে। এটার বর্ণনাও ঋক্-সংহিতায় রয়েছে। বলা হয়েছে, চেতনার এই যে ঊর্ধ্বাভিযান, ইন্দ্র যার দিশারী, সেটা হচ্ছে যেন পাহাড়ের একটা চূড়া থেকে আর একটা চূড়ায় উঠে যাওয়ার মতো। যৎ সানোঃ সানুমারুহদ্ ভূরি অস্পষ্ট কর্ত্বম্। এক সানু থেকে আর এক সানুতে আরোহণ করে, আর দেখতে পায় তার একটা বিপুল কর্তব্য। যেমন একটা peak থেকে আর একটা peak-এ উঠতে গেলে চারিদিকে horizon ক্রমশ প্রসারিত হতে থাকে, এও ঠিক তেমনি। এইটি তৃতীয় গতি।

তাহলে আমরা পাচ্ছি তিনটি গতি—একটা গভীরতা depth-এ, একটা তুঙ্গতা

height-এ, আর একটা ব্যাপ্তি width-এ। আমাদের আধ্যাত্মিক চেতনারও এই তিনটি মান রয়েছে, অর্থাৎ three dimensions। এই তিনটিকে একসঙ্গে maintain করতে হয় বজায় রাখতে। Depth-এ থাকা, আপনাতে আপনি থাকা। Height-এ থাকা, সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে অক্ষুব্ধ থাকা, দ্রষ্টারূপে থাকা। আর width-এ থাকা, নিজের মাঝে সবাইকে দেখা। যোগের ভাষায় বলতে গেলে আমাদের সব সময়ের ভাবনা হবে বাইরে নয়, মেরুদণ্ডে থাকা, সেখানে থেকে একটা ঊর্ধ্বভাবনা, ঊর্ধ্বস্রোতকে সব সময় অনুভব করা আর সেই অনুভূতিটাকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া। এই ভাবটা সহজে সিদ্ধ হতে পারে যদি আমরা আকাশের ব্যাপ্তিটাকে সংস্কারগত করে নিতে পারি। ব্যাপ্তিবোধ থেকে স্বভাবত উল্টো দিকে একটা বৃত্তির সৃষ্টি হয়, সেটাকে বলা যেতে পারে সঙ্কর্ষণ বৃত্তি অর্থাৎ ব্যাপ্তির একটা কেন্দ্র। তাইতেই—আগেও বলেছি—মহতো মহীয়ান্ অণোরণীয়ান্ ভাবটা স্বভাবতই ফুটে ওঠে। যতই আকাশের মতো অসঙ্গ হয়ে নিজেকে ছড়িয়ে দিই, ততই আত্মচেতনার একটা কেন্দ্রকে আবিষ্কার করি। দুটি যুগপৎ। ওটারই মহাবাক্য হচ্ছে অয়মাত্মা ব্রহ্ম, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।

আত্মসত্তার অনুভব একটা বিন্দুর মতো আর ব্রহ্মের অনুভব সে বিন্দু থেকে আলোর বিস্তার। যেমন একটা দীপশিখা। শিখারূপে সংহত কিন্তু প্রভারূপে ব্যাপ্ত। আমাদের চেতনা ঠিক তেমনি। সেই ভাবনা থেকে একে বলা হয়েছে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ। হৃদয়ে তাকে ভাবনা করতে পারি, কিন্তু হৃদয়ের গভীরে, হৃদয়ের পুরোভাগে নয়। প্রথমে পুরোভাগে আসে কিন্তু তাকে ক্রমশ তলিয়ে দিতে হয় মেরুতন্ত্রের দিকে। পুরোভাগে যখন সেই চেতনা থাকে তখন আমাদের মাঝে নানারকম emotion, ভাব বা আবেগ জাগতে পারে। এ সমস্ত ভাবাবেগ, emotion কখনও কখনও ক্ষতিকর হয়। তার সঙ্গে কতটা অবিশুদ্ধ প্রাণের ক্রিয়ার যোগ থাকে। কিন্তু এটা শুদ্ধ হয় যদি আমরা তাকে মেরুতন্ত্রের দিকে ঠেলে দিই। আর তখন যে অনুভব সেটা খুব তীব্র হয়। তীব্র, সূক্ষ্ম অথচ শুদ্ধ। এইটাই হচ্ছে, যা এখানে বলা হয়েছে, একটি নাড়ী যা উপরের দিকে চলে যাচ্ছে।

এখানে বলা হচ্ছে যে হৃদয়ের থেকে চলে যাচ্ছে একশ একটি নাড়ী অথবা হৃদয়ের নাড়ী রয়েছে একশ একটি। একশ হচ্ছে উপলক্ষণ। অনেকগুলি বোঝাবার জন্য অনেক সময় শতশঃ বা সহস্রশঃ কথা ব্যবহার করা হয়। তাদের মাঝে একটি নাড়ী মাথার দিকে চলে যাচ্ছে, মূর্ধানম্ অভিনিঃসৃতা। এই নাড়ীটিই সুষুম্ণা নাড়ী। সুষুম্ণা-ভাবনা এইজন্য যোগের পক্ষে অপরিহার্য। ভাবনা করে এটা আমরা জাগিয়ে তুলতে পারি। মেরুদণ্ড যেন একটা নিয়নের রডের মতন আলোতে পরিপূর্ণ। আর সেটা ক্রমশ সূক্ষ্ম হয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত যেন পদ্মের ডাঁটায় আঁশের মতন সূক্ষ্ম হয়ে যায়। এইরকম করে চেতনাকে বিদ্যুৎ-তন্তুতে পরিণত করা, এটা একটা সঙ্কেত। প্রথম এটাকে suggestion দিয়ে করে নিতে হবে ধ্যানের সঙ্গে। তারপরে এটা স্বাভাবিক একটা বোধে রূপান্তরিত হবে। তারপর সেইটাকে দেখবার কোনো দরকার পড়ে না, কিন্তু বিদ্যুৎ-তন্তুর বোধটা সব সময় থাকে। আর এই বোধের গতি সব সময় ঊর্ধ্বে, **মূর্ধানম্ অভিনিঃসৃতা**। আর এই যে মেরুতন্ত্রের বোধ, মূল যে বোধ, তাকে আশ্রয় করে প্রাণের ক্রিয়া সঞ্চালন হয়, যাকে এখানে বলা হয়েছে **বিষ্বক্**। একটা মূল তন্তু থেকে আরো

কতকগুলি উপতন্তু চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। বাস্তবিক তাই-ই হচ্ছে। আমাদের মূলে যে একটা ভাব রয়েছে সেই ভাবের আমরা একটা বিসৃষ্টি দেখছি, বিক্ষেপ দেখছি। এখন যোগীর লক্ষ্য হচ্ছে যে বিক্ষেপের মূলে যে তন্তু রয়েছে তাকে অবলম্বন করা, সেইটিকে দেখা, আর সেই মূলতন্তুর জ্ঞানের জন্য আবার বিক্ষেপটাকে গভীরে সংহরণ করা। সংহরণ করে চেতনায় যখন সুস্পষ্ট হয়ে জাগে, তখন সে-বিক্ষেপের ক্রিয়া—বলা যেতে পারে—একটা স্ফুরণ। তখন যেন সেটা আলোর মতন ঠিক্‌রে পড়ছে। এটা স্বাভাবিক অবস্থা। এখন যে বিক্ষেপ হচ্ছে, সেটা অবিদ্যাতে হচ্ছে। যদি সেটাকে আকর্ষণ করে সেই তন্তুতে নিয়ে যেতে পারি, আর নিয়ে তাকে ছেড়ে দিই, তাহলে সে-বিক্ষেপ হবে বিদ্যার বিক্ষেপ। সংহরণের এইটুকু লাভ। এটাকে বার বার করতে হয়। বার বার নিজের ভিতরে গুটিয়ে এনে আবার ছেড়ে দেওয়া। এইরকম করে সমস্ত জীবন চলল। তারপরে এখানে রয়েছে উৎক্রমণের কথা। উৎক্রমণ কথাটা উপনিষদে অনেক জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। মৃত্যুর পর চেতনার যে গতি সেটাকে বলা হয় উৎক্রমণ বা উৎক্রান্তি। এই উৎক্রমণের একটা ধারা রয়েছে। মৃত্যু একরকম যোগ। মৃত্যুতেও বাইরে থেকে চেতনা গুটিয়ে আসে। একটা ব্যাধি হলেও চেতনা দেহে গুটিয়ে আসে। তখন আমরা অত্যন্ত দেহসচেতন হয়ে উঠি। ব্যাধির তীব্রতা যত বাড়ে, চেতনা অন্তর্মুখ হতে থাকে স্বভাবের নিয়মে। এখন এই অন্তর্মুখীনতা যত বাড়বে, ধারা ততই উপরের দিকে উঠে যাবে। এইটা একটা স্বাভাবিক নিয়ম। প্রথম উপরের দিকেই সে ওঠে। এই যে গুটিয়ে আনার পর, চারিদিকে চাপ দিলে পর, press করলে পর, ধারাটা উপরের দিকে যায় তার একটা উপমা দেওয়া যেতে পারে ভৌগোলিক দিক দিয়ে geography দিয়ে। যেমন spring। মাটির, soil-এর নিচে একটা জলের ধারা চলছে তার দু'দিক থেকে ধারাকে যদি চাপ বা pressure দেওয়া যায়, (pressure-টা অনেক সময় মাটির চাপে আসে), তখন সে চাপে সমস্ত ধারা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ওঠে। এর ফলে মাটি ফুঁড়ে ফোয়ারার মতন জল উঠে আসে। এই ব্যাপারের সঙ্গে সোমযাগে যে সোম সবন করা হয় তার যোগ আছে। তাঁরা বলেন, এই সুষুম্‌ণা নাড়ী অথবা সোমলতা, যদি তাকে দুদিক থেকে চাপ দেওয়া যায়, তাহলে সেই লতার মাঝে যে ধারাটা ছিল অধোগামী, যে আমাদের ভোগের দিকে নিয়ে যেত, বাইরের চিত্ত-বিক্ষেপের দিকে নিয়ে যেত, সেই ধারাটি ঊর্ধ্বগামী হয়। এইটাকে বলে সোমের অভিষব। চারদিক থেকে চাপ দিয়ে তাকে ঊর্ধ্বমুখী করা হয়। কখনও তাকে প্রসব বলা হয়, একই অর্থ। আবার কখনও আরেকটা কথা বলা হয়, যার অর্থ আমরা ভুলে গেছি—উৎসব। উৎসব কথাটা আমরা খুব জানি আর মনে করি এটা হুল্লোড়। কিন্তু এটা এসেছে সোমযাগ থেকে। চারিদিক থেকে চাপ দিলে পর ধারাটা ঊর্ধ্বমুখী হয়, এটাই উৎসব। এটা কিন্তু হুল্লোড় নয়। সঙ্কোচ করার ফলেই ধারার ঊর্ধ্বগতি। এই ব্যাপারটা হচ্ছে উৎক্রমণ। যখন আমরা চেতনাকে অন্তর্মুখ করব, কোনো একটা বিন্দুতে সংহত করব, স্বভাবের নিয়মেই তখন উপরমুখী ধারাটা খুলে যায়। সবারই যায়। বিশেষ করে মৃত্যুতে সবারই যায়। কিন্তু সে ধারা কিছুদূর উঠে একটা জায়গায় বাধা পায়। ফলে সে আবার নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এটার বর্ণনা কৌষীতকী উপনিষদে আছে।[১] সেখানে বলা হয়েছে, চন্দ্রমার রশ্মিকে অবলম্বন করে জীব উজিয়ে চলল, তারপরে একটা জায়গায় সে এসে দেখল একটা দরজা, সেখানে

দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে। সে তাকে কতকগুলো প্রশ্ন করল। এই প্রশ্নগুলির তাৎপর্য হল যে তুমি আমাকে জানো কি না। যদি সে প্রশ্নের জবাব দিতে না পারে তখন তাকে ঠেলে দেয়, আর সে নিচের দিকে আসে। আর যে জবাব দিতে পারে তার কাছে দরজাটা খুলে যায়। এই দরজাকে বলা হয়েছে লোকদ্বার। আর এক সময় তাকে বলা হয়েছে দেবীদ্বার। কোথাও বলা হয়েছে তিনটি দরজা আছে। কোথাও বলা হয়েছে সাতটি দরজা আছে, যেগুলি পর পর পার হয়ে যেতে হয়। যদি আমি আত্মজ্ঞ হই তাহলে দরজা খুলে যাবে, তাহলে উৎক্রমণে কোনো বাধা থাকবে না। সে ধারা ধরে এসে পৌঁছাব আদিত্যমণ্ডলে। আর যদি অবিদ্যাচ্ছন্ন হই, তাহলে ধারাটা কিছু পর্যন্ত উঠে বাধা পেয়ে নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়বে।

এই কথাটাকে এখানে বলা হয়েছে যে, কেউ কেউ ঊর্ধ্বমুখী নাড়ীকে অবলম্বন করে অমৃতকে সম্ভোগ করে। আর যারা আত্মজ্ঞ নয়, তাদের বেলায় বিশ্বক্ মানে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তা যে কোনো একটা নাড়ীকে অবলম্বন করে তারা অধোগামী হয়, আবার সংসারে ফিরে আসে। এটা যেমন মৃত্যুতে হয় তেমন জীবনেও হয়। এমন প্রতিদিনই হচ্ছে। যখন সংহৃত করছি তখনই ধারা ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে। কিন্তু উপরের দিকে কপাট দেওয়া রয়েছে, সেখান থেকে আবার ওটা নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। যদি সমস্ত দরজাগুলি খোলা পাই, সমস্ত চেতনা যদি মূর্ধন্য চেতনায় গিয়ে পৌঁছয়, তাহলে সেখান থেকে ধারা আবার নিচের দিকে নেমে আসে, কিন্তু সে নেমে আসে যেমন সূর্যরশ্মি উপর থেকে নিচে আসে তেমনি। সেটার বর্ণনা ঋগ্বেদের এক জায়গাতে রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঊর্ধ্বং স্তূপং দদতে পূতদক্ষঃ (১।২৪।৭)। বরুণের কথাই বলা হচ্ছে, যে তার একটা নির্মল নৈপুণ্য রয়েছে যাতে সে ঊর্ধ্বে একটা স্তূপ রচনা করে, আমাদের brainকে mean করা হচ্ছে। সেখানে আছে 'বুধ্ন'। সেখান থেকে সমস্ত রশ্মি নিচের দিকে আসে, এসে সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হয়। এই যে রশ্মিগুলিকে নিয়ে আসা, পরিপূর্ণভাবে নিয়ে আসা—এটা বিদ্যাতে নিয়ে আসা, এটা বিসৃষ্টি। নিচের দিকে আসাটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আমি কোন ভূমি থেকে নিচে আসছি সেটা দেখতে হবে। যদি সব দরজাগুলি আমি খোলা পাই, আর মূর্ধন্য চেতনায় পৌঁছতে পারি, আর সেখান থেকে নিচে আসি, সেটা হবে প্রপঞ্চের উল্লাস। কিন্তু তার জন্য প্রপঞ্চের উপশম দরকার। সব দিক থেকে নিজেকে গুটিয়ে এনে ধারাটিকে ঊর্ধ্বমুখী করতে হয়। বাধা পাব কিন্তু সে বাধাকে ঠেলে উঠব। যে পর্যন্ত একটা আনন্ত্য, চৈতন্যের একটা ব্যাপ্তিকে অনুভব না করছি। এইটাই মুক্তি। সবদিক থেকে সে নিজেকে মনে করছে মুক্ত free, আকাশের মত মুক্ত free as space। সেইখান থেকে সেই ধারা আবার ছড়িয়ে পড়বে নিচের দিকে সবার উপর আদিত্যকিরণের মতন। এটা বিসৃষ্টি। যদি কোথাও সে ধারা বাধা পায় তাহলে সেটা হচ্ছে সংসার। আমরা যখন সংসারে থাকছি, তখন যেহেতু অবিদ্যায় থাকছি, সেজন্য বার বার আবর্তিত হচ্ছি। অথচ এই যে আবর্তন, এটা বিষ্ণুচক্রেও হতে পারে, যদি আমরা সেই বিষ্ণুচেতনায়, সেই বিষ্ণুর পরম পদে বা মূর্ধন্যচেতনায় থাকি। এই সংসারই অবিদ্যার বন্ধন, আবার বিদ্যার বিমুক্ত ক্ষেত্র। এটা কাশী, বারাণসী। দুটি গতি আছে, একটা ঊর্ধ্বগতি আর একটি বিশ্বক্-গতি, ছড়িয়ে পড়া। ছড়িয়ে পড়া দুরকম হতে পারে, একটা অবিদ্যায় ছড়িয়ে পড়া, অবিদ্যার বিক্ষেপ।

আর একটা বিদ্যার বিসৃষ্টি। এটা বিক্ষেপ নয়, এটা আত্মবিকিরণ, আলো ছড়ানো।

১৭।। এর অনেকগুলি কথা আগেই বলা হয়েছে। প্রথম বলা হচ্ছে, **অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ, সদা জনানাম্ হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ**। আমরা একে এখন ধরতে পারি psychic being রূপে। একে বলা হয়েছিল ঈশানো ভূতভব্যস্য। তার থেকেই আমাদের সমস্ত প্রেরণা আসছে। জীবনের যে তাৎপর্য সেটা আমরা বাইরের মন দিয়ে ধরতে পারি না। অনেক ভুল-ভ্রান্তি হয়, চিত্তের নানারকম বিক্ষেপ হয়, বাইরে বাইরে আমরা ছুটি। কিন্তু এইগুলি বৃথা নয়। এও আমাদের ভিতরে যে ঈশান রয়েছেন তাঁরই বিধান। যখন আত্মসচেতন হই, তখন দেখি যে, সমস্ত বিক্ষেপ এক জায়গায় এসে সংহত হয়েছে, আর বিক্ষেপের একটা প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করি। কখনও হয়তো সেটা আনন্দ, কখনও বিষাদ। অর্থাৎ কখনও আঘাত দিয়ে আমাদের চেতনাকে জাগিয়ে দেবার প্রয়োজন হয়। তার জন্য হয়তো বিক্ষেপ হয়। এটা metaphysical question, তাত্ত্বিক প্রশ্ন, এটার মাঝে এখন যাওয়ার দরকার নেই। এই যে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ—যে সব সময় আমাদের হৃদয়ে **সন্নিবিষ্ট** রয়েছে, সম্যক্‌রূপে নিবিষ্ট, সম্—সম্যক্‌রূপে, নি—গভীরে 'বিষ্ট' তিনি প্রবেশ করেছেন। কীরকম করে সে আগেই বলেছি। সূর্যরশ্মি হয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রে, সীমানাং বিদার্য। ব্রহ্মরন্ধ্রের ভিতর দিয়ে হিতানাড়ীকে অবলম্বন করে—অথবা সুষুম্ণাকে। এই যে পুরুষ তিনি ভিতরে এসে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছেন। তাঁকে আচ্ছাদিত করছে কতকগুলি কোষ। এই কোষের বর্ণনা এখানে নেই, তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে। যেমন একটা cell-এর ভিতরে আর একটা cell, তার ভিতরে আর একটা cell, একটা খাপের ভিতরে খাপ, তার ভিতরে আর একটা খাপ, এই রকম করে পাঁচটা খাপ রয়েছে। বাইরের খাপটা আমাদের দেহ। আর একটা খাপ রয়েছে তার ভিতরে, যেটাকে বলা হয় প্রাণময় কোষ। বাইরেটাকে বলা হচ্ছে অন্নময় কোষ। তার ভিতরে প্রাণময় কোষ। যেমন সে ভিতরে, তেমনি কিন্তু আবার বাইরেও রয়েছে। যতই উর্ধ্বগতি হয় ততই চেতনার প্রসার হয়। এখানে ঠিক তেমনি দেখতে হবে যে যতই ভিতরের দিকে আমি যাচ্ছি, ততই তার প্রভাব বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। অর্থাৎ এক দৃষ্টিতে প্রাণময় কোষ যেটা, সেটা অন্নময় কোষের অন্তর্গত, তার ভিতরে রয়েছে, কিন্তু তার শক্তি অন্নময় কোষকে ভেদ করে বাইরে ছড়িয়ে আছে। অবিদ্যা-দৃষ্টিতে তাকে দেখি সে ভিতরে, আর বিদ্যা-দৃষ্টিতে দেখি যে তার প্রভাবটা ভিতর থেকে বাইরে ছড়ানো। প্রাণময়ের মাঝে রয়েছে মনোময়, মনোময়ের মাঝে বিজ্ঞানময়, তার মাঝে আনন্দময়। এই আনন্দময় কোষের মাঝে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ। উল্‌টো দিক থেকে যদি দেখি তাহলে সে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষের অতিসন্নিহিত হচ্ছে আনন্দ। সে আনন্দের ছটা তাঁর বিজ্ঞান। বিজ্ঞান থেকে বেরিয়ে আসছে মন। মন থেকে বেরিয়ে আসছে প্রাণ। এবং সে প্রাণ এই দেহের খাঁচাটা তৈরি করেছে। একটি একটি করে এই খোসা ছাড়াতে হবে। এখানে তুলনা দেওয়া হয়েছে মুঞ্জতৃণের থেকে যেমন ইষীকাকে ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। মুঞ্জ তৃণ, তার যেমন একেকটি গাঁট, এক একটি কোষ থাকে এইরকম একটির মাঝে আর একটি কোষ রয়েছে। এখন একটির ভিতর থেকে আর একটিকে বের করে নিয়ে আসতে হবে, যে পর্যন্ত আমরা শেষে ওই আনন্দময় কোষের ভিতরে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে আবিষ্কার করতে না পারছি। এটা হল imagery-র বা রূপকের কথা। যখন অনুভবের দিক থেকে দেখছি

তখন আমরা বলতে পারি সমস্ত কিছুকে যদি আমরা বোধে পরিবর্তিত করতে পারি, রূপান্তরিত করতে পারি—তাহলে অন্নময় কোষের হচ্ছে স্থূলবোধ, জড়ত্বের বোধ, যেটা আমাদের কাছে dullness রূপে প্রতিভাত হয়। এই dullness-এর ভিতরে রয়েছে প্রাণচাঞ্চল্য। এই dullnessটাকে দূর করতে হবে। প্রাণিকশক্তি energy যেখানে স্ফুরিত হচ্ছে সেই ভূমিতে যেতে হবে। তার গভীরে রয়েছে আমাদের মনোময় সত্তার বোধ, স্থূলভাবে বলতে গেলে intellection। তার গভীরে রয়েছে যেটা spiritual বোধ, বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের গভীরে রয়েছে শক্তি, সেইটাই প্রকাশ পায় আনন্দরূপে। আর সেই শক্তির সঙ্গে যুক্ত পুরুষ।

প্রত্যেকটি কোষের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে একটি পুরুষ। একথাটা উপনিষদেই রয়েছে। যখন ভিতরের দিকে যাচ্ছি তখন প্রত্যেকটি কোষ একটা আবরণ, আবরণগুলিকে ভেদ করে যাচ্ছি, কিংবা খোসা ছাড়াচ্ছি। রামকৃষ্ণদেব একটা উপমা দিতেন, পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানো। ক্রমশ অন্তর্মুখ হচ্ছি। হয়ে হয়ে শেষে যখন আনন্দময় কোষ দ্বারা আবৃত সেই পুরুষকে পাচ্ছি তখন আবার বাইরের দিকে যে গতি হচ্ছে, তখন প্রত্যেক কোষের মাঝে সেই কোষের অধিষ্ঠাতা পুরুষ আবিষ্কৃত হচ্ছে। তখন সে আনন্দময় কোষ আর আবরণ নয়, সে আত্মার শক্তির দ্যুতি, 'পুরুষবিধাতা'। বিজ্ঞানময়কোষও আবরণ নয়। তেমনি মন, প্রাণ, দেহ কিছুই আর আবরণ নয়। সমস্তই তখন দিব্য। একটা অবিদ্যার দৃষ্টি আর একটা বিদ্যার দৃষ্টি। অবিদ্যা-দৃষ্টিকে দূর করতে হবে। একেবারে পৌঁছতে হবে সত্তার গভীরে। আর সেখান থেকে আবার ফিরে আসবে যখন বিদ্যাশক্তি দিয়ে সমস্ত কিছুকে অমৃত করবে।

এই যে আত্মার স্বরূপ সে হচ্ছে **শুক্রম্ অমৃতম্**। শুক্রম্ অর্থাৎ শুক্লম্ শুভ্র, এটা জ্ঞানের দিক থেকে। অমৃতম্, এটা আনন্দের দিক থেকে। শুদ্ধ চৈতন্য এবং শুদ্ধ আনন্দ। **তং বিদ্যাৎ** শুক্রম্ অমৃতম্, তাঁকেই আবিষ্কার করতে হবে। **স্বাৎ শরীরাৎ প্রবৃহেত্** নিজের দেহ থেকে নিষ্কাশিত করতে হবে। কী করে? না, **ধৈর্যেণ**। একদিনে, দুদিনে হবার নয়। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে একবার ভিতরে যাওয়া, আর ভিতর থেকে সেটাকে আবার বাইরে নিয়ে আসা, ভাবটিকে বজায় রেখে। ভিতরে যখন ঢুকে গেলাম, হল তন্ময়তা, জগৎ ভুললাম। সে তন্ময়তার আবেশটুকু নিয়ে বাইরে আসা। একটা নেশা লেগে থাকবে সবসময়। আর সে নেশা থাকবে বলেই আবার ভিতরে ঢুকব, আবার বাইরে। এইরকম করে ক্রমশ বাইরেটাকে রূপান্তরিত করতে হবে। এখানে উপনিষদ শেষ হল। তারপর ফল-শ্রুতি।

১৮।। বলা হচ্ছে যে নচিকেতা মৃত্যুর কাছ থেকে এই বিদ্যা, তত্ত্ববিদ্যা এবং যোগবিধি লাভ করলেন। একটা হল **বিদ্যা**, জ্ঞান যেটা theory। আর একটা **বিধি** তার practice। **কৃৎস্নম্** সম্পূর্ণরূপে, সমগ্রভাবে অখণ্ডভাবে! যেটাকে লাভ করে তিনি **ব্রহ্মপ্রাপ্ত** হলেন। এই ব্রহ্মপ্রাপ্তির অবস্থাগুলি আগে বলেছি। তিনি সূর্যের সঙ্গে এক হয়ে গেলেন, এই একটা অর্থ হতে পারে। তিনি সেই সূর্যের পিছনে রয়েছে যে আকাশ, তার সঙ্গে এক হয়ে গেলেন, এও হতে পারে। আবার তিনি যে সূর্যমণ্ডল থেকেই এই পৃথিবীর দিকে তাঁর দৃষ্টিকে ফিরিয়ে রাখলেন, তার উপর তাঁর সেই শক্তিপাত খাটিয়ে চললেন, এটা হচ্ছে সেই আধিকারিক পুরুষের স্থিতি। অর্থাৎ সেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি নেতিভাবেও হতে

পারে। ইতিভাবেও হতে পারে, ক্রিয়াতেও হতে পারে। তিনটি একসঙ্গেও হতে পারে। আর এইদিক থেকে যখন দেখি, তখন তিনি বিজর[১] বিমৃত্যু, তাঁর জরা নেই, মরণ নেই। মহাপ্রাণ এবং মহাচেতনা—তাকে তিনি লাভ করেছেন। যেমন সূর্যের জরামরণ নেই, তাঁরও জরামরণ নেই। নচিকেতা এটা লাভ করেছিলেন। যদি কেউ নিজের মাঝে একটা অভিধ্যান করে, সেও এটা লাভ করতে পারে। এই বলেই উপনিষদ শেষ করা হচ্ছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় বল্লী সমাপ্ত

১। মূল পাঠে আছে বিরজঃ (রজোহীন অর্থাৎ শুদ্ধ, নির্মল)। শ্রীমৎ অনির্বাণ বিরজঃ পাঠ করে ব্যাখ্যা করেছেন, যেটা শ্বেতাশ্বতরে আছে।

মন্ত্রসূচি

অন্যান্য উদ্ধৃতির সূচি

নির্ঘণ্ট

[বর্গীয় ব ও অন্তঃস্থ ব কে একসঙ্গে ধরা হয়েছে]